ইতিহাস কথা বলে
পূর্বাপর '৭১

প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হক (বীর মুক্তিযোদ্ধা)

ইতিহাস কথা বলে : পূর্বাপর '৭১ ✪ প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হক (বীর মুক্তিযোদ্ধা)

বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হক একজন গুণী ও কৃষিবিদ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক। হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি) দিনাজপুর-এর একজন গুণী অধ্যাপক হলেও শুধুমাত্র শিক্ষাবিদ পরিচয়ের গণ্ডিতেই তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। রাষ্ট্রের একজন সচেতন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক কল্যাণ, উন্নয়ন ও গবেষণামূলক নানান কর্মকাণ্ডেও তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন।

মূলত তিনি একজন কৃষিবিদ শিক্ষক। একজন কৃষিবিদের একান্ত বিচরণ ক্ষেত্র কৃষি ও প্রাণিসম্পদ অঙ্গন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ থেকে ১৯৮১ সনে ডি.ভি.এম. (ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন) স্নাতক ডিগ্রি এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮২ সনে এম.এস.সি. (মেডিসিন) ডিগ্রি লাভ করার পর ১৯৮৩ সনের ১০ মার্চ তিনি বিসিএস লাইভস্টক সার্ভিস-এ প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন। ৩ নভেম্বর ২০০৮ সন পর্যন্ত সরকারি চাকুরিতে সুনামের সাথে কর্মরত থেকে সর্বশেষ কক্সবাজার জেলা-প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত অবস্থায় শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ ও শিক্ষকতার প্রতি অদম্য আগ্রহে ৪ নভেম্বর ২০০৮-এ তিনি দীর্ঘ একাডেমিক ঐতিহ্যবাহী হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন, সার্জারী অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগে সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন। ১৬ জুলাই ২০০৯ সনে একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং সর্বশেষ ১ ডিসেম্বর ২০১২ সনে উক্ত বিভাগের অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। এখন পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই কর্মরত রয়েছেন।

১৯৯৬-১৯৯৭ সনে তিনি জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ ফেলো হিসেবে অধ্যয়ন করেন। এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশি-বিদেশি জার্নালে তাঁর ১৯টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত অমায়িক, বিনয়ী ও স্পষ্টভাষী অধ্যাপক ডা. মো. ফজলুল হক ১৯৫৭ সনের ১ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার মোলায়ের টেক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন মরহুম আমিন উদ্দিন মুন্সি এবং মাতা মরহুমা আমাতুন্নেছা। পিতা-মাতার স্নেহ-ভালবাসা পল্লীর শান্ত-সুনিবিড় প্রাকৃতিক পরিবেশে থেকে ডা. মো. ফজলুল হকের বাল্য ও কৈশোর কেটেছে প্রিয় জন্মস্থান সদরপুরেই। সেখানেই শুরু হয় তার শিক্ষাজীবন। সেখানকার আমিরাবাদ পাইলট

ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৭৩ সনে তিনি এসএসসি পাশ করেন। এইচএসসি পাশ করেন ১৯৭৫ সনে ফরিদপুর ইয়াসিন কলেজ থেকে। এরপর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ থেকে কৃতিত্বের সাথে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর যথারীতি প্রবেশ করেন কর্মক্ষেত্রে।

স্বীয় পেশার সাফল্যজনক অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন বিভিন্ন গবেষণাধর্মী ও সৃজনশীল লেখা। লেখালেখির সে ধারাবাহিকতারই প্রকাশিত তাঁর বর্তমান গ্রন্থ। অধ্যয়ন, পাঠদান এবং গবেষণাকর্ম ছাড়াও তিনি অংশগ্রহণ করছেন নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডে। সেই সুবাদে জড়িত হয়েছেন বিভিন্ন সংগঠনের সাথে এবং দায়িত্ব পালন করছেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে।

বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ দিনাজপুর জেলা শাখার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য; বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, দিনাজপুর জেলা শাখার সহ-সভাপতি; অপরাধ প্রতিরোধ ও সমাজকল্যাণ পরিষদ, মিরপুর-২-এর সাংগঠনিক সম্পাদক; শেখ ফজিলাতুন্নেছা মহিলা মহাবিদ্যালয়, মিরপুর-২-এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য; বাংলাদেশ ভেটেরিনারি এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম হাবিপ্রবি, দিনাজপুর-এর সদস্য। ছাত্রজীবনে ১৯৭২ সনে তিনি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সদরপুর থানা শাখার সহ-সভাপতি ছিলেন।

১৯৮৬ সনে সরকারি চাকুরির সুবাদে মাদারীপুর সদরে সরকারি বাসভবনে অবস্থানকালে সেখানে এক দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়। ডাকাতরা ডাকাতি সম্পন্ন করে পালাবার সময় অকুতোভয় এই মুক্তিযোদ্ধা ১৯ সদস্যের আন্তঃজেলা ডাকাতদলের উপর চড়াও হয়ে লাঠির আঘাতে দুই ডাকাতকে ধরাশায়ী করে একজনকে পুলিশে সোপর্দ করতে সক্ষম হন। অপরজনকে তার সহযোগীরা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ডাকাতদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হলে পরবর্তী সময়ে ডাকাতদলের ৮ ডাকাতের ১০ বছর করে কারাদণ্ড হয়। তার অসম সাহসিকতা ও বীরত্বের এ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে সরকার কর্তৃক তখন লাইসেন্সসহ একটি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

সহধর্মিণী সুগৃহিণী শাহনাজ চৌধুরী (শোভা)কে নিয়ে পারিবারিক জীবনে অধ্যাপক ডা. মো. ফজলুল হক এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক। তাদের ছেলে মো. ইসলামুল হক বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্র এবং মেয়ে ফাতেমাতুল নূর সোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

नेपाल-वंगलादेश मैत्री संघ

Nepal-Bangladesh Friendship Association

Baneshwor, Kathmando, Nepal

Nepal Govt. Reg. No. 877

Certificate of Covid-19 Fighter International Honors-2020

Freedom Fighter Professor Dr. Md. Fazlul Hoque

Registrar (A.C) HSTU

Dinajpur, Bangladesh

for promoting safety against Covid-19 and outstanding contribution in social services during lockdown. We appreciate you unselfishness mankind during critical situation where the whole world is in isolation.

We Salute You.

Dindaya Rijal
President, NBFA
Kathmandu, Nepal

Emdadul Haque Tayyab
Convener, NBFA
Dhaka, Bangladesh

Date: 14 January, 2021

newsg24.com

শিক্ষা

গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড পেলেন হাবিপ্রবি শিক্ষক ডা. ফজলুল হক

হাবিপ্রবি প্রতিনিধি ২ নভেম্বর , ২০২১, ১৩:১৫:২৭

165 Facebook Messenger WhatsApp More 1

ছবি : নিউজজি

হাবিপ্রবি: মুক্তিযুদ্ধ ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে শেরে বাংলা গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড-২০২১ পেয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. মো. ফজলুল হক। তিনি দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত) ও মেডিসিন সার্জারি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগের অধ্যাপক।

গত ৩০ অক্টোবর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক গবেষণা পরিষদের পক্ষ থেকে এ সম্মাননা দেয়া হয়। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এর ১৪৮তম জন্মদিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. মো. ফজলুল হককে এ সম্মাননা ক্রেস্ট, গোল্ড মেডেল ও সনদ প্রদান করা হয়।

উক্ত গুনীজন স্বংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এস এম মজিবুর রহমান। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন পুলিশের সাবেক আইজি এ কে এম শহীদুল হক। প্রধান আলোচক হিসেবে ছিলেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এর দৌহিত্র সাবেক তথ্য সচিব সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ।

সার্বিক বিষয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. মো. ফজলুল হক বলেন, আমাকে শেরে বাংলা গোল্ডেন এওয়ার্ -২০২১ এর জন্য নির্বাচিত করায় আমি সংশ্লিষ্ট সকল আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ছিলেন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতার জন্য সুপরিচিতি। তিনি আপোষহীন ন্যায়নীতি, অসামান্য বাকপটুতা আর সাহসিকতার কারণে রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত ছিলেন শেরে বাংলা (বাংলার বাঘ) নামে। সর্বভারতীয় রাজনীতির পাশাপাশি গ্রাম বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বাংলার পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য তিনি অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। এমন একজন মহান নেতার নামে তারই দৌহিত্র সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ এর হাত থেকে সম্মাননা পাওয়া আমার জন্য আনন্দের ও গৌরবের। মুজিব জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে তাদের এই সম্মাননা ও সনদপত্র আমার কাজের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. মো. ফজলুল হক তার বিভিন্ন কাজের অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা, মাতৃভাষা সম্মাননা, জেনারেল এমএজি ওসমানী সম্মাননা, মাদার তেরেসা অ্যাওয়ার্ড, দানবীর হাজী মুহম্মদ মহসীন আজীবন সম্মাননা, করোনায় সচেতনতা সৃষ্টির স্বীকৃতি হিসেবে নেপাল-বাংলাদেশ বন্ধু সংঘের পক্ষ থেকে কভিড-১৯ যোদ্ধা, স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী সম্মাননা, মুক্তিযুদ্ধ ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য মাপসাস কর্তৃক মাদার তেরেসা গোল্ড মেডেল-২০২১ সহ বিভিন্ন সম্মাননা ও পদকে ভূষিত হয়েছেন।

এছাড়া, বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসে কর্মরত থাকাকালীন ডাকাত দলের দুই সদস্যকে হাতেনাতে ধরে পুলিশে সোপর্দ করায় বীরত্বের সম্মাননা হিসেবে একটি এসবিবিএল গান পুরস্কার লাভ করেন।

অধ্যাপক ডা. ফজলুল হক দেশ-বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে ২৩টিরও অধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এছাড়া ইতিহাস কথা বলে পূর্বাপর '৭১ এবং উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নামক দুটি গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন। গবাদিপশুর জটিল রোগের চিকিৎসা প্রদানে একজন নামকরা ভেটেরিনারি সার্জন হিসেবে দেশব্যপী তিনি পরিচিত।

নিউজজি/এসএম

ডা. মো. ফজলুল হক ▷

স্বাধীনতাবিরোধীদের অশুভ তৎপরতা থেমে নেই

১৫ ও ২১ আগস্ট বাঙালি জাতির জন্য এক কলঙ্কময় অধ্যায়। দুটি হত্যাকাণ্ডই ঘটিয়েছে স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি। তারাই আজকের জঙ্গিবাদকে উৎসাহিত করছে। সাংবাদিক, লেখক অ্যান্থনি মাসকারেনহাস তাঁর লেখা Bangladesh : A Legacy of Blood (বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ)। বইয়ের একটি অংশে উল্লেখ করেছেন, ২০ মার্চ, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর ঘাতক ফারুক মেজর জিয়াউর রহমানকে ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরিকল্পনার বিষয়ে অবহিত করেছিলেন। মেজর জিয়া বলেছিলেন, অগ্রসর হও। তবে সরাসরি তোমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারব না। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর মেজর জিয়াউর রহমান হত্যাকারীদের বাঁচানোর জন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ নামক কালো আইন তৈরি করেন। হত্যাকারীদের বিদেশে পালাতে সাহায্য করেন ও চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মূল নায়কই ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। অ্যান্থনি মাসকারেনহাস আরো বলেছেন, জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর নির্দেশে স্বাধীনতার পক্ষের সৈন্যদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। যার সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে চার হাজার। আমেরিকার সাংবাদিক ও লেখক লরেন্স লিফশুলজ (পুলিৎজার শান্তি পুরস্কার বিজয়ী) বলেন, জিয়াউর রহমান কর্নেল আবু তাহের, খালেদ মোশাররফসহ অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যার জন্য দায়ী। মূল কথা হলো, স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় আলবদর, আলশামস ও রাজাকার যতটা না ক্ষতি করেছে তার চেয়েও বেশি ক্ষতি করেছে জিয়াউর রহমান ও তাঁর পরিবারের মানুষগুলো। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা চালানো হয় বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের জনসভায়। ফলে আইভি রহমানসহ ২৪ জন মৃত্যুবরণ করেন এবং আহত হন পাঁচ শতাধিক। ওই সময়টা ছিল জামায়াত-বিএনপির শাসনামল। তারেক জিয়ার হাওয়া ভবন ছিল সব অপকর্মের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর মদদেই দুর্বৃত্তরা গ্রেনেড হামলা চালায়। ওই হৃদয়বিদারক ঘটনার জন্য তারা বিচার তো দূরের কথা, দুঃখও প্রকাশ করেনি। রাজাকারদের মন্ত্রিত্ব দিয়ে অর্থ আত্মসাতের সুযোগ দ্বারা জঙ্গি তৈরিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মদদ দিয়েছে। বিদেশে টাকা পাচার করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, দেশের উন্নয়নে বাধাদান, কুৎসা রটনা একটি সাধারণ বিষয় তাদের কাছে। বর্তমানেও তাদের মদদে ও যোগসাজশে এ দেশে অবস্থানরত দেশ-বিদেশের নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। যার উদাহরণ গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় ২০ জনকে গুলি ও জবাই করে হত্যা এবং ঈদের দিন শোলাকিয়ায় গ্রেনেড হামলা চালিয়ে দুজন পুলিশসহ চারজনকে হত্যা। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জিন ও খাদেম, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ধর্মযাজক, বিদেশি ডাক্তার, গবেষক, আওয়ামী লীগ নেতাসহ বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। দেশের মানুষ আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাই সন্ত্রাস দমনে সরকারের পদক্ষেপগুলোকে সাধুবাদ জানাচ্ছে।

১৯৭৬ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ২১ বছর অগণতান্ত্রিকভাবে দেশ চালানো, হত্যা, ক্যু, অগ্নিসংযোগ, অর্থপাচারসহ বিভিন্ন ঘটনা ঘটিয়েছে স্বাধীনতাবিরোধীরা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে

দেশের উন্নয়নে বাধাদান, কুৎসা রটনা একটি সাধারণ বিষয় তাদের কাছে। বর্তমানেও তাদের মদদে ও যোগসাজশে এ দেশে অবস্থানরত দেশ-বিদেশের নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। যার উদাহরণ গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় ২০ জনকে গুলি ও জবাই করে হত্যা এবং ঈদের দিন শোলাকিয়ায় গ্রেনেড হামলা চালিয়ে দুজন পুলিশসহ চারজনকে হত্যা

বাঙালি জাতি পেয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। তেমনি তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার সঠিক নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি এক লাখ ৩১ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের সমুদ্র জলসীমা নিয়ে বিশাল ভূখণ্ড। এ ছাড়া প্রায় ৬৫ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছেন ১১১টি ছিটমহলের বাসিন্দাদের। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে আগামী ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ সালে বাংলাদেশ প্রবেশ করতে যাচ্ছে মহাকাশ যুগে। স্থান পাবে ৫৭তম সদস্যপদে। দ্রুতগতিতে আজ দেশ উন্নয়নের প্ল্যাটফর্মে ধাবমান। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেতু পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পরপরই বিরোধী রাজনৈতিক দলের চক্রান্ত থেকে বের হয়ে আসতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে বর্তমান সরকারকে। শুধু তাই নয়, নির্মাণকাজ বিলম্বিত হওয়ায় অতিরিক্ত খরচ হবে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা। সব বাধা অতিক্রম করে আগামী ২০১৮ সালের শেষদিকে যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে বহুমুখী পদ্মা সেতুটি, যার উভয় তীরে গড়ে উঠবে শত শত মিলকারখানা, হাটবাজার, বিমানবন্দর, রেলস্টেশনসহ অনেক কিছু। আমরা হব আরো সম্মানিত জাতি। সব সুযোগ ও সম্মানের দাবিদার এ দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় দেশপ্রেমিক বাঙালি জনগোষ্ঠী। এ সুযোগগুলো যাঁর নেতৃত্বে পেয়েছি তিনিই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে যে কুচক্রী মহল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করেছে, তারা বাঙালি জাতির চিরশত্রু। তাদের ব্যাপারে সবাইকে সাবধান হতে হবে। এ দেশে তাদের রাজনীতি করার অধিকার আছে কতটুকু—সেটিই বিবেচ্য বিষয়। এ দেশের শান্তি ও স্বাধীনতার পক্ষের সবাইকে দলমত-নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওই অপশক্তিকে রুখতে হবে। সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের এ দেশে কোনো ঠাঁই হবে না।

লেখক : অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, মেডিসিন, সার্জারি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

পাকশাসন ও তাদের সীমাহীন শোষণে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ছিলেন নিস্পেষিত। প্রায় সকলের মধ্যেই একটি ক্ষোভ ঐ দুঃশাসনের বেড়াজাল হতে বের হতে পারলেই নিস্তার, তবে প্রশ্ন আছে ঐ বিড়ালের গলায় ঘণ্টা কে বাধবেন? এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ যেহেতু ঐ সময়ে বিশ্বব্যাপী পাকিস্তানকে ক্ষমতাশালী দেশ ও পাক সৈন্যদেরকে বিশ্বের সেরা সৈন্য হিসেবে সুনাম ছিল। ঐ কঠিন সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বঙ্গবন্ধু বাঙালী জাতিকে সুসংগঠিত করে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে পর্যায়ক্রমে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ছয়দফার দাবী, ১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থান এবং '৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় তথা বাংলাদেশের জন্ম। ঐ সকল ঘটনাবলী ও সাফল্যের মূলে যার অবদান সবার উর্ধ্বে তিনি হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, বাংলাদেশের স্থপতি, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি পাকিস্তানের সু-দীর্ঘ ২৩ বছরে ১৪ বার গ্রেফতার, প্রায় ১৩ বছর রাজনৈতিক কারণে কারাবরণ ও দু'বার ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে এসেছেন। তার কণ্ঠস্বর ছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর অনুপ্রেরণার উৎস। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। সেদিন ভোর ৫টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ হাতে ৩২ নং ধানমন্ডির বাসায় বাংলাদেশের সোনালী মানচিত্র খচিত লাল-সবুজ পতাকা উত্তোলন করেন। এরই মাধ্যমেই দীর্ঘ ২৩ বছরের পাকিস্তানী শাসন ও শোষণের কবল থেকে দেশ মুক্তিদানের শুভ সূচনা করেন এবং পৃথিবীর মানচিত্রে প্রথম স্থান পায় বাংলাদেশের নতুন পতাকা। ২৫ মার্চ শুরু হয় নৃশংস গণহত্যা। ২৬ মার্চ রাত ১টা ২০ মিনিটে স্বাধীনতা ঘোষণার কয়েক মিনিট পরই গ্রেফতার করা হয় বঙ্গবন্ধুকে। ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ মাস বঙ্গবন্ধু ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। একটি প্রশ্ন জাগে পাকিস্তানিদের ভাষা উর্দু, সাঁতার কাটতে জানেনা, রাস্তাঘাট চিনেনা, কিন্তু কিভাবে এবং কার সহযোগীতায় স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্রেফতার করা হল বঙ্গবন্ধুকে, হত্যা করা হলো প্রায় ত্রিশ লক্ষ বাঙালীকে। হত্যাকারী ও স্বাধীনতা বিরোধীরাই রাজাকার, আলবদর, আলসামস্ অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধী। বঙ্গবন্ধুর জীবনের স্বর্ণোজ্জ্বল অংশটুকুই কাটিয়েছেন কারার প্রকোষ্ঠে। কয়েকবার কবর খোঁড়া হয়েছে, ভয়ভীতি দেখানোর জন্য যাতে বাংলার মানুষের মুক্তি বা স্বাধীনতার দাবী না তুলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু বলতেন, আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায়, শিক্ষা পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়। ২৫ মার্চ/১৯৭১ সালের দিবাগত রাত ১২টা-২০মিনিটে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন যেমন, "এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তা নিয়েই শেষ পর্যন্ত দখলদার পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহবান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।"

এই ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়ারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রেরিত হয়। এর পর ২৬ মার্চ/১৯৭১ রাত ১টা-৩০ মিনিটে, ৩২ নম্বর ধানমন্ডীর বাড়ী হতে পাকবাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত, ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি এবং অগণিত শিক্ষক, সাংবাদিক, প্রকৌশলী, লেখক, চিকিৎসকসহ অনেক বুদ্ধিজীবিকে পরিকল্পিত হত্যা করা হয় চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র ৪২ ঘণ্টা পূর্বে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে। ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যায় সমগ্র জাতি পরিবারকে শোকাহত। "বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর খবর শুনে

বৃটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ডউইলসন লন্ডনের এক বাঙালি সাংবাদিকের কাছে লেখা শোকবার্তাতে বলেন, "এটা আপনাদের কাছে অবশ্যই এক বিরাট ন্যাশনাল ট্রাজেডি। আমার কাছে এক পরম শোকাবহ পার্সোনাল ট্রাজেডি।" এ নৃশংস হত্যাকান্ডের জন্য পাকিস্তানের বর্তমান বিরোধী নেতা ইমরান খান, ঐ '৭১ এর ঘটনার জন্য লজ্জিত হয়েছেন মর্মে পত্রিকায় প্রকাশিত। এজন্য পাকিস্তানের ক্ষমাচাওয়াই যথেষ্ট নয়, ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিৎ। বঙ্গবন্ধুকে যারা দেখেছেন, বক্তব্য শুনেছেন তারা আজও ভুলে যাওয়ার কথা নয়। তিনি সত্যিকারের একজন জনদরদী নেতা শুধু বাংলাদেশের জন্যই নয়। তিনি ছিলেন, সমগ্র বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত মানুষের মুক্তির কণ্ঠস্বর, এক অনন্য নেতা ও রাজনীতিবিদ। আমি মনেকরি তিনি বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ উন্নয়নের শীর্ষে আসীন হতে এত অধিক সময়ের প্রয়োজন হতনা। আমরা হতাম আরও অধিক সম্মানের। গত ২০০৯ সনে পবিত্র হজ্বব্রত পালনের সময় পবিত্র কাবাঘর চত্বরে এক নাইজেরিয়ান হাজী সাহেব আমাকে বলেন Where did you come from? I am from Bangladesh. আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, Do you know Bangladesh? তিনি বললেন, Yes, Sheikh Mujibur Rahman এ থেকে বোঝা যায় তিনি বাংলাদেশের মহান নেতাই শুধু নন, অনেক সম্মানের ও গৌরবের বিদেশীদের কাছেও। তাঁর সম্পর্কে বিদেশী সাংবাদিক সিরিল ডান বলেছেন, "বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা যিনি রক্তে, বর্ণে, ভাষায়, কৃষ্টিতে এবং জন্মসূত্রেও ছিলেন খাঁটি বাঙালি। জনগণকে নেতৃত্বদানের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও সাহস তাঁকে এ যুগের এক বিরল মহানায়কে রূপান্তর করেছে।" বিশ্বখ্যাত যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউজ উইক' পত্রিকায় প্রকাশিত "শেখ মুজিব সুপারম্যান ও রাজনীতির কবি"। বৃটিশ মানবতাবাদী আন্দোলনের প্রয়াত নেতা মনীষী লর্ড ফেনার ব্রুকওয়ে মন্তব্য করেছিলেন নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু, "আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, ভারতের মহাত্মা গান্ধী, আয়ার ল্যান্ডের জর্জ ডি ভ্যালেরার চেয়েও এক অর্থে মহান নেতা ছিলেন। তিনিই একমাত্র নেতা যিনি একই সাথে একটি স্বাধীন জাতি ও স্বাধীন ভূমির জনক। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে কিউবার নেতা ফিদেল কাস্ট্রো বলেছিলেন, "আমি হিমালয় পর্বত দেখিনি, শেখ মুজিবকে দেখলাম। ব্যক্তিত্বে ও সাহসে এই মানুষটি হিমালয় পর্বতের মতই। আমি হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম।" মিসরের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হাসনাইন হাইকেল বলেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের নন সমগ্র বিশ্বের নেতা। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন আমাদের ইসলাম হযরত রাসুলে করীম (সাঃ)-এর ইসলাম, যে ইসলাম জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বারবার যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে, আমাদের সংগ্রাম সেই মুনাফিকদের বিরুদ্ধে। যে দেশে শতকরা ৯৫ জন মুসলমান, সে দেশে ইসলাম বিরোধী আইন পাসের কথা ভাবতে পারেন তারাই যারা ইসলামকে ব্যবহার করেন দুনিয়াটা শায়েস্তা করার জন্য।

১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে তিনি যে নির্বাচনী অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন, নির্বাচনের সেই অঙ্গীকার তিনি তাঁর সাড়ে তিন বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনামলে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বল্পকালীন শাসনামলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জনমানুষের ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন সমকালীন মুসলিম বিশ্বে এর দৃষ্টান্ত বিরল। নিম্নে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলোঃ * ১৯৭৫ সালের ২২ শে মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন, *বাংলাদেশ সীরাত মজলিশ প্রতিষ্ঠা, *বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন (পূর্বে স্বায়ত্তশাসিত মাদ্রাসা বোর্ড ছিল না), * বিশ্ব এজতেমার জন্য টঙ্গিতে সরকারী জায়গা বরাদ্দ, *কাকরাইলের মারকাজ মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দ, * হজ্ব পালনের জন্য সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করণ *রাশিয়াতে প্রথম তাবলীগ জামায়াত প্রেরণের ব্যবস্থা করেন, কারণ ঐ দেশটি কমিউনিষ্ট মতাদর্শের কারণে সেখানে বিদেশ হতে ইসলাম প্রচারের জন্য কেউ অনুমতি পেতনা না। বঙ্গবন্ধুই প্রথম তাবলীগ জামাত প্রেরণের অনুমতির ব্যবস্থা করেছেন *আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন ও সাহায্য প্রেরণ, * ও. আই. সি সম্মেলনে যোগদান ও মুসলিম বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন *ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ), শব-ই-কদর, শব-ই-বরাত উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা এবং উক্তদিবস উপলক্ষে সিনেমা হল প্রদর্শন বন্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান, *মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধকরণ এবং শাস্তির বিধান, *রেসকোর্স ময়দানের ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা বন্ধকরণ ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধু তাঁর সাড়ে তিন বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনামলে ইসলামের খেদমতে যে অভূতপূর্ব নিদর্শন রেখে গেছেন তা ধর্মপ্রাণ মুসলিম সমাজ অবশ্যই মূল্যায়ন করবেন। তাছাড়াও ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের বিনামূল্যে বই বিতরণ যার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে এইচএসসি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ করার ব্যবস্থা করেছেন বর্তমান সরকার। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের সাথে স্থায়ীভাবে সংযোজিত হল ১,১১,৬০০ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র জল সীমা। যা ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর শাসনামল থেকেই প্রক্রিয়াধীন ছিল যেটি গত ১৪ই মার্চ/২০১২ ইং তারিখে বাস্তবায়িত হল।

স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের চক্রান্তেই বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবার শাহাদাত বরণ করতে হল। এটি অমানবিক ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের শামীল। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ১৫ আগস্ট একটি কলঙ্কিত অধ্যায়। যেদিন আমরা অপবাদ আর বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারব, সেই দিনই সম্ভব হবে তাঁর অসমাপ্ত কাজের বিদেহী পরিপূর্ণতা করা। আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার বর্গ এবং জেল হত্যার চার নেতা, বুদ্ধিজীবি ও সাংবাদিকসহ '৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহীদদের এবং ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলায় নিহতদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। সকল তথ্যাদি এটাই প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধু ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন দেশ প্রেমিক, জনদরদী এবং ধর্মপ্রাণ মুসলিম নেতা, তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, স্বাধীনতার ঘোষক ও বাংলাদেশের স্থপতি। ঘাতক কর্তৃক অকাল মৃত্যুতে আজ বাঙালী জাতি শোকাহত। বিজয়ের এ মাসেই '৭১ এর স্বাধীনতা বিরোধীদের ধ্বংসযোগ্য ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। বঙ্গবন্ধুর অবশিষ্ট হত্যাকারীসহ সকল যুদ্ধাপরাধীর বিচারকার্য সম্পাদনের মাধ্যমে কলঙ্কমুক্ত হোক এটাই এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রাণের দাবী।

লেখকঃ প্রফেসর ড. মো. ফজলুল হক (মুক্তিযোদ্ধা)
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
ই-মেইলঃ fhoque.hstu@gmail.com

প্রফেসর ডাঃ মোঃ ফজলুল হক

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে অমুসলিমদের ধারণা

প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে বিশ্বের শ্রেষ্ঠজীব মানুষ যখন প্রায় পশুর স্বভাব চরিত্র ধারণ করেছিল অর্থাৎ মদ, জুয়া, ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদিতে নিমজ্জিত হয়ে পশুর মত চলত সেই বর্বরতার যুগে ৫৭০ খ্রীঃ আল্লাহপাক পৃথিবীতে প্রেরণ করেন মানুষের সঠিক দিক নির্দেশক রূপে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)কে। হযরত রছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন, তোমরা জানিয়া রাখ, শেষ জামানায় এমন একদল লোক পয়দা হইবে যাহারা আমার ছাহাবাগনের প্রতি সম্মানহানিসূচক শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করিবে। হে আমার উম্মতগণ! আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, কঠোরভাবে তাক্বীদ করিতেছি, এই রকম লোক যাহারা তাহাদের কন্যা তোমরা বিবাহ করিও না এবং তাহাদের নিকটও তোমাদের কন্যা বিবাহ দিও না। এবং ইহাও অত্যন্ত তাক্বীদের সহিত বলিয়া যাইতেছি যে, এইরূপ লোকদের পিছনে তোমরা নামায পড়িও না, এইরূপ লোকদের জন্য তোমরা দোয়া করিও না। কেননা এইরূপ লোক যাহারা তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে (মুজাদ্দিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ) এর ভুল সংশোধন বইয়ের, ৪৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে)।

হযরত রছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন, তোমরা জানিয়া রাখ, শেষ জামানায় এমন একদল লোক পয়দা হইবে যাহারা আমার ছাহাবাগনের প্রতি সম্মানহানিসূচক শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করিবে। হে আমার উম্মতগণ! আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, কঠোরভাবে তাক্বীদ করিতেছি, এই রকম লোক যাহারা তাহাদের কন্যা তোমরা বিবাহ করিও না এবং তাহাদের নিকটও তোমাদের কন্যা বিবাহ দিও না

তাঁর সততা, মহানুভবতা, আন্তরিকতাসহ বিভিন্ন গুনাবলীর জন্য অমুসলিমরাও তাঁকে আল-আমিন উপাধিতে ভূষিত করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে অমুসলিম কবি, সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীরা তাদের লিখিত মতামতের কয়েকটি উদাহরণ সন্নিবেশিত করা হলো যেমন:

* মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী সাহিত্যিক মাইকেল এইচ হার্ট তার দ্য হানড্রেড গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ (সাঃ) কে আমি বিশ্বের সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী মনীষীদের তালিকার শীর্ষে স্থান দিয়েছি। মানবজাতির ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি ধর্মীয় ও ধর্মবহির্ভূত উভয় ক্ষেত্রে একযোগে বিপুলভাবে ও সর্বাধিক সফলকাম হয়েছেন। * স্যার উইলিয়াম মুর বলেন, আবির্ভূত হলেন একটি মানুষ মুহাম্মদ (সাঃ) ব্যক্তিত্ব ঐশী নির্দেশ পরিচালনার দাবিতে দুস্তর গোত্রগুলোর অসম্ভব মিলনকে প্রকৃতই সম্পন্ন করলেন। * ইউরোপের প্রখ্যাত দার্শনিক সাহিত্যিক জর্জ বার্নার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০) মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে বলেন আমি মুহাম্মদকে অধ্যয়ন করেছি। আমার বিশ্বাস, তাকে মানব জাতির ত্রাণকর্তা বলাই কর্তব্য। যদি তার মতো কোনো ব্যক্তি আধুনিক জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তবে তিনি এর সমস্যাগুলো এমনভাবে সমাধান করতে পারতেন, ধারনাতীত শান্তি ও সুখ অর্জিত হতো। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, মোহাম্মদের ধর্ম আগামী দিনে পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করবে যেমন আজকের ইউরোপ তাকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে।

* লবানদের খ্রিষ্টি বংশীয় প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও মার্কিন মুলুকে অধ্যাপনায় প্রশংসিত প্রফেসর ফিলিপকে হিট্টি আরব জাতি ও দেশ নিয়ে অনেক তথ্যপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি মহানবী সম্পর্কে বলেছেন, মুহাম্মদ তার স্বল্প পরিসর জীবনে অনুল্লেখযোগ্য জাতির মধ্য হতে এমন একটি জাতি ও ধর্মের গোড়াপত্তন করলেন যার ভৌগোলিক প্রভাব খ্রিষ্টান ও ইহুদিদেরও অতিক্রম করল। মানবজাতির বিপুল অংশ আজও তার অনুসারী। অমায়িক ব্যবহার, অনুপম ভদ্রতা ও মহৎ শিক্ষার দ্বারা তিনি আরব জাতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটান। মহত্ব, সহানুভূতিও বদান্যতার মাধ্যমে তিনি মানুষের হৃদয় জয় করেন। তিনি ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কখনো ন্যায়-নীতি ও পুন্যতার পথ পরিহার করেননি। তিনি ওয়াদা খেলাফ করেননি বা কাউকে প্রতারিত করেননি। এমনকি তার আজীবন শত্রু যারা তাকে দেশ হতে বের করে দিয়েছিল এবং আরব জাতিকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল-চূড়ান্ত বিজয়ে তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে তাদের ক্ষমা করে দেন। ব্যক্তিগত আক্রোশে তিনি কখনো কাউকে শাস্তি দেননি। দেশের শাসনকর্তা তিনি আগের মতোই পবিত্র জীবন যাপন করেছেন। ফলে মৃত্যুকালে তার ওয়ারিশদের জন্য কিছুই রেখে যাননি।

* দার্শনিক বাগ্মী, ধর্ম প্রচারক, আইনপ্রণেতা, যোদ্ধা, আদর্শ বিজেতা, মানবিক রীতি-নীতির প্রবর্তনকারী এবং একটি ধর্মীয় সাম্রাজ্য ও ২০টি জাগতিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যিনি, তিনি মুহাম্মদ। তিনি বিনম্র তবু নির্ভীক, শিষ্ট তবু সাহসী, ছেলেমেয়েদের মহান প্রেমিক, তবু বিজ্ঞজন পরিবৃত। তিনি সবচেয়ে সম্মানিত, সবচেয়ে উন্নত, সবার সৎ, সর্বদাই সত্যবাদী, শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসী এক প্রেমময় স্বামী, এক হিতৈষী পিতা, এক বাধ্য ও কৃতজ্ঞ পুত্র, বন্ধুত্বে অপরিবর্তনীয় এবং সহায়তায় ভ্রাতৃসুলভ, দয়ার্দ্র, অতিথিপরায়ণ, উদার এবং নিজের জন্য সর্বদাই মিতাচারী। কঠিন তিনি মিথ্যা শপথের বিরুদ্ধে, ব্যাভিচারীর বিরুদ্ধে এবং খুনি, কুৎসাকারী, অর্থলোভী, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার বিরুদ্ধে। ধৈর্যে, বদান্যতায়, দয়ায়, পরোপকারিতায়, কৃতজ্ঞতায়, তা-বাবা গুরুজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এবং নিয়মিত আল্লাহর প্রার্থনা অনুষ্ঠানে এক মহান ধর্ম প্রচারক। * কবি-উ মন্টোগুমারি ওয়াট বলেছেন, মুহাম্মদ (সা.) তার যুগে তিনি ছিলেন একজন সামাজিক সংস্কারক, এমনকি নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও। তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সামাজিক নিরাপত্তার এক নতুন পরিবার সংগঠন; আর উভয়টিই ছিল পূর্বেকার ব্যবস্থার ওপর বিরাট উন্নতি সাধন।

* ফরাসি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ প্রফেসর লামার্টিন তার 'তুরস্কের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, উদ্দেশ্যের মহত্ব, উপায় উপকরণে স্বল্পতা এবং বিস্ময়কর সফলতা-এ তিনটি বিষয় যদি মনের প্রতিভার মানদণ্ড হয়, তাহলে ইতিহাসের অন্য কোনো মহামানবকে এনে মুহাম্মদের সাথে তুলনা করবে এমন কে আছে?

* জার্মানির প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, পণ্ডিত ড. গুস্তাভ উইল মহানবী (সাঃ)-কে বিশ্বে আইনদাতা ও সমাজ সংস্কারের মূর্ত প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। * অন্য একজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ষ্টানলি লেনপুল বলেছেন, জীবনে কখনো কাউকে তিনি আঘাত করেননি। তিনি (মুহাম্মদ) বলেছিলেন, কাউকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য আমি প্রেরিত হইনি, প্রেরিত হয়েছি বিশ্বজাহানের জন্য রহমতস্বরূপ। * অন্য একজন প্রাচ্য পণ্ডিত গিব তার মোহাম্মদ ডেনিজম শীর্ষক ইংরেজি গ্রন্থে বলেছেন-আজ এটা এক বিশ্বজনীন সত্য যে মোহাম্মদ নারীদের উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন

* তা ছাড়া জন ডেভেন পোর্ট, জোসেফ হেল, ডা. স্যামুয়েল জনসন, প্রফেসর সিডেল, জন উইলিয়াম ড্রেপার, আলফ্রেড মার্টিন মরিস গড ফ্রে, আর্থার গিলমান, ওয়াশিংটন আরভিং, এডওয়ার্ড মন্টে, রেভারেন্ড কবি-উ স্টিফেন, রেমন্ড এলিয়ন নিকলসন, মানবেন্দ্র নাথ রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মিসেস ইন্দিরা গান্ধীসহ শতাধিক বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব মহানবী (সাঃ)-এর প্রশংসার বাণী উচ্চারণ করেছেন।

* ইউরোপে বিশ্ববিখ্যাত মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তার আটোবায়োগ্রাফিতে বলেছেন, আমি আল্লাহর মহিমা কীর্তন করি এবং পূত চরিত্র ও বিনয় প্রেরণাদীপ্ত মুহাম্মদকে আর পবিত্র কোরআনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। * প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড গিবন বলেন, আশ্রয়প্রার্থীর জন্য বিশ্বস্ততম রক্ষাকারী ছিলেন মোহাম্মদ (সাঃ)। তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী ও মনোজ্ঞ, যারা তাকে দেখেছেন তারা সহজেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছেন তার প্রতি। যারা তার কাছে এসেছেন তারা তাকে ভালবেসেছেন। পরে তারা বিবরণ দিয়েছেন তার মতো মহামানব আগে কখনও দেখিনি, পরেও না। মুহাম্মদ (সাঃ)এর স্মৃতিশক্তি ছিল গভীর, তার রসিকতা ছিল শালীন। তার কল্পনা ছিল উন্নত ও মহৎ। তার বিচার-বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ। জাগতিক শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেও মুহাম্মদ (সাঃ) নিজগৃহের কাজগুলো করতেন। তিনি আগুন জ্বালাতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন, দুধ দোহন করতেন এবং নিজ হাতে কাপড় সেলাই করতেন। তার আনীত ধর্ম বিধান সর্বলোকের জন্য প্রযোজ্য ও শতভাগ সঠিক এতে কোন সন্দেহ নেই।

* তা ছাড়া এনসাইক্লোপিডিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্বকোষেও হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সফল জীবনালেখ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে সন্নিবেশিত হয়েছে। সুতরাং বর্ণ, ধর্ম সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করা উচিৎ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সকল যুগের ও সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য একজন আদর্শের প্রতীক, শান্তির দূত। তিনি সমালোচনার উর্ধে। * ইংরেজ কবি জন কিটস বলেন, পৃথিবীর যা কিছু মঙ্গলময়, যা কিছু মহৎও সুন্দর সবই নবী মুহাম্মদ। তার তুলনা তিনি নিজেই।

* হযরত মোহম্মদ (সাঃ) প্রসঙ্গে মিথ্যাচার করে বিশ্বের শান্তি প্রিয় মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার হীন মানসিকতাকে বিশ্ব মুসলিম সমাজ ঘৃণা করে। এমনিভাবে এদেশেও কতিপয় ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে ইসলামের কথা বলেন, জিহাদের কথা বলেন, অথচ ভিতরের রূপ ভিন্ন। রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য যারা কোরআন হাদিসের দোকানে আগুন দিয়ে অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছেন, তাদের রেহাই পাওয়ার কোন দরজাই খোলা নেই। প্রকৃত অপরাধী তার বিবেকের নিকট প্রশ্ন করুন এ অপরাধের বিচারের আদালত কত সুদূর প্রসারিত। তার বিচার দুনিয়াতেই শুধু নয়, আখেরাতের আদালতেও হবেই (ইনশাআল্লাহ)।

প্রফেসর ডাঃ মোঃ ফজলুল হক
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
দিনাজপুর। ই-মেইলঃ fhoque.hstu@gmail.com

১৫ ও ২১ আগষ্টের মত হিংস্রতা আর যেন কারও জীবনে না ঘটে

প্রফেসর ডাঃ মোঃ ফজলুল হক (মুক্তিযোদ্ধা)

১৫ই আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালে ধারমন্ডির ৩২ নং বাড়ীতে উপস্থিত এক অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের সকল সদস্যসহ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় সমগ্র জাতি আজ গভীরভাবে শোকাহত। ঐ নৃশংস ঘটনায় বঙ্গবন্ধুসহ প্রায় ২০ জনকে ঘাতকরা বুলেটের আঘাতে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুসহ যারা নিহত হন তারা হলেন, *বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, *শেখ কামাল, *শেখ রাসেল, *সুলতানা কামাল, *পারভীন জামাল রোজী, *আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, *শেখ ফজলুল হক মনি, *শেখ আবু নাসের, *বেগম আরজু মনি, *শহীদ সেরনিয়াবাত, *সুকান্ত আবদুল্লাহ, *কর্নেল জামিল উদ্দীন আহমেদ, *আবদুল নঈম খান রিন্টু (মোট ১৭ জন) ছাড়াও বাসার কাজের লোক এবং গার্ডকেও হত্যা করা হয়। শিশু সন্তান শেখ রাসেল ও অন্তঃসত্ত্বা নব বধুরাও সেদিন নিষ্কৃতি পায়নি ঐ নরঘাতক পিশাচদের হাত থেকে। এদের আত্মা হিংস্র পশুর চেয়েও মারাত্মক। বাঙালী জাতি যুগযুগ ধরে এদের ঘৃণা করবে। ঐ নৃশংস হত্যার খবর শুনে বৃটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ডউইলসন লন্ডনের এক বাঙ্গালী সাংবাদিকের কাছে লিখিত শোকবাণীতে উল্লেখ করেন, এটা আপনাদের কাছে এক বিরাট ন্যাশনাল ট্রাজেডি। আমার কাছে এক পরম শোকাবহ পার্সোনাল ট্রাজেডি। বিদেশী সাংবাদিক সিরিল ডান বলেছেন, বাঙ্গালীর হাজার বছরের ইতিহাসে শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা যিনি রক্তে, বর্ণে, ভাষায়, কৃষ্টিতে এবং জন্মগত সূত্রেও ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী।

বৃটিশ মানবতাবাদী আন্দোলনের প্রয়াত নেতা ও মনীষী লর্ড ব্রকওয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব "আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, ভারতের মহাত্মাগান্ধী, আয়ারল্যান্ডের জর্জ ডি ভ্যালেরার চেয়েও এক অর্থে মহান নেতা যিনি একই সাথে একটি "স্বাধীন জাতি ও স্বাধীন ভূমির জনক"। বঙ্গবন্ধু তার অকৃত্রিম ভালবাসা আর ব্যবহার দ্বারা বাঙ্গালী জাতির হৃদয়কে জয় করেন। ২৩ বছরের পাক শাসন ও শোষণে প্রায় ১৪ টি বছরই রাজনৈতিক কারণে জেল খেটেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে মাত্র অল্প সময়ের জন্য দেশ শাসন ও গড়ার কাজে সময় লাগানোর সুযোগ পেলেও অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের স্বাক্ষর রেখেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তারপরও আত্মীয়-স্বজনসহ পরিবারের সকলকেই অকালে জীবন দিতে হল বঙ্গবন্ধুকে। আজও সেই ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়ীটি হত্যাকান্ডের চিত্র ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে স্বাক্ষী হয়ে। রক্তের দাগ আর জীবন হননকারী বুলেটের সচিত্র প্রমাণ বহন করছে দেওয়ালগুলো যা দর্শনার্থীদের মনকে ব্যাথিত করে। বঙ্গবন্ধুর পরিধেয় সেই রক্ত মাখা জামা, মুজিব কোট, চশমা, জায়নামাজ আর পবিত্র কোরআন শরীফ রয়েছে যথাস্থানে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় তিনি জেলের প্রকষ্টে বসেই নামাজ পড়তেন, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে এ পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য হাত তুলে দোআ'ও করতেন। তিনি শুধু জনদরদী নেতাই নন, প্রকৃত অর্থেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ আদর্শ মুসলমান। ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাকে বেশী গুরুত্ব দিতেন। তাছাড়া তাবলীগ জামায়াতকেও মনপ্রাণে পছন্দ করতেন। আর সে কারণেই কাকরাইল মারকাজ মসজিদের সম্প্রসারণের জন্য মাত্র ২৪ঘন্টার মধ্যেই এক একর জমির অনুমোদন দেন। এরপর বিশ্ব এজতেমার মাঠ ব্যবহারের অনুমতি এবং রাশিয়াতে প্রথম তাবলীগ জামায়াত প্রবেশের অনুমতির ব্যবস্থা করেন বঙ্গবন্ধু। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য ১৯৭৫ সালের ২২ শে মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়াও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুণঃগঠন, বাংলাদেশ সিরাত মসজিদ, হজ্ব পালনের

প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ডউইলসন লন্ডনের এক বাঙ্গালী সাংবাদিকের কাছে লিখিত শোকবাণীতে উল্লেখ করেন, এটা আপনাদের কাছে এক বিরাট ন্যাশনাল ট্রাজেডি। আমার কাছে এক পরম শোকাবহ পার্সোনাল ট্রাজেডি। বিদেশী সাংবাদিক সিরিল ডান বলেছেন, বাঙ্গালীর হাজার বছরের ইতিহাসে শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা যিনি রক্তে, বর্ণে, ভাষায়, কৃষ্টিতে এবং জন্মগত সূত্রেও ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী।

জন্য সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা, আরব ইসরাইল যন্ধে আরব বিশ্বের পক্ষে সর্মথন ও সাহায্য প্রেরণ, ও আই সি সম্মেলনে যোগদান ও মুসলিম বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, ঈদে মিলাদুন্নবী, শব-ই-কদর ও শব-ই-বরাত উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা এবং ঐ দিনগুলিতে সিনেমা প্রদর্শন বন্ধ ঘোষণা, মদ-জুয়া হাউজিং ও অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ ঘোষণা এবং শান্তির বিধান করেন বঙ্গবন্ধু। এ সকল কার্যক্রম ও পদক্ষেপ দ্বারাই ইসলামের প্রসার ঘটাতে আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও এদেশের কতিপয় বিপথগামী দেশদ্রোহী স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তির হাতে অকালে সপরিবারে আত্মীয়-স্বজনসহ জীবন দিতে হল তাকে। ইমডেমনিটি অধ্যাদেশের দোহাই দিয়ে হত্যাকারীদের বিচার কার্যক্রম বন্ধের অপচেষ্টা চালানো ছিল আর একটি অসাংবিধানিক ষড়যন্ত্র। ফলে হত্যাকারীরা আরও বেপরোয়া হয়ে কতিপয় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ২১ শে আগষ্ট/২০০৪ ইং তারিখে জননেত্রী শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেট হামলা চালিয়ে আইভি রহমানসহ প্রায় ২৪ জন আওয়ামীলীগ নেতা কর্মীকে হত্যা ও প্রায় ৩০০ জনকে আহত করা হয়, যারা আজও পঙ্গুত্ব জীবন যাপন করছেন। এদের অনেকের শরীরে রয়েছে গ্রেনেটের স্পিংটার।

১৫ ও ২১ শে আগষ্টের বর্বরতার কারণে দেশের আইন শৃঙ্খলতার ব্যাঘাত ঘটে। উদিচী, রমনার বটমুল ও ময়মনসিংহের সিনেমা হলসহ ৬৪ জেলায় গ্রেনেট হামলা ও বোমা বিস্ফোরন ঘটানো হয়। বিচারকসহ শতাধিক ব্যক্তিতে একই নিয়ম ও একই কায়দায় হত্যা করা হয়। বর্তমানে ঐ সড়যন্ত্রকারীরা আরও সুসংগঠিত হয়ে বিভিন্ন নতুন নামে ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে অনৈতিক ও অইলামিক কার্যকলাপ চালানোর জন্য বিদেশ হতে চোরাই পথে বিভিন্ন প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র জমা করছে। গত এক মাসে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ছে অস্ত্রসহ বেশ কয়েকজন। আগামী সংসদ নির্বাচনে আমরা কোন দলকে ভোট দেব? যে রাজনৈতিক দল তুলনামূলক ভাল, এদেশের স্বাধীনতার জন্য যারা শ্রম দিয়েছে, বর্তমানেও দিয়ে যাচ্ছে প্রকৃত পক্ষে এদেরই দেশ পরিচালনার জন্য পূণরায় ক্ষমতায় বসানো দরকার। বিগত কয়েকটি ধ্বংসাত্মক ঘটনার কারনে স্থবির হয়ে যায় এদেশের উন্নয়নের নিজস্ব গতি এবং গণতন্ত্র হয় প্রশ্ন বিদ্ধ। নতুন প্রজন্মের মনে অনেক প্রশ্ন এমন একজন নিবেদিত প্রাণ বঙ্গবন্ধুকে কেন হত্যা করল ঘাতকরা? কতিপয় ঘাতকের ফাঁসিই যথেষ্ট নয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার পিছনে ছিল সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র। তারই ধারাবাহিকতায় ২১ শে আগষ্টের গ্রেনেট হামলা। উদ্দেশ্য বঙ্গবন্ধুর অবশিষ্ট আদরের এতিম কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও একই ভাবে হত্যা করে রাজনৈতিক শূণ্যতা সৃষ্টি করে দেশকে পূর্বের অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। ১৫ ও২১ শে আগষ্টের হত্যা ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য একই। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ-এর রাজনীতি চিরতরে ধ্বংস করে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে ক্ষমতায় বসিয়ে শোষণ আর নিপীড়নের শাসন কায়েম করে ঐ পাকিস্তানের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। পাকিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের নামে আজ মসজিদ ও জনসমাবেশে গ্রেনেট হামলার দ্বারা মানুষ হত্যা করছে। উল্লেখ্য ১৫ ই আগষ্টের ঘটনার সময় বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশ থাকায় আল্লাহর রহমতে প্রাণে বেঁচে যান। দেশের শাসন ক্ষমতা বেহাত হয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকটি হাত বদল হয়। আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতাও বিক্রি হয়েছেন অন্য দলের কাছে। বঙ্গবন্ধু যাদের রাজনীতি শিখিয়েছেন বিপদের সময়ে পদের লোভে আজীবন সুযোগ গ্রহণের স্বার্থে আওয়ামী লীগের বিপক্ষে বক্তব্য দিয়ে ব্যক্তিগত কায়দা হাসিল করে যাচ্ছেন অনেকে। ব্যক্তিস্বার্থে এদেশের মানুষ অনেক কিছু করতে পারে তার যথেষ্ট প্রমান রয়েছে। নব্বইয়ের দশকে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সু-সংগঠিত হয়ে বিপুল ভোটে দুবার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে দেশকে অর্থনীতিতে উন্নয়ন ঘটেছে। যেমন: খাদ্য, বিদ্যুৎ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, বাংলাদেশের বেকার যুবকদের বিদেশে কর্মসংস্থান তৈরীসহ বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ বিষয়গুলি জনসাধারণের আজ অজানা নয়। বিশ্ব মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের রাস্তায় পা ফেলতে শুরু করছে। বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান বর্তমান সরকারের সাফল্যে ও প্রধানমন্ত্রীর দেশ চালনার নৈপুণ্যতা ও দক্ষতার বিচার বিশ্লেষণে সম্মান সূচক ডিগ্রী যেমন ৯টি ডক্টর অব লজসহ ১৪টি সম্মান সূচক ডিগ্রী প্রদান এবং ১২টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় মনোবল ও আপোষহীন চেষ্টায় কয়েকজনকে বিচারের কাঠগড়ায় দাড়করিয়ে ফাঁসির আদেশ কার্যকর করা হয়েছে। অপরাধী যে কেহই হন না কেন তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শাস্তির স্বাদ গ্রহন করতেই হবে।

আমরা যত উন্নয়নের কথাই বলিনা কেন বাংলাদেশের সকল সফলতার মূলেই বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের ইতিহাস, রাজনীতির ইতিহাস, দেশ গড়ার ইতিহাস যুগযুগ ধরে স্বাক্ষী হয়ে থাকবে। সরকার বদল হতে পারে কিন্তু বাংলার স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, বাঙালীর অবিসাংবাদিক নেতা, স্বাধীনতার ঘোষক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের অবদানকে কেহই অস্বীকার করতে বা মুছে ফেলতে পারবে না।

কালের কণ্ঠ
editorial@kalerkantho.com
সম্পাদকীয়
www

ডা. মো. ফজলুল হক ▷

পোড়া মানুষের কান্না আর কত দিন?

মানুষ হত্যার বিভীষিকাময় ঘটনায় বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিধর রাষ্ট্র, এমনকি জাতিসংঘও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এখন হরতালের ধরন দেখে মানুষের মধ্যে একটি প্রশ্ন—গদি দখলের জন্যই যদি হরতাল হবে, তাহলে কেন মানুষ পুড়িয়ে মারছে? তাদের কি নির্বাচনে ভোটের দরকার নেই? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ বানচালের জন্য কি সরকারের ওপর পরোক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করছে? তারেক রহমান ও খালেদা জিয়ার মামলা প্রত্যাহারের জন্যই কি এই নাশকতা?

কে শোনে কার কান্না? কে বোঝে কার বেদনা? কে নেবে কার অভাবের বোঝা? কে নেভাবে পেট্রলবোমার লেলিহান শিখা? স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষ আজ অসহায় ও চিন্তিত—কখন কার স্থান হয় বার্ন ইউনিটে! সর্বত্র একটি সংশয় সবার মধ্যে কাজ করছে। একটি কাক বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা গেলেও শত শত কাক একত্রে জড়ো হয়ে দুঃখ প্রকাশ করে, আর্তনাদ করতে থাকে কা কা স্বরে। আজ রাজনীতির নামে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে, ক্ষমতা দখলের জন্য কিংবা যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর জন্য ধ্বংসাত্মক হরতাল-অবরোধের মাধ্যমে মানুষ হত্যা ও সম্পদের ক্ষতি করা হচ্ছে। এ ধ্বংস তৎপরতা দেখেও কিছু রাজনৈতিক নেতার মনে একটুও দুঃখকষ্টের ছাপ পড়ছে না। সারা দেশে যানবাহন যথারীতি চলছে, তবে প্রয়োজনের তুলনায় কম এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছিল। হা-হুতাশ, অভাব-অনটন তেমন একটা ছিল না। শান্তিতেই ছিলাম অনেকাংশে। এখন অভাবনীয় ঘটনায় দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ। মানুষ এ ধরনের রাজনীতি বুঝতে চায় না। সবার ঊর্ধ্বে জীবন। জীবনে বেঁচে থাকতে চায়। মানুষ অনেক কঠিন কাজকে মাথা পেতে নিতে রাজি থাকলেও বর্তমানের সহিংস হরতাল কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না। ১৫ লাখ পরীক্ষার্থীই শুধু নয়, পুরো জাতি আজ শঙ্কিত। বর্তমানে প্রতিটি পরিবারে একটি বা দুটি সন্তান। সে কারণে কোনো ঘটনায় একটি সন্তান বা পরিবারের কর্মক্ষম লোকটির অকালমৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কে নেবে তাঁর সংসার চালানোর দায়িত্ব? কেউ নেবে না। না খেয়ে মরতে হবে, নচেৎ ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে চলতে হবে। এটি কারো কাম্য নয়। এ ধরনের হিংস্রতার সংস্কৃতি পরিহার করে সুস্থ রাজনীতিতে ফিরে আসতে হবে। রোগ-শোক বা বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুকেও মেনে নিতে কষ্ট হয়। মা-বাবাসহ আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাই চোখের জলে দুঃখ ও সমবেদনা জানিয়ে চিরবিদায় দেয়। অপরাধীদের দুনিয়াতে শাস্তির বিধান বিভিন্ন প্রকারের দণ্ডারোপের মাধ্যমে, যেমন—হাজতবাস, বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা ফাঁসি ইত্যাদি। অপরাধ বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ, বিচারকাজ বিলম্বিত হওয়া। কিন্তু অপরাধীর বিচারের ক্ষেত্রে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি একমাত্র পরকালে, জাহান্নামিদের জন্য সংরক্ষিত। বর্তমানে হরতাল-অবরোধে যানবাহনে অগ্নিসংযোগ দ্বারা মানুষ ও সম্পদের ক্ষতি করা হচ্ছে, এগুলো কোনো দল বা গোষ্ঠীর জন্য অমঙ্গল ছাড়া কিছুই বয়ে আনবে না। প্রকৃত উদ্দেশ্যও হাসিল হবে না। এটি শতভাগ সত্য। সূরা বাকারার ১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কোরো না।' রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য আগুন দিয়ে কাউকে শাস্তি প্রদান করা অবৈধ' (আবু দাউদ, হাদিস নম্বর ২৬৭৫)। অনেক সময় দেখেছি একজন দক্ষ ড্রাইভারও রাস্তা পারাপারের সময় বিষধর সাপকে রক্ষায় গাড়ি থামাতে। অর্থাৎ মানুষ একটি প্রাণীর জীবন দিতে যেহেতু অক্ষম, সেহেতু জীবন কেড়ে নেওয়া বা বিনা কারণে হত্যার অধিকারও দেওয়া হয়নি। বিষাক্ত সাপসহ অন্য কোনো হিংস্র প্রাণীকেও অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রচলিত হরতাল-অবরোধের ক্রিয়াকর্ম দেখে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বটে; কিন্তু প্রকৃত মানুষের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ব্যক্তিস্বার্থ ও ক্ষমতার লোভ এতটাই প্রবল যে সুস্থ বিবেক দিয়ে চিন্তা করার সময় নেই। মানুষের জীবন নিয়ে ভাবারও অবকাশ নেই। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু যে কত কষ্টের তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়, তবে মুখ-জিহ্বা ও ঠোঁটে গরম চায়ের ছেঁকা লাগে তখন কিছুটা অনুভব করা যায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে জনসাধারণ ভয়ভীতিতে দিনাতিপাত করছে।

সম্পদের ক্ষতির হিসাব দূরে থাক, মানুষের জীবন যেখানে তুচ্ছ, সাধারণ জনগণের একটাই আবেদন—আর যাই হোক ধ্বংসাত্মক বা মানুষ পোড়ানোর হরতাল-অবরোধ বন্ধ হোক। এ অভিশাপ থেকে বাঁচতে দেশের মানুষ সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে। বিভিন্ন দল ও সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ঝড় তুলেও আগুন নেভানো সম্ভব হচ্ছে না। সবারই ধারণা, যাঁর হুকুমে হরতাল-অবরোধ, তাঁর হুকুমেই আগুন বন্ধ হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ দায় অবশ্যই বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটকে নিতে হবে। কোনোভাবেই এ দায় এড়িয়ে যাওয়ার পথ খোলা নেই। দায় নিয়েই বা কী হবে, কেউ কি পারবেন মায়ের কোলে তাঁর শিশুকে ফিরিয়ে দিতে? পারবেন কি স্বামীহারা বিধবার দুঃখ ও অভাবের সংসার চালানোর দায়িত্ব নিতে? পারবেন কি ওই মা-বাবা যাঁরা একমাত্র সন্তান হারিয়েছেন, তাঁদের সন্তান ফিরিয়ে দিতে? না, কোনো দিন সম্ভব নয়। বিশ্বে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ও অকার্যকর রাষ্ট্রের মধ্যে পাকিস্তানের নাম প্রথম স্থানে। বিশ্বের কোথাও কোনো ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনা ঘটলেই ওই দেশে কর্মরত পাকিস্তানিদের ভালো-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ না করেই গ্রেপ্তার করা হয়। সেদিক থেকে আমরা অনেক ভালো ছিলাম, এখনো আছি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের সন্তানরা চাকরি করছে সুনামের সঙ্গে; বর্তমানের সহিংস ও ধ্বংসাত্মক হরতালের কারণে তারাও পড়তে পারে বিপদে। এটি একটি সতর্কবার্তা। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে আমেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের ধ্বংসাত্মক হরতালের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। তারা আরো বলেছে, গণতান্ত্রিক ও উদীয়মান বাংলাদেশে হরতাল-অবরোধের নামে এ ধরনের অপকর্মের ন্যূনতম যৌক্তিকতা নেই। এ ছাড়া মানুষ হত্যার বিভীষিকাময় ঘটনায় বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিধর রাষ্ট্র, এমনকি জাতিসংঘও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এখন হরতালের ধরন দেখে মানুষের মধ্যে একটি প্রশ্ন—গদি দখলের জন্যই যদি হরতাল হবে, তাহলে কেন মানুষ পুড়িয়ে মারছে? তাদের কি নির্বাচনে ভোটের দরকার নেই? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ বানচালের জন্যই কি সরকারের ওপর পরোক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করছে? তারেক রহমান ও খালেদা জিয়ার মামলা প্রত্যাহারের জন্যই কি এই নাশকতা? জনমনে অনেক আলোচনা-সমালোচনা ঘুরপাক খাচ্ছে। তবে মোদ্দা কথা হলো, যাই ভাবুন কিছুতেই কিছু হবে না। যতক্ষণ না খালেদা জিয়া সহিংস হরতাল বন্ধ করবেন। অথবা জনগণ ও সরকারের চাপে মাথানত করতে বাধ্য হবেন। তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে ধ্বংসাত্মক হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি থেকে বেরিয়ে এলেই মানুষ ধন্যবাদ জানাবে। মানুষ অকালমৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আপনার জন্য দোয়া করবে। এটিই হবে মহৎ কাজ।

লেখক : অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

ধর্ম
কালের কণ্ঠ
dharma@kalerkantho.com
শুক্রবার
১ মে ২০১৫
১৮ বৈশাখ ১৪২২
১৫

ইসলাম নিয়ে মওদুদীর বিভ্রান্তি

মো. ফজলুল হক ▷

বর্তমান যুগ ফেতনা-ফাসাদের যুগ। এ যুগে দ্বীন ও ইমানের হেফাজত সবচেয়ে জরুরি কাজ। হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার ধরে রাখা যেমন কঠিন, তার চেয়েও ইমানের হেফাজত আরো কঠিন। অনেক ফেতনার বাহ্যিক ইসলামী আবরণের কারণে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমান তার প্রকৃত রূপ সহজে ধরতে পারেন না। এমন একটি জটিল ফেতনার নাম মওদুদী ফেতনা।

মওদুদী সাহেব তাঁর লিখিত বিভিন্ন বইয়ে নবী-রাসুলদের তথা ইসলাম সম্পর্কে যেসব বিরূপ মন্তব্য করেছেন, তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হলো। যেমন মওদুদী বলেন, 'নবীগণ মাসুম (নিষ্পাপ) নন। প্রত্যেক নবীর দ্বারাই কিছু না কিছু গোনাহ সংঘটিত হয়েছে'—(তাফহীমাত ২/৪৩)। 'কোনো কোনো নবী দ্বীনের চাহিদার ওপর অটল থাকতে পারেননি, বরং তারা নিজ মানবীয় দুর্বলতার কাছে হার মেনেছেন'—(তাফহীমুল কোরআন ২/৩৩৪)। 'নবী হোক বা সাহাবা হোক কারো সম্মানার্থে তার দোষ বর্ণনা না করাকে জরুরি মনে করা (মওদুদীর দৃষ্টিতে) মূর্তিপূজারই শামিল'—(তরজমানুল কোরআন, সংখ্যা ৩৫, পৃষ্ঠা ৩২)। 'হজরত ইউনুস (আ.) ঠিকমতো নবুয়তের দায়িত্ব পালন করেননি'—(তাফহীমুল কোরআন ২/১৯)। 'হজরত ইব্রাহিম (আ.) ক্ষনিকের জন্য শিরকের গোনাহে নির্মজ্জিত ছিলেন'—(তাফহীমুল কোরআন ১/৫৫৮)। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে মওদুদী বলেন, 'মহানবী (সা.) মানবিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। অর্থাৎ তিনি মানবিক দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে গোনাহ করেছিলেন'—(তরজমানুল কোরআন, সংখ্যা-৮৫, পৃষ্ঠা-২৩০)। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সম্পর্কে মওদুদী বলেন—'সাহাবাদের সত্যের মাপকাঠি জানবে না'—(দপ্তরে জামায়াতে ইসলামী, পৃষ্ঠা-৭)। শুধু তাই নয়, ইসলামের বহু মৌলিক পরিভাষা বিকৃত করার ধৃষ্টতা তিনি দেখিয়েছেন। মওদুদী মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ইমান হরণের অপচেষ্টা চালিয়েছেন, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। নদওয়াতুর উলামার সাবেক শায়খুল হাদিস হজরত মাওলানা ইসহাক সিন্দিলভী সাহেব বলেন, "মওদুদী সাহেবের কিতাব 'খিলাফত ও মুলুকিয়াত' পড়ে মনে হলো, মওদুদী সাহেব 'ছাবাই' ফেতনার মুজাদ্দিদ, চিন্তাধারায় একজন পাক্কা শিয়া। সাহাবিদের গালাগাল করে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুন্নীদের শিয়া বানানোর ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন।" মওদুদী সাহেবের পুত্র 'হায়দার ফারুক বলেন, 'বাবা (মওদুদী) উপমহাদেশে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ৯ সন্তানের কেউই দলটির রাজনীতিতে জড়াননি। বাবার রাজনৈতিক দলে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য সন্তানদের ওপর পারিবারিক কোনো চাপও ছিল না। বরং তারা যাতে জামায়াতে ইসলামের রাজনীতিতে না জড়ান, সেজন্য তিনি সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত রহস্য ছেলেমেয়েদের তিনি কোনো দিন বলেননি'—(সূত্র : বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত ৬ ও ৮ অক্টোবর ২০১৩ এর সংবাদ)। তা ছাড়া উপমহাদেশের খ্যাতনামা উলামাদের প্রায় সবাই মওদুদী সাহেবের চিন্তাধারায় যেসব মারাত্মক ভুলভ্রান্তি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে, সে বিষয়ে জাতিকে সতর্ক করেছেন। এমনকি জামায়াতে ইসলামীর প্রথম দিকের অনেক নেতাও মওদুদীকে সেসব ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করেছেন। কিন্তু যখন দেখা গেল মওদুদী সাহেব তা প্রত্যাহার করার পরিবর্তে মানুষকে আরো বেশি গোমরাহির দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, তখন তাঁরা একে একে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে জামায়াতে ইসলামী দল থেকে পৃথক হয়ে গেছেন। উদাহরণত, জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা নায়েবে আমীর মাওলানা মনজুর নো'মানী, সেক্রেটারি কমরুদ্দীন বেনারসী, মজলিসে শুরার অন্যতম সদস্য হাকীম আবদুর রহীম আশরাফ, বিশ্ববরেণ্য মুসলিম মনীষী মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) প্রমুখসহ প্রথম সারির প্রায় আরো ৭০ জন নেতা জামায়াতে ইসলামী থেকে পদত্যাগ করেছেন—(ফতোয়ায়ে রাহমানিয়া, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৫৮)। হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা আহমদ শফি সাহেব বলেন, 'জামায়াতের সহযোগী না বলে বরং আমাকে গুলি করে মেরে ফেলুন'—(কালের কণ্ঠ ৪-৪-২০১৩)। বর্তমানের জামায়াতে ইসলামীও কোনো ইসলামী দল নয়। তাদের বেশির ভাগ নেতা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, যেমনটা মওদুদীরও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় শিক্ষা ছিল না। তাদের দেহ-পোশাক ও কাজকর্মে ইসলামের বালাই নেই। তারা ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটছে। সম্প্রতি খবর বের হয়েছে, জামায়াত নেতারা নিজেদের সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা দেয় না, এমনকি রাজনৈতিক ধ্বংসাত্মক কাজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে তাদের ব্যবহার করে না; অথচ গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের মওদুদীবাদ শিক্ষা দিয়ে একদিকে যেমন তাদের ইমান হরণ করছে, অন্যদিকে তাদের জিহাদের নামে মানুষ হত্যা ও সম্পদের ক্ষতি সাধনে প্ররোচিত করছে। অতএব তাদের থেকে সাবধান!

লেখক : প্রফেসর, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ডা. মো. ফজলুল হক

বিজয়ের মাসেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক, বাংলাদেশের স্থপতি সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান আমলে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত, ২৩ বছরের ১৩ বছরই জেলজুলুম ভোগ করেছেন বাঙালি জাতিকে স্বৈরশাসনের হাত থেকে রক্ষার জন্য। সেই স্বপ্নের চূড়ান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এর মাত্র এক ঘণ্টা পর, অর্থাৎ ২৫ মার্চ রাত ১টা ৩০ মিনিটে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়ি থেকে যুদ্ধাপরাধীদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে আটকে রাখে তাঁকে। পাকিস্তানের সেনাদের ভাষা উর্দু, সাঁতার কাটতে জানে না, রাস্তাঘাট চেনে না, চেহারাও ভিন্ন। তাদের নিয়ে এলো ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর বাসায় স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই? তারাই এ দেশের আলো-বাতাসে লালিত মানুষ নামের কলঙ্ক—রাজাকার, আলবদর, আলশামস—এক কথায় যুদ্ধাপরাধী। তারা যুগ যুগ ধরে ধর্মের নামে মওদুদীবাদ নামক ভ্রান্ত ও অনৈসলামিক কাজে মানুষকে শুধু বিপথগামীই করেনি, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাদের হাত ধরে নিয়ে গেছে ঢাকা থেকে বাংলার গ্রামগঞ্জে। সেনাদের বোঝানো হয়েছে, যারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে বা যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়, তারা সবাই কাফের, সে যদিও মসজিদের ইমাম সাহেব হন, তবু কাফের। তাদের ধরে ভাট করো (হত্যা করো)। দিনের বেলায় সেনাদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়েই শুধু ক্ষান্ত হয়নি, লুট করেছে স্বর্ণালংকার, ব্যাংকের টাকা, খাদ্যের জন্য গরু-ছাগল। হত্যা করেছে নিষ্পাপ শিশু। বেয়নেট দিয়ে গর্ভবতী মায়েদের পেট চিড়ে বাচ্চাও বের করে হত্যা করেছে ওই যুদ্ধাপরাধী চক্র, এমনকি তারা কোমলমতি মেয়েদেরও নিয়ে গেছে, যাদের খোঁজ স্বাধীনতার ৪১ বছর পরও তার মা-বাবা জানেন না তাদের অবস্থা কী? মা-বাবা তাঁদের সন্তানের জন্য আজও পথপানে চেয়ে আছেন, আমার সন্তান এসে মা বলে ডাকবে। আজও তাঁদের চোখের জল ঝরছে। এমনিভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তাসহ প্রায় ৩০ লাখ নিরস্ত্র নারী-পুরুষকে হত্যা করা হয়েছে। গণকবর রচনা করা হয়েছে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ সব জেলার বিভিন্ন স্থানে। তেমনিভাবে বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারী, ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলাকারীদের বিচারের রায় ও এর দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যত বিলম্বিত হবে, ততই ওই পক্ষটি মাথাচাড়া দিয়ে সমাজে গুম, হত্যা, অগ্নিকাণ্ড, ভাঙচুরসহ দেশদ্রোহিতামূলক কাজের মাত্রা বেড়েই যাবে, যা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। তবে তাদের অন্যায়ের মাত্রা অনেক বেশি। ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ তাদের এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ মেনে নিতে পারছে না। মাত্র ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে একটি স্বাধীন দেশ ও একটি স্বাধীন জাতি উপহার দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু জেলজুলুম-নির্যাতন ভোগের মধ্য দিয়ে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বলতে চাই, মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শত্রুরা যদি তাদের সহযোগিতা না দিত, তাহলে ৩০ লাখ মানুষ শহীদ হতো না এবং দুই লাখ মা-বোনকে ইজ্জতও হারাতে হতো না। এত ঘরবাড়ি ধ্বংস হতো না। আমাদের মধ্যে এ ধরনের শত্রুতাও সৃষ্টি হতো না। অর্থনীতিতে বাংলাদেশ আরো এগিয়ে যেত সন্দেহাতীতভাবে। দেশের মানুষ যুদ্ধাপরাধীদের ত্বরিত বিচার ও এর বাস্তবায়ন দাবি করছে। জাতি এ কলঙ্কের দাগ মুছে কলঙ্কমুক্ত হয়ে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়। এটাই সবার প্রত্যাশা এবং সময়ের দাবি। মানুষের এই দাবি পূরণে সবাইকে আবারও একাত্তরের মতোই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

প্রতিটি দেশেই বিভিন্ন মতাদর্শের লোক বা সংগঠন থাকতেই পারে। মত প্রকাশের স্বাধীনতাও রয়েছে। স্বাধীনতার অর্থ এমন নয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের পক্ষে রায় দেবে তার বিপরীতে অবস্থান নিয়ে মানুষ হত্যার পথ বেছে নিতে হবে। দেশের নারী, শিশুহত্যার পাশাপাশি কোমলমতি মেয়েদের ধরে নিয়ে পাশবিক অত্যাচারের পর গুলি বা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করার অনুমতি ইসলাম দেয়নি বরং কোরআন শরিফের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ আছে যে হত্যার বিনিময়ে হত্যার বিধান। একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধে প্রত্যেক যুদ্ধাপরাধী একাধিক মানুষ হত্যা করেছে। তাই বলে একজনকে একাধিকবার ফাঁসি দেওয়া যায় না, যদি সে সুযোগ থাকত তাই করা উচিত ছিল। যেহেতু জীবন মাত্র একটি। তাদের আজ মানুষ ঘৃণার চোখে দেখে, এমনকি তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতেও চায় না সমমনা রাজাকার ছাড়া। আজ থেকে প্রায় ৪১ বছর আগে এ নারকীয় ঘটনা ঘটলেও তাদের বিচার হচ্ছে না কেন? বিষয়টি দেশের সব শ্রেণীর মানুষের মনে দানা বেঁধে আছে। এ সরকারকে ভোটের মাধ্যমে ম্যান্ডেট দিয়েও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিলম্বিত হচ্ছে কেন? রাজাকার তথা যুদ্ধাপরাধী চক্রের বিচারকাজ বিলম্বিত করার জন্যই আজ ভাঙচুর, জ্বালাও-পোড়াও, হত্যা, ছিনতাই, পুলিশের অস্ত্র লুট ও গায়ে পেট্রল ঢেলে হত্যার মতো ন্যক্কারজনক কাজের দ্বারা স্বাধীন রাষ্ট্রকে পাকিস্তানের মতো অকার্যকর রাষ্ট্র বানানোর পাঁয়তারা করছে। এরাই যুদ্ধাপরাধীদের নতুন প্রজন্ম। তাদের চিহ্নিত করে বিচারের কাঠগড়ায় নেওয়ার বিকল্প নেই। তারা ধর্মের নামে রাজনীতির কথা বলে মানুষ হত্যা ও সম্পদের ক্ষতি করছে। এ দেশের একটি রিকশাও যদি ভাঙা হয়, তার জন্য রিকশাওয়ালা বা মালিকের কাছেই শুধু নয়, জাতির কাছেও এর হিসাব দিতে হবে। ডিসেম্বর বিজয়ের মাস। এ মাসেই হোক যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পরিসমাপ্তি—এটাই এ দেশের স্বাধীনচেতা মানুষের প্রাণের দাবি। তবে তদন্ত হতে হবে নিরপেক্ষ ও সঠিক, যাতে কোনো নির্দোষ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

লেখক : মুক্তিযোদ্ধা, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান, মেডিসিন, সার্জারি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

ঈমান হরনের কৌশল!

প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হক

বিভিন্ন পত্রিকায় ও ইসলামী চিন্তাবিদদের লিখিত প্রতিবেদন এবং হাক্কানী আলেম, পির মাশায়েকদের লিখিত বইয়ের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী দলের সাথে প্রকৃত ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ তারা মাওঃ মওদুদীর ভুল ব্যাখ্যা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে দলীয় স্বার্থে প্রচার করে সমস্যার সৃষ্টি করেই যাচ্ছেন। তারা মওদুদী সাহেবের মনগড়া ভুল ব্যাখ্যাকৃত কোরআন শরীফের (তাফহীমুল কোরআন) মতবাদে বিশ্বাসী। আরও স্পষ্ট যে, যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর জন্য বিদেশী অনুসারীদের তাদের পক্ষে ওকালতী করে যাচ্ছেন। বিগত ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা এদেশের ৯৮ শতাংশ মানুষ মনের দাবী স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছিল এবং ৩০ হাজার মানুষ হত্যা ও ধর্ষণের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল। আজও তারাই যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর জন্য পত্রিকায় বিভ্রান্তি কর সংবাদ পরিবেশন করতে যাচ্ছে যা অত্যন্ত দুঃখ জনক। এদেশের ৯০ শতাংশের বেশী মানুষ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়। গত ২৭ শে ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হাক্কানি আলেমগণ উল্লেখ করেছেন জামায়াতে ইসলামের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসী শরীয়াহ আইনেই হওয়ার দরকার। এটা দেশ ও জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। তাদের উশৃঙ্খলতা এটাই প্রমান করে এদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের ভুল মতবাদের কারণে ভুল পথে ও মতবাদের দিকে চলে যাবে নিঃসন্দেহে। উপমহাদেশের কয়েক জন প্রখ্যাত আলেমদের লেখা মওদুদীবাদের ভুল ব্যাখ্যায় ও জামায়াতে ইসলাম প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যাখ্যার আলোকে উল্লেখ করছি। কাহাকেও ছোট বা অসম্মান করার জন্য নয়। ঈমানের সঠিক হেফাজতের জন্য কিছুটা হলে উপকারে আসবে। দ্বীন হচ্ছে আল্লাহর হুকুম ও রসুল (সঃ) এর হুবহুব অনুসরণ করা। অতএব কেউ যদি এই দ্বীনের মধ্যে নিজের মনগড়া কিছু যোগ বা বিয়োগ করে তাই হচ্ছে "বেদআত" যা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামে নিয়ে যায়। বর্তমান জামানার "জামায়াতে ইসলামী" নামক রাজনৈতিক সংগঠনের মূল নীতি নির্ধারক, তৎকালীন সময়ের একজন ব্যক্তি জনাব মওদুদী সাহেব নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোরআন ও হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে হাজারো সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মানুষকে যুগ যুগ ধরে বিভ্রান্ত করার একটি দ্বার খুলেছেন। এই ভ্রান্ত মতের স্বরূপ সাধারণ মানুষের কাছে উম্মোচনের জন্যই আমার এ লেখা। যা আমি ঈমানী দায়িত্ব বলে মনে করি। আমাদের সকলের ঈমানের সঠিক হেফাজতের জন্য এ মুহূর্তেই সতর্ক হওয়া দরকার। উল্লেখ্য হযরত মাওলানা শামছুল হক (রঃ) সদর সাহেব প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল আল-জামেয়া লালবাগ ঢাকার লিখিত "ভুল সংশোধন" বইটি পড়ুন, সঠিক ঈমানের হেফাজতের জন্য বুঝতে বাকী থাকবেনা ইনশাআল্লাহ্। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নামক রাজনৈতিক দলটির বাহ্যিক নামকরণে সাধারনধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইয়েরা সকলেই একবাক্যে বলবেন একটি ইসলামিক দল। এ দলে নাম লেখালেই দুনিয়াতে শান্তি এবং আখেরাতে মুক্তি এবং মৃত্যু বরণ করলে শহীদ, বাচলে গাজী এম.পি মন্ত্রী হলে পাজারো গাড়ী আর ঢাকায় ৫তলা বাড়ী আরও অনেক কিছু পাওয়া যাবে। মাসিক তরজুমানুল কোরআন রবিউল আউয়াল সংখ্যায় উদৃত নিজ জবান ও মাওলানা মওদুদী" নামক বইতে উদ্ধৃত জামায়াতের সাবেক ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্দুল আলী খানের বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা যায় যে জনাব মওদুদী সাহেব দ্বীনী ও দুনিয়াবী শিক্ষায় কোনটিতেই পরিপূর্ণ শিক্ষিত নন (ফাতওয়ায়ে রাহমানিয়া ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৮)। তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসা (ভারত) মিজান বা তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন মাত্র। তবে আল্লাহ্‌পাক তাকে অনেক মেধা দিয়েছিলেন কিন্তু তার জ্ঞান ইসলামের বিপক্ষে কাজ করায় ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমান আজ ঈমান হারানোর দিকে চলে যাচ্ছে যা প্রকৃত অর্থে দুঃখ জনক। জামায়াতে ইসলামের সদস্যদের দেশ প্রেম বলতে কিছুই নেই যার প্রমান বায়তুল মোকাররম মসজিদের জায়নামাজ। কার্পেট পোড়ানো, কোরআন শরীফে অগ্নিসংযোগ, গাড়ী, দোকান পাট ও বাড়ী ঘর, অফিসে আগুন দিয়ে পোড়ানো, রিক্সা ভ্যান, সিএনজি ভাঙ্গচুর, মানুষ হত্যা ইত্যাদি। তারা ইসলামের কথা বলে এদেশের সাধারণ মানুষকে নিজেদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করছেন। ইসলামে কোথাও ঐ ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজের সমর্থন করে না। হযরত মাওলানা সামছুল হক (রঃ) এর "ভুল সংশোধন" বইটির ১২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন "জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করা, কাজ করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েজ হইবে না। এমনকি যাহারা হাদিসের কোরআনের দোষচর্চায় লিপ্ত তাহারা যে কেহই হন না কেন, তাহাদিগকে ইমাম বানাইয়া পিছনে নামাজ পড়া কিছুতেই জায়েজ হইবে না" কারণ, যেহেতু তাহারা হাদিসকোরআনের দোষচর্চার কারণে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত হইতে খারেজ হইয়া গিয়াছেন। তারা যদি প্রকৃত অর্থেই ইসলামকে ও দেশকে ভালবাসতেন তাহলে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মসজিদের কার্পেট, কোরআন শরীফে গাড়ী বাড়ী ও জাতীয় পতাকায় অগ্নিসংযোগ করতেন না।

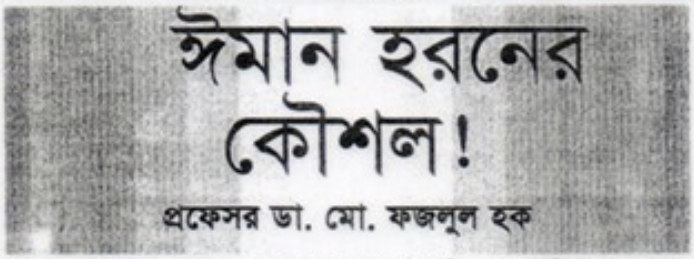

উপমহাদেশের খ্যাতনামা উলামাদের প্রায় সকলেই মওদুদী সাহেবের চিন্তা ধারায় যে সব মারাত্মক ভুল ভ্রান্তি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে প্রথমে তা মওদুদী সাহেব ও তার প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবর্গকে বিভিন্নভাবে অবহিত করে সেগুলো প্রকাশে প্রত্যাহার করতে বলেছেন। সাহাবায়ে কেরামের জীবনে বিভিন্নভাবে কালিমা লেপনের জন্য মওদুদী সাহেব "খেলাফত ও মুলুকিয়াত" নামক স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন যার সার কথা হল সাহাবাকে জানা ও মানার জন্য সাহাবাদের জামাত নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু যখন দেখা গেল মওদুদী সাহেব বা জামায়াতের নেতৃবর্গ তা প্রত্যাহার করার পরিবর্তে দলের স্বার্থে বাড়তি কিছু বিভ্রান্তি যোগ করে ক্রমাগত তা প্রতিষ্ঠিত করতেই অপচেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছেন। তখন মুসলিম জনসাধারণকে গোমরাহী থেকে বাঁচানোর স্বার্থে উলামায়ে কেরামগণ মওদুদী সাহেবের মৌলিক ভুলগুলো সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মুসলিম উম্মাহর সামনে তুলে ধরতে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ) হলেন সাহেব সংশোধনের লিখিতে "ভুল সংশোধন নামক পুস্তক" লিখেছেন ধর্ম প্রাণ মুসলমানদের ঈমানের হেফাজতের জন্য। (কিতাবটির প্রাপ্তিস্থান বায়তুল মোকাররমের নীচ তলায় ইসলামীক ফাউন্ডেশনে)। তিনি তার পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, মওদুদী সাহেবের প্রাথমিক পর্যায়ের তুলনামূলক ভ্রান্তিমূলক রচনা-প্রবন্ধ ইত্যাদি দেখে যেসব বিদগ্ধ উলামায়েকেরাম ও ইসলামী বুদ্ধিজীবীগণ জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠালগ্নে জনাব মওদুদী সাহেবের সঙ্গে এমনকি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদ সমূহে অধিষ্ঠিত হয়ে মওদুদী সাহেবকে খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। অতঃপর মওদুদী সাহেবের ক্রমশঃ ভুলপথে চলতে দেখে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। জনাব মওদুদী সাহেবের ধারণা এ মুহূর্তে ভুল সংশোধন করলে আমাকে সবাই ভুল বুঝবে ও জামায়াতে ইসলামী দলটি ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছাবে। মওদুদী সাহেবের দুরভি সন্ধি বুঝতে পেরে ঐ সময়ে জামায়াতের উচ্চপদস্থ ৭০ জন নেতা একে একে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে জামায়াত দল থেকে পদত্যাগ করেন। তারা হলেন জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা নায়েবে আমীর মাওঃ মনজুর নো'মানী, সেক্রেটারী জনাব কমরুদ্দীন খেলাহী (এম,এ), মজলিসে শুরার অন্যতম সদস্য হাকীম আঃ রহীম আশরাফী, মাওলানা আমীর আহসান এসলাহী, বিশ্ব বরেণ্য দায়িয়ে ইসলাম মাওঃ আবুল হাসান আলী নদভী, জামায়াতের অন্যতম রুকন ও মওদুদী সাহেবের জন্য নিবেদিত প্রাণ ডক্টর এসরার আহমদ সাহেব প্রমুখসহ প্রথম জামায়াতে ইসলাম দল থেকে পদত্যাগ করেন এবং ঈমানের হেফাজতের স্বার্থে এ দলে যোগদান করতে অনুরোধ করেছেন। সাথীর আরো অনেক নেতৃবর্গ। (ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৯)। (৪) মাওঃ মনযুর নো'মানী লিখিত "মাওদুদী সাহেবের সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত")। যুগ সেরা মুহাক্কিক উলামায়েকিরাম সঠিক দলিলের ভিত্তিতে মওদুদী সাহেবের গোমরাহ চিন্তাধারাগুলোর তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করে অনেক বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখেছেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম যথাক্রমে-১) মাওঃ মনজুর নো'মানী "মাওঃ মওদুদী সে মেরী রেফাকৃতকী ছার গুযাশত" অনুবাদ "মাওঃ মওদুদীর সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত"। ২) শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রঃ-এর "ফিতনায়ে মওদুদীয়াত"। ৩) বিশ্ববরেণ্য আলেম ও ইসলামী দার্শনিক জাষ্টিস মুফতী, মাওঃ মুহাম্মদ তকী উসমানীর "হযরত মুয়াবিয়া আওর তারিখী হাক্কায়েক" বাংলা অনুবাদ "ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুয়াবিয়া। ৪) মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরীদপুরী রঃ-এর "ভুল সংশোধন" ও হযরত মাওঃ ইউসুফ বিন্নোরী রঃ ইত্যাদি, বিস্তারিত দেখার প্রয়োজন বোধ করলে উপরোক্ত বইগুলো দেখুন।

এ থেকে বুঝা যায় জামায়াতে ইসলাম প্রকৃতপক্ষে কোন ইসলামিক দল নয়। তাদের মধ্যে ইসলাম বিকৃত রূপে রয়েছে। কতটাই ইসলাম সম্মত। উল্লেখ্য হযরত মাওলানা শামছুল হক (রঃ) ছদর সাহেব হুজুর এর লিখিত কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমানিত "ভুল সংশোধন" নামক বইটিতে মওদুদী সাহেব এর ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন। এখানে তাকে হেয় করার জন্য নয় বা ছোট করার জন্যও নয় শুধু অনুরোধ করেছেন ভুল সংশোধন করে সঠিক পথে নিজেকে চলতে ও জামায়াতের অন্যান্য সদস্যদের চালাতে। বইটি হতে কয়েকটি লাইন তুলে ধরা হলো। মাওলানা সাহেব বলেন, আমি প্রায় ১৮ বছর পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীকে নৈতিকভাবে সমর্থন করিয়া আসিতেছিলাম। ইহার পরে যখন মওদুদী সাহেবের 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' নামক বইখানা আমার হস্তগত হয় তখন উহা পড়িয়া দেখিয়া আমি অবাক হইয়া যাই-অন্তরই খ্রীষ্টান পাদ্রীদের, ইসলাম বিরোধীদের মুখ প্রসূতসমূহেরই বহিঃপ্রকাশ। হযরত ওছমান (রঃ)-এর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ, আশারায়ে মোবাশ্শারা যে দশজন ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর প্রতি দুনিয়াতে থাকাকালীন হুজুর (সাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাক বেহেশতের সুসংবাদ দান করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ ইত্যাদি পড়িয়া ঐ সমস্ত কথা যে, মিথ্যা তাহা কোরআন-হাদীসের দ্বারা প্রমান করিয়া ১৯৫৭ সালে প্রফেসার গোলাম আযম, মাওলানা আব্দুর রহীম ও মাওলানা ইউসুফ প্রমুখ জামায়াতের নেতাদের লালবাগে একত্র করিয়া হযরত মাওলানা শামসুল হক বিশেষ অনুরোধ করেন যে, আপনারা মওদুদী সাহেবের দ্বারা এই সমস্ত বিষয়, আলোচনা করিয়া যাহা মারাত্মক ভুল, ঈমান বিধ্বংসী, উহা সংশোধন করাইয়া দিন; অন্যথায় আমি জাতির দ্বীন ও ঈমানের হেফাজতের জন্য পুস্তকাকারে এই সমস্ত ভ্রান্ত আকিদা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের স্বার্থে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় ঐ ভুলগুলি মওদুদী সাহেব আর সংশোধন করেন নাই বরং ছলে বলে কৌশলে উহা প্রচার করিয়াই যাইতেছেন। পাকিস্থানে জামায়াতে ইসলামী ও অত দল ইসলামী ছাত্র সংঘ এবং আল-বদর আল-শামস্ নামের ইসলামী আন্দোলনের কাজ চালাইয়াছেন। বাংলাদেশ হইবার পরে অত দল মসজিদ মিশন, ইসলামী ছাত্র শিবির কিছুদিন পরে আবার জামায়াতে ইসলামী নামেই সম্মিলিতভাবে সমাজে ইসলামী আন্দোলনের নামে ঐ ভুল প্রচার করিয়া যাইতেছেন। বরং জামায়াতে সাহাবার উপর বিধিত করা যাবে না ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া (১ম খন্ড, লেখক মুফতী মাওলানা মনসুরুল হক ৬৯ পৃষ্ঠা) অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি বন্দেগোমাদী করিয়া আমার কোন ওলী-আল্লাহর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহার সহিত, বেআদবি করিবে, তাহাকে আমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য ঘোষণা দিতেছি, (বুখারী শরীফ)।

হযরত রাসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদিগকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করিয়া ঘোষণা দিয়া বলেন যে, সাবধান! সাবধান!! আল্লাহকে ভয় কর। খবরদার! খবরদার!! আমার পরে আমার আছহাবগণকে তোমরা সমালোচনার বস্তুতে পরিণত করিও না কারণ তাঁহারা আমার সাক্ষ্য মতে ও আমার ছুন্নত দান সূত্রে সমালোচনার উর্ধ্বে এবং যেহেতু আমি তাঁহাদিগকে সাক্ষ্য ও ছুন্নত দিয়েছি এবং আমার এই সাক্ষ্য প্রদান এবং আমার এই ছুন্নত দান স্বয়ং আল্লাহর তরফ হইতে ওহী সূত্রে, অতএব যে কেহ আমার ছাহাবাদিগকে ভালবাসিবে সে ভালবাসা আমাকেই ভালবাসা হইবে এবং যে কেহ আমার ছাহাবাগণকে মন্দ জানিবে বা তাঁহাদের প্রতি বদগোমানী করিবে বা তাঁহাদের প্রতি মনে মনে খারাপ ভাব অথবা শত্রুতার ভাব পোষণ করিবে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আমাকেই মন্দ জানা হইবে এবং আমার প্রতি মন্দ ভাব পোষণ করা হইবে, যে কেহ তাঁহাদিগকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে আল্লাহর দরবারে সেই কষ্ট দেওয়া আমাকে কষ্ট দেওয়ার পর্যায়ে গণ্য হইবে এবং আমাকে কষ্ট দেওয়া স্বয়ং আল্লাহকেই কষ্ট দেওয়ার পর্যায়ে গণ্য হইবে এবং যে কেহ আল্লাহকে কষ্ট দিবে সে অতি শীঘ্র আল্লাহর আযাব এবং আল্লাহর গযবে গ্রেফতার হইবে (তিরমিজি শরিফ ২য় খন্ড ২২৬ পৃষ্ঠা এবং ভুল সংশোধনের ৪১ পৃষ্ঠা)। "আমরা মওদুদী সাহেবের ঐ ভুলসমূহ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছি" যতক্ষণ পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করা, কাজ করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয হইবে না। যাহারা ছাহাবায়ে কেরামদের দোষচর্চায় লিপ্ত তাহারা যে কেহই হউন না কেন, তাহাদিগকে ইমাম বানাইয়া পিছনে নামায পড়া কিছুতেই জায়েয হইবে না। কারণ, যেহেতু তাহারা ছাহাবায়ে কেরামের দোষচর্চার কারণে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত হইতে খারেজ হইয়া গিয়াছে। মওদুদী সাহেব এর ফেতনা তথা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ফেতনা হতে নিজেকে রক্ষা ও ঈমানের হেফাযতে উপরোল্লেখিত বইগুলি পড়ুন।

উপরোল্লেখিত বইগুলি পড়লে বুঝতে পারেন জনাব মওদুদী সাহেব ত্রুটিপূর্ণ মস্তিস্কের অধিকারী এবং সত্যিকার অর্থে ইসলামে তার আদৌ অংশ আছে কিনা?, আল্লাহ্‌পাকই ভাল জানেন। মওদুদী সাহেব কর্তৃক লিখিত "খেলাফত ও মুলুকিয়াত" নামক কিতাবে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের পান্ডিত্য জাহির করার জন্য আল্লাহর সু-সংবাদ প্রাপ্ত দশজন ছাহাবা (রাঃ)সহ অন্যান্য ছাহাবাদের ব্যাপারে মিথ্যা দোষচর্চা করেছেন। প্রকৃত অর্থে ছাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সমালোচনা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা দোষচর্চা করা, মন্দজানা বা তাদের প্রতি মন্দ ধারণা রাখা হারাম। একই ভাবে তাঁহাদের প্রতি ভালবাসা রাখা এবং ভাল ধারণা রাখা ওয়াজেব। উপরের কতিপয় আলোচনা হতে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, মওদুদী সাহেব নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং নিজের জ্ঞান জাহির করার জন্য ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা লগ্নে যে সাহাবায়ে কেরামগণ জীবন পণ চেষ্টা করে শহীদ হয়েছেন, যাদের শ্রমের কারণে আমরা ইসলামের মত একটি সোনার পেয়েছি। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌পাক রাজী হয়েছেন। তাদের ব্যাপারেই দোষচর্চা করে নিজেকে ভবিষ্যতে পরকালের জন্য কতটা ক্ষতি করেছেন এবং তার তৈরীকৃত পার্টি জামায়াতে ইসলাম এবং এর অঙ্গ সংগঠন শিবিরের সদস্যদের কতটা ক্ষতি করেছেন নিরপেক্ষ ভাবে একটু ভেবে দেখুন। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের দুশমনদের সমস্ত চক্রান্তের সমস্ত আশাকে নিরাশ করিয়া ঘোষণা দিলেন, অর্থাৎ আমিই এই স্মারকলিপি (কোরআন) অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই ইহার হেফাজতের ভার গ্রহণ করিয়াছি। কাজেই ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র যতই সুদূর প্রসারী হউক না কেন আল্লাহ্, আমার হেফাজতের মোকাবেলায় সকল চক্রান্তই ধূলিসাৎ হইয়া যাইতে বাধ্য। ইসলামের সহিত শত্রুতা করিয়া নিজের কপাল পোড়ানো ছাড়া অন্য কিছুই লাভ করিবার নাই, (আল-কোরআন)। মওদুদী ফেতনা হতে আমাদের নিজেকে বাঁচতে হবে, মনে রাখতে হবে তার ভ্রান্ত মতবাদের কারণে ঈমান হারা হয়ে মৃত্যু বরণ করে পরকালের কঠিন আজাবে গ্রেফতার হলে কেহই দায় দায়িত্ব নেবেন না। তাই সময় থাকতে মেধা ও জ্ঞান দ্বারা চিন্তার প্রতিফলনের জন্য বিশেষ করে সহজ ও সংক্ষেপে বোঝার জন্য "ভুল সংশোধন" বইটি ধর্মপ্রাণ সকল শ্রেণীর মুসলমান ভাইদের কমপক্ষে একবার পড়া অতীব জরুরী। সবশেষে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যেহেতু বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের মূল আকিদা ইসলাম বিরোধী, এ থেকে নিজেকে হেফাজতে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে সমস্ত ফিৎনা থেকে সকলের ঈমানের হেফাজত, জান, মাল ও ইজ্জতের হেফাজত করুন। আমাদের সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। দেশকে ভালবাসার নৈতিক দায় করুন। সঠিক পথে চলার ও আমল করার তৌফিক দান করুন। মুসলিম হিসেবে সকলেরই ঈমানী দায়িত্ব সকল অইসলামিক কার্যকলাপকে ঘৃণা করা ও বাধা প্রদান যা সকলেরই ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) ও আল্লাহ পাক সমস্ত কুৎসা রটনাকারীকে ঘৃণা করি এবং ক্ষমা চাই। জামায়াতে ইসলাম নামক দলের মধ্যে প্রকৃত ইসলাম খুজে পাওয়া কঠিন। এমনকি ঐ দলে ঈমান নিয়ে টিকে থাকাও অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাদের মুখেই অনেক সমস্যা যা সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইয়েরা বুঝতে পারছেন না। সকল শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে শান্তিতে বসবাস করার আশাবাদ ব্যক্ত করেই শেষ করছি।

আজও তারাই যুদ্ধাপরাধীদের বাচানোর জন্য পত্রিকায় বিভ্রান্তি কর সংবাদ পরিবেশন করতে যাচ্ছে যা অত্যন্ত দুঃখ জনক। এদেশের ৯০ শতাংশের বেশী মানুষ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়। গত ২৭ শে ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হাক্কানি আলেমগণ উল্লেখ করেছেন জামায়াতে ইসলামের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসী শরীয়াহ আইনেই হওয়ার দরকার। এটা দেশ ও জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। তাদের উশৃঙ্খলতা এটাই প্রমান করে এদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের ভুল মতবাদের কারণে ভুল পথে ও মতবাদের দিকে চলে যাবে নিঃসন্দেহে। উপমহাদেশের কয়েক জন প্রখ্যাত আলেমদের লেখা মওদুদীবাদের ভুল ব্যাখ্যায় ও জামায়াতে ইসলাম প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যাখ্যার আলোকে উল্লেখ করছি। কাহাকেও ছোট বা অসম্মান করার জন্য নয়

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও বিশ্বে দেশের ভাব মুর্ত্তি

প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ ফজলুল হক

দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘের বিশেষ পুরস্কার "সাইথ সাউথ" দ্বারা সম্মানিত করেন। প্রধান মন্ত্রী বলেন এটি এদেশের জনগণেরই অর্জন। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যে ১৮টি দেশ এগিয়ে আছে, বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। ক্ষুধা ও দারিদ্র বিমোচনে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে ফলে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ২০০৬ সালে ৫.৭ শতাংশ হতে ২০১৩ তে ৬.৭ শতাংশ। বিশ্ব ব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বিশ্বের সর্বোচ্চ প্রতিবেদনে অর্জিত প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ৫ম স্থানে রয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব বানকি মুন বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য মডেল দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নবেল বিজয়ী অমর্ত সেনসহ বিভিন্ন আন্তার্জাতিক ব্যক্তিত্ব স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নের রোডম্যাপে বাংলাদেশের অবস্থানকে অত্যন্ত স্বর্ণোজ্জ্বল বলে অবিহিত করেন। অমর্তসেন আরও বলেন নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে এগিয়ে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এক ,জনসভায় মন্তব্য করেন উন্নয়নের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম পর্যায়ে। তাছাড়াও কতিপয় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশকে গনতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখ হচ্ছে। বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে আমেরিকায় নির্বাচনের পূর্বেই সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের ফিরিস্তি জনসম্মুখে উপস্থাপন করে জনসমর্থন যাচাই করা হয়। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বাগ-বিতন্ডা হয় জনসমাবেশে একই প-াটফর্মে। সে সকল দেশে উন্নয়নমূলক কর্মের সফলতার মানদন্ডে বিচার বিশ্লেশণ করেই ঐ সরকারকে পূণরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে থাকেন। কারণ হিসেবে বলা যায় দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নের পরিসমাপ্ত ঘটাতে ৫ বছর সময় যথেষ্ট নয়। সে মানদন্ডে বিচার বিশ্লেষণ করতেন বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিতেই হবে। নির্বাচনের পূর্বেই জন সমর্থন যাচাই-বাছাই করা হয় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে। আগামী নির্বাচনে কাকে ভোট দিবেন তা অনেকটাই পরিস্কার হয়ে উঠে দেশের উন্নয়নের হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে। বহিঃবিশ্বে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদিসহ সকল সেক্টরের উন্নয়নকে বেশ গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। তাই আমাদের দেশেও নির্বাচনের ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সকল সরকারকেই তার শাসনামলের ০৫ বছরের কর্মকান্ডের হিসাব সঠিক ভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন, যাতে বিগত সময়ের চেয়ে দেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামনের দিকে যাচ্ছে, না পিছনে, না একই স্থানে অবস্থান করছে। যে কোন দৃষ্টিকোন থেকেই দেখা হোক না কেন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও বিভিন্ন সেক্টরে বর্তমান সরকার যে উন্নয়নের ছাপ রেখেছে তার যথেষ্ট তথ্য রয়েছে। তবে ঘন ঘন ধ্বংসাত্মক হরতাল একটি রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নৈতিবাচক প্রভাব ফেলে সে ব্যাপারেও মন্তব্য করেছেন অনেকে। তবে ৪২ বছরে বয়সের স্বাধীন দেশে ৩৫ বছরের পুঞ্জিভূত সমস্যা রাতারাতি দূরকরাও দুরহ ব্যাপার। ভাল একটা কিছু পেতে হলে সংশ্লিষ্ট সরকারকে কাজ করার পরিবেশ তৈরীর সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে। তবে কাজ করলে শতভাগই সঠিক হবে এমনটিও আমরা আশা করতে পারি না। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশটিতে পোড়া মাটি, ভাঙ্গা ব্রীজ আর দরিদ্র ও ক্ষুধা পিড়িত অশিক্ষিত ও সল্প শিক্ষিত জনগন নিয়েই বাঙালীদের কাছে হস্তগত হয় বাংলাদেশ। পর্যায়ক্রমে এদেশে যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটেছে। উন্নয়নে দেশের সকল শ্রেনীর মানুষের কম বেশী অবদান রয়েছে। এক্ষেত্রে সকল কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী মানুষ ও সকল বৈধ রাজনৈতিক দলের আন্তরিক প্রচেষ্টাই এর দাবীদার। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি, দল বা সরকার যতটুকু অবদান রেখেছেন, দেশবাসী ততটাই মূল্যায়ন করতে ভুল করবেন না। বর্তমান ও পূর্ববর্তী গনতান্ত্রিক সরকারের শাসনামলের তুলনামূলক চিত্র জনস্বার্থে উপস্থাপিত হল। যেমন ২০০৬ সালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ-৩.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার -২০১৩ সালে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৬ সালে রফতানী আয় ১.৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৩ সালে ২.৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৬ সালে রেমিটেন্স প্রবাহ ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৩ সালে ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১০ টাকায় কৃষকদের ব্যাংক হিসাব খোলা ও সহজ শর্তে কৃষি ঋন প্রদানের ব্যবস্থা। বর্তমান সরকার গত সাড়ে চার বছরে মালয়েশিয়ায় আড়াই লক্ষ শ্রমিক প্রেরণ এবং ৬ লক্ষ বাংলাদেশীকে সৌদিআরবে চাকুরী করার বৈধতা প্রদানের ব্যবস্থা করে। পূর্বে বিদেশে যেতে ৩-৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হত ও দালালের খপ্পরে পড়ে চাকুরীতো দুরের কথা জেল খেটে নিঃস্ব হয়ে দেশে ফেরৎ আসা ছাড়া কোন উপায় ছিলনা। সামাজিক নিরাপত্তা যেমন ঃ ২,৪৭,৫০০ জনকে বয়স্ক ভাতা প্রদান, ৯,০২,০০০ জনকে বিধবা ভাতা প্রদান, ২,৮৬,০০০ অনেক প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান। ২০১৩ সালে খাদ্য উৎপাদন ৩.৫০ কোটি মেট্রিকটন অর্থাৎ ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি (২৩ লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্য উদ্বৃত্ত)। ২০০১-২০৬ সময়ে বৈদেশিক বিনিয়োগ ২৬০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২০০৯-২০১২ সময়ে ৮৫৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করণ। গত ৪ বছরে গৃহহীনের আশ্রয়ের নিমিত্তে ঃ ১৬৪টি গুচ্ছ গ্রামে ১৯,০০৩ পরিবারকে পূর্নবাসন, ৭১৮৮টি গৃহহীন পরিবারের জন্য ১০৯৮টি ব্যারাক হউজ নির্মানাধীন। ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-ময়মনশিংহে ৪ লেন বিশিষ্ট রাস্তা নির্মানাধীন, কুড়িল ফ্লাই ওভার, মিরপুর এয়ার পোর্ট ফ্লাই ওভার, বনানী ফ্লাই ওভার তৈরী ও হাতিঝিল প্রকল্প বাস্তবায়াতি এবং যাত্রাবাড়ী গুলিস্তার ফ্লাইওভার ডিসেম্বর/১৩ নাগাদ নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে ধারনা করা যাচ্ছে। ২০০৯-২০১৩ সময়ে বর্তমান সরকার মোট ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার জনকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে কম খরচে। স্বাস্থ্য সেবার নিমিত্তে বর্তমান সরকার ৬টি

বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যে ১৮টি দেশ এগিয়ে আছে, বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। ক্ষুধা ও দারিদ্র বিমোচনে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে ফলে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ২০০৬ সালে ৫.৭ শতাংশ হতে ২০১৩ তে ৬.৭ শতাংশ। বিশ্ব ব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বিশ্বের সর্বোচ্চ প্রতিবেদনে অর্জিত প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ৫ম স্থানে রয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব বানকি মুন বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য মডেল দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নবেল বিজয়ী অমর্ত সেনসহ বিভিন্ন আন্তার্জাতিক ব্যক্তিত্ব স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নের রোডম্যাপে বাংলাদেশের অবস্থানকে অত্যন্ত স্বর্ণোজ্জ্বল বলে অবিহিত করেন। অমর্তসেন আরও বলেন নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে এগিয়ে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এক জনসভায় মন্তব্য করেন উন্নয়নের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম পর্যায়ে। তাছাড়াও কতিপয় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশকে গনতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখ হচ্ছে। বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে আমেরিকায় নির্বাচনের পূর্বেই সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের ফিরিস্তি জনসম্মুখে উপস্থাপন করে জনসমর্থন যাচাই করা হয়। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বাগ-বিতন্ডা হয় জনসমাবেশে একই প্লাটফর্মে। সে সকল দেশে উন্নয়নমূলক কর্মের সফলতার মানদন্ডে বিচার বিশ্লেশণ করেই ঐ সরকারকে পূণরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে থাকেন। কারণ হিসেবে বলা যায় দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নের পরিসমাপ্ত ঘটাতে ৫ বছর সময় যথেষ্ট নয়। সে মানদন্ডে বিচার বিশ্লেষণ করতেন বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিতেই হবে। নির্বাচনের পূর্বেই জন সমর্থন যাচাই-বাছাই করা হয় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে। আগামী নির্বাচনে কাকে ভোট দিবেন তা অনেকটাই পরিস্কার হয়ে উঠে দেশের উন্নয়নের হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে। বহিঃবিশ্বে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদিসহ সকল সেক্টরের উন্নয়নকে বেশ গুরুত্বের সাথে দেখা হয়।

২-এর পাতায় দেখুন

নার্সিং কলেজ ও ১২টি নার্সিং ইনষ্টিটিউট স্থাপিত ও শিক্ষার আধুনিকায়নের লক্ষে ২০,৫০০টি মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় মাল্টি মিডিয়ার ক্লাস রুম স্থাপনসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান। শিক্ষার উন্নয়নে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত, ফলে বর্তমানে শিক্ষার হার ৬৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয়ে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গ কিলোমিটার সুমুদ্র সীমানা ও ১২টি গ্যাস কূপ বাংলাদেশের স্থায়ী দখলে চলে আসে। বর্তমানে ৬০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুতের আওতায় এবং আরও ৩০ লক্ষ নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৫১,৫০০ নার্স ও সহকারী এবং ২৫০০০ স্কুল শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় কৃতিত্বের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শান্তি মডেল জাতিসংঘে গৃহিত হয়েছে। বর্তমানে মাত্র ৩৩,০০০ টাকায় জনশক্তি রফতানীর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ১২,২৮০টি কমিউনিটি হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। ২০০৬ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হত ৩,৬৩২ মেগাওয়াট ও ২০১৩ সালে ৮,৫৩৭ মেগাওয়াট অর্থাৎ এ সরকারের আমলে অতিরিক্ত মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমান ৪৯০৫ মেগাওয়াটের বেশী। ফলে বর্তমানে অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে বিদ্যুত লোডসেডিং তুলনামুলক অনেক কম। মানুষের মাথা পিছু গড় আয় ১০৪৪ মার্কিন ডলার বা ৮৫,০০০/-টাকা। ২০১১ সালে ৯৯.৪৭ শতাংশ শিশুদের স্কুলে আনা এবং ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের হার ৪৮ শতাংশ হতে কমিয়ে ২১ শতাংশে নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যদিকে ১লা জানুয়ারী ২০১৩ তে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই সময়ে ২৭ কোটি নতুন বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিয়ে দেশবাশীকে অবাক করেছে বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ৩৫টি মাদ্রাসাকে আইসিটি ল্যাবসহ মডেল মাদ্রাসায় উন্নিত করণ ও ১০০টি মাদ্রাসায় ভকেশনাল কোর্স চলুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষনার জন্য ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী উচ্চ শিক্ষার বিধান রাখা হয়েছে। ২৬,১৯৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয় করণ এবং ১,৪০,০০০ জন শিক্ষককে চাকুরীতে সরকারী করণ করা হয়েছে। অন্যদিকে দরিদ্র বিমোচনের জন্য ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় ৭৫ লক্ষ নারীকে মাসে ৩০ কেজি হারে খাদ্য শষ্য প্রদান ও ওএমএস, ভিজিডি, ভিজিএফ টি আর, কাবিখা ও খাদ্য নিরাপত্তা খাতে বছরে ৩,৯৪৫ কোটি টাকা ব্যায় করছে বর্তমান সরকার। বাগের হাটে ১৩০০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে (তথ্য বিঃ বোঃ)। দৈনিক ২৩ কোটি লিটার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প-ান্ট নির্মান। তাছাড়াও, *মাতৃত্বকালীন, ২০০৬ সালে ৪ মাস, ২০১৩ সালে ৬ মাস। *শিশু মৃত্যুর হার, ২০০৬ সালে ৬.১০ শতাংশ, ২০১৩ সালে ৩.৯৯ শতাংশ, *স্বাক্ষরতার হার, ২০০৬ সালে ৫১.৯ শতাংশ, ২০১৩ সালে ৬৫.০৪ শতাংশ, *দারিদ্র হার ২০০৬ সালে ৪১.৫ শতাংশ, ২০১৩ সালে২৯.০৩ শতাংশ, *কর্মসংস্থান, ২০০৬ সালে ২৪ লক্ষ, ২০১৩ সালে ৭৫ লক্ষ, *বৈদেশিক বিনিয়োগ, ২০০৬ সালে ১৮৭ কোটি মার্কিন ডলার, ২০১৩ সালে ৩৮২ কোটি মার্কিন ডলার, *জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি গড়, বি,এন,পি ২০০৬ সালে ১৩৬ শতাংশ, ২০১৩ সালে ৩৮ শতাংশ, *পোষাক রপ্তানিতে বিশ্বের অবস্থান, ২০০৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ ২০১৩ সালে দ্বিতীয় স্থানে, * ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা, ২০০৬ সালে ৫৭ লক্ষ, ২০১৩ সালে ৪ কোটি, *শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরী, ২০০৬ সালে ১৬৬২ টাকা, ২০১৩ সালে ৩০০০ টাকা, *রপ্তানি আয়, ২০০৬ সালে ১.০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৩ সালে ২.৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, *হাসপাতালের সংখ্যা, বি,এন,পি ২০০৬ সালে ১৬৮৩ টি, ২০১৩ সালে ২৫০১ টি, *পবিত্র হজ্ব পালন, ২০০৬ সালে ৪০ হাজার যাত্রী (সর্বোচ্চ) , ২০১৩ সালে ১ লক্ষ ১০ হাজার (সর্বোচ্চ), *জেলেদেরকে খাদ্য সহায়তা, ২০০৬ সালে ৬৫০০ মেট্রিক টন, ২০১৩ সালে ৫৬২০০ মেট্রিক টন, *দৈনিক গ্যাস উত্তোলন, ২০০৬ সালে ১৫১৩ মিলিয়ন ঘনফুট, ২০১৩ সালে ২২৫০ মিলিয়ন ঘনফুট ২০০৬ সালে একজন দিন মজুর ১দিনের পারিশ্রমিক দিয়ে সর্বচ্চো ৪ কেজি চাল ক্রয় করতে পারতেন, কিন্তু বর্তমানে ১দিনের শ্রমে ১০ কেজি চাউল ক্রয় করা সম্ভব। বর্তমান সরকারের আমলেই খাদ্যে সয়ংসম্পূর্ণতা হয়েছে। উল্লেখ্য ৭ ২০১৫ সালের মধ্যে দরিদ্রের হার ২২.৫ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে বর্তমান সরকারের।

এমনিভাবে শিক্ষা গবেষনা, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য ও কৃষিসহ বিভিন্ন সেক্টরে পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট অগ্রগতী পরিলক্ষিত হচ্ছে। মূল কথা হলো রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা হ্রাস পেলে এবং সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগীতার আন্তরীকতা বৃদ্ধি পেলে ভবিষ্যতে এদেশকে অনেক দেশই মডেল হিসেবে গ্রহণ করবে।

ডা. মো. ফজলুল হক ▷

সচেতন করতে হবে শিক্ষার্থীদের

যে সন্তানরা জঙ্গির মদদদাতাদের ফাঁদে পড়ে জঙ্গির খাতায় নাম লেখায়, তাদের প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতে দেওয়া হয় না। যে একবার এ পথে পা দেবে, সে যেন মরণফাঁদে নিজেকে চিরতরের জন্য আটকে ফেলল। ফাঁদে পা দেওয়ার পর যদিও বুঝতে পারে কিন্তু বের হওয়ার সব পথই বন্ধ হয়ে যায়। মিথ্যা, বানোয়াট যুক্তি দাঁড় করিয়ে, মিথ্যা তথ্য দিয়ে ও মনগড়া কোরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যা দ্বারা জিহাদের কথা বলে, পরকালে জান্নাতের কথা বলে ধর্মভিরু সন্তানদের হিংস্রতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যে সন্তানের হাতে থাকার কথা বই, খাতা, কলম ও ল্যাপটপ, আজ সে সন্তানের হাতে ছান পাচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র, চাপাতি ও গ্রেনেডের মতো ভয়াবহ মারণাস্ত্র। এ কাজের প্রধান মদদদাতা কারা, আজ তা স্পষ্ট সবার কাছে, সবারই কমবেশি তা জানা। কিন্তু বলার সাহস নেই। সবাই নির্বিকার। ২০০৮ সালের গ্রেনেড হামলা ও পূর্বাপর বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনা পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট হবে এর পেছনে কারা। পাকিস্তানে ইসলাম বাঁচানোর নামে মসজিদে গ্রেনেড চার্জ করে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের হত্যা করছে, তারা মুসলমান তো দূরের কথা মানুষের সমাজে তাদের ছান আছে কি না সেটিই জিজ্ঞাসা! এ দেশে বরাবরই জামায়াত-শিবির ইসলামের কথা বলে বিভিন্নভাবে মানুষ হত্যার সুযোগ সৃষ্টি করে আসছে। তাদের ধারণা, এ দেশে তারা (জামায়াত-শিবির) ছাড়া অন্যরা সবাই কাফের। সুতরাং অন্যকে হত্যা করলেই নিজেকে ধার্মিক ও মৃত্যু হলে শহীদ, পরকালে মিলবে জান্নাত। যেখানে রয়েছে শান্তি আর শান্তি। এর আগে শিবিরের জঙ্গি তৎপরতার ধরন ছিল রগ কাটা বা রগ কর্তন, আল্লাহু আকবর বলে মানুষ হত্যা। ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, গাছ কেটে রাস্তা অবরোধ, পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করে বাস ও ট্রেনে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি। এ ঘটনাগুলো এ দেশের মানুষের সামনেই ঘটেছে। আজ তাদের সংগঠন বিভিন্ন নামে ভাগ হয়েছে, হত্যার ধরনও পাল্টে গেছে। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদীর ৯ ছেলের একজন হায়দার ফারুক মওদুদী ২০১৩ সালের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশের একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আমার বাবা মওদুদীর ৯ সন্তান। বাবার নির্দেশে কেউই জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করিনি। আমাদের বিদেশে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছেন। বাবার প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর প্রসঙ্গে লেখা বইও পড়তে নিষেধ করেছেন, মিটিং-মিছিল ও বক্তব্য শুনতে নিষেধ করেছেন।' অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে জামায়াতে ইসলামী কোনো ইসলামী দল নয়, এটিই তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। হায়দার ফারুক মন্তব্য করেন, জামায়াত নেতারা নিজের সন্তানকে নয়, অন্যের সন্তানকে অর্থের বিনিময়ে দলে ভিড়িয়ে জঙ্গি বানিয়ে বিপদের পথে ঠেলে দেন। তিনি আরো একটি উদাহরণ টেনে বলেন, 'মাদক ব্যবসায়ীরা যেমন চায় না তার সন্তান মাদকসেবী হোক, তেমনি জামায়াতে ইসলামীর নেতারাও তাঁদের সন্তানদের দলে ভিড়িয়ে জামায়াতপন্থী বানাতে চান না।' একজন সচেতন মানুষের জন্য এ তথ্যটিই যথেষ্ট। গত ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ রাত আনুমানিক পৌনে ৯টায় গুলশান ২-এর ৭৯ নম্বর রাস্তার হলি আর্টিজান বেকারিতে যে বিভীষিকাময় ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে গেল, তা আমাদের দেশের জন্যই শুধু নয়, বিশ্ব বিবেককেও নাড়া দিয়েছে। যে সন্তানরা জঙ্গির খাতায় নাম লিখে পবিত্র রমজান মাসে তারাবির নামাজের সময় যে ঘটনাটি ঘটিয়েছে, তা কোনো প্রকৃত ধর্মপ্রাণ মুসলমানের কাজ হতে পারে না। তারা নিরপরাধ বিদেশি ও দেশি মানুষগুলোকে হত্যা করেছে, তা কোনো সুস্থ ও বিবেকবান মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ইসলাম ধর্মে এ কাজের গ্রহণযোগ্যতা নেই। এ কাজটি মানবতা ও ধর্মবিরোধী। শুধু ইসলাম ধর্মই নয়, সব ধর্মের পরিপন্থী।

জঙ্গি তৈরির মদদদাতা ও অর্থ জোগানদাতাদের

> জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে ও উন্নয়নের গতি ধরে রাখতে দলমত-নির্বিশেষে সবাইকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের জন্য কাজ করতে হবে। প্রত্যেকের সন্তানকে প্রথমে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, যাতে ধর্মের অপব্যাখ্যাকারীদের ছোবল থেকে বেঁচে থাকতে পারে, সন্ত্রাসের পথকে ঘৃণা করতে পারে। প্রকৃত ধর্মজ্ঞান থাকলে জঙ্গিই শুধু নয়, মাদকের ছোবল থেকে নিজেকে ও সমাজের অন্যদের রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারবে। প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে পরিবার ও হাক্কানি আলেম-ওলামাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে

চিহ্নিত করতে হবে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, ব্যাংক ও স্বর্ণের দোকান লুট করে জঙ্গি তৈরির কারখানা ছাপন করেছে, সেই চক্রটি সব অপরাধের মূল কাজ করছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে। গুটিকয়েক জঙ্গি দ্বারা দেশের সাময়িক ক্ষতি করা যাবে, কিন্তু বর্তমান সরকারের উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। যে মুহূর্তে বুলেট ট্রেন, সাবওয়ে ট্রেন, মনোরেল, উড়াল সড়কের জন্য জাপানি বিশেষজ্ঞরা সাহায্য-সহযোগিতা দিতে এসেছিলেন, তাঁদের হত্যা করার উদ্দেশ্য কী? তার অর্থ হচ্ছে যারা এ দেশকে নিজের দেশ বলে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারছে না, ধ্বংস দেখলে খুশি হয় এবং এর আগেও তারা বিভিন্ন সময়ে ধ্বংসের আলামত রেখেছে ও ধ্বংসের মদদদাতা হিসেবে কাজ করেছে। নিহত ৯ ইতালিয়ানের সবাই ব্যবসায়ী। ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ করে গার্মেন্ট সেক্টর অতি দ্রুত অগ্রগামী ও অর্থনীতিতে বেশির ভাগ ভূমিকা রেখে চলেছে। সেটিকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্য কি না তাও খতিয়ে দেখতে হবে।

জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে ও উন্নয়নের গতিকে ধরে রাখতে দলমত-নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের জন্য কাজ করতে হবে। প্রত্যেকের সন্তানকে প্রথমে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, যাতে ধর্মের অপব্যাখ্যাকারীদের ছোবল থেকে বেঁচে থাকতে পারে, সন্ত্রাসের পথকে ঘৃণা করতে পারে। প্রকৃত ধর্ম জ্ঞান থাকলে জঙ্গিই শুধু নয়, মাদকের ছোবল থেকে নিজেকে ও সমাজের অন্যদের রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারবে। প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে পরিবার ও হাক্কানি আলেম-ওলামাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। মসজিদ ও মাদ্রাসার যথাক্রমে ইমাম ও শিক্ষকদের ধর্ম বিষয়ে বক্তব্য দিতে হবে। প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাদক ও জঙ্গিবাদ রোধে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য কোনো বিকল্প নেই।

লেখক : অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

কালের কণ্ঠ

১৪ শনিবার। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭। ১৫ আশ্বিন ১৪২৪

editorial@kalerkantho.com

ডা. মো. ফজলুল হক ▷

রোহিঙ্গাদের ওপর বর্বরতার শেষ কোথায়?

রোহিঙ্গাদের সম্মানের সঙ্গে নাগরিকের মর্যাদায় দেশে ফিরিয়ে নিতে এবং ধ্বংসকৃত ঘরবাড়ি তৈরি করে দিতে হবে। জীবন্ত মাটিচাপা ও গুলি করে হত্যার মতো নিষ্ঠুর কাজ অতিসত্বর বন্ধ করতে হবে। আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে

বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মীয় গুরু গৌতম বুদ্ধের মূলমন্ত্র ছিল জীব হত্যা মহাপাপ। অথচ রোহিঙ্গাদের ওপর অত্যাচারের ধরন দেখে মনে হয়, মিয়ানমারের সরকার বা বৌদ্ধদের কাছে তারা জীবও নয়। গত চার দশকে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। কত রোহিঙ্গা মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। রোহিঙ্গা নারীদের ধর্ষণ করা হচ্ছে, তাদের বাড়িঘরে আগুন দেওয়া হচ্ছে। এটি কোনো সভ্য জনগোষ্ঠীর কাজ হতে পারে না। তাদের এ ধরনের আচরণ নিজেদের অসভ্য ও অশিক্ষিত জাতি হিসেবে প্রচার করছে।

ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত বিষয়। রাষ্ট্র সবার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করবে। জন্মগ্রহণের পর মা যেমন আপন, তেমনি মাতৃভূমির প্রতিটি স্তরের মাটিও তার কাছে অতিপ্রিয়। পৃথিবীতে সব শ্রেণি, পেশা, ধর্ম ও বর্ণের মানুষ উন্নয়ন চায়, অগ্রগতি চায়, শান্তি চায়, সমৃদ্ধি চায়, আরো বেশি চায় নিরাপদ বাসস্থান, যেখানে পরিবারের সবাইকে নিয়ে নির্বিঘ্নে বসবাস করতে পারবে। এ পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়ায় এসেছে, বিদায় নিয়েছে, বর্তমানেও বেঁচে আছে সবার জন্ম পিতা-মাতা সেই আদম-বিবি হাওয়া। অর্থাৎ ধর্ম, মত, জাত, কৃষ্টি-কালচার, বর্ণ, ভাষা ও ভৌগোলিক অবস্থানের ভিন্নতা থাকতেই পারে। কিন্তু মানুষ হিসেবে সবাই সমান। সৃষ্টিকর্তার বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বর্তমান যুগে খাদ্যের অভাব তেমনটা নেই, তবে অভাব ভ্রাতৃত্বের জায়গায় ভালোবাসার স্থানে। সৃষ্টিকর্তার জমিনে সব শ্রেণির মানুষের বসবাস করার অধিকার রয়েছে।

এ বছর বাংলাদেশের ওপর দুটি দুর্যোগ এসেছে। একটি বন্যা, অন্যটি অনুপ্রবেশকারী সমস্যা। বর্তমান সরকার শান্তিপূর্ণ সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে। বাঙালিরা অতিথিপরায়ণ ও সাহসী জাতি। সে কারণেই জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে আমাদের সেনাই বেশি। মহামানব ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মুহাম্মদ (সা.) শুধু মানুষের জন্যই নয়, প্রাণিকুলের জন্যও শান্তির নির্দেশক ও নিদর্শনস্বরূপ। নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার জন্য কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সব মানুষকেই হত্যা করল, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সবার প্রাণ রক্ষা করল। (সুরা মায়িদাহ, আয়াত : ৩২)। এটি ইসলাম ধর্মের কথা এবং অন্য সব ধর্মের মূলমন্ত্রও তাই। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেয়েছে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যতম। এখানে বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য বা ভেদাভেদ নেই। যার যার ধর্ম সে-ই পালন করার অধিকার এখানে সংরক্ষিত। এর ফলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায় ৫০টি দেশ ও সংস্থা থেকে সম্মাননা পদকে ভূষিত হয়েছেন। সে কারণেই বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে আজ মধ্যম আয়ের দেশে স্থান পেয়েছে। পাকিস্তানের চেয়ে আমাদের মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। দাঙ্গা, মারামারি, হানাহানি বা বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে আমাদের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে।

রোহিঙ্গা মুসলমানরা জন্মগত সূত্রেই মিয়ানমারের নাগরিক। তারা দেশের উন্নয়নে জন্ম থেকেই কাজ করে আসছে, উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। রোহিঙ্গারা সংখ্যায় ১২ লাখ থেকে ১৫ লাখ হলেও তারা মিয়ানমারে সংখ্যালঘু। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশেই বিভিন্ন ধর্মের মানুষ সংখ্যালঘুর কাতারে অবস্থান করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা, চাকরি ও জীবিকা নির্বাহের সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। মিয়ানমারে সরকারিভাবে রোহিঙ্গাদের অমানবিক নির্যাতন করা হচ্ছে। দেশত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। এমনকি তাদের হত্যা করার জন্য বর্ডার এলাকায় মাইন পুঁতে রাখা হয়েছে। নির্যাতনের ধরন এতটাই অমানবিক ও নিষ্ঠুর, যা বনের পশুকেও হার মানিয়েছে। তাদের কাছে রোহিঙ্গা মুসলমানদের জীবন ও ইজ্জত সম্মানের কোনো স্থান নেই। এ ধরনের কাজ দ্বারা সন্ত্রাস জন্ম নেয়, দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়, এমনকি দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়, তা কে না জানে। বর্তমানে মিয়ানমার সরকার যা ঘটাচ্ছে তা বিশ্ব বিবেককেও নাড়া দিয়েছে এবং ভাবিয়ে তুলেছে। কলঙ্কিত হচ্ছে তাদের সম্মান। পশুত্বের স্বভাব গায়ে লেপন করছে তারা। ইউটিউব, ফেসবুক ও পত্রিকার ছবি, ভিডিও ফুটেজ ও নাফ নদের তীরে দাঁড়িয়ে যে দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ছে তা বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে হার মানিয়েছে। ওই সময় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকিস্তানি আর্মিদের গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধ হয়েছে। তবে সে সময় (১৯৭১ সাল) রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের ভূমিকা ছিল অনেকটা মিয়ানমার সরকারের মতোই। সে কারণেই আন্তর্জাতিক আদালতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিচারে যুদ্ধাপরাধীদের কারাদণ্ড ও ফাঁসি হয়েছে। আইনের উর্ধ্বে কেউ নয়। বিশ্ববাসী মনে করে, মিয়ানমারের ঘটনায় সে দেশের অপরাধীরাও গণহত্যার দায় এড়াতে পারবে না।

অং সান সু চি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, অথচ নোবেলের মর্যাদা বোঝেন না, যা তাঁর বক্তব্য থেকে উঠে এসেছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানুষ হিসেবে আমরাও তাঁর বক্তব্যে মর্মাহত ও দুঃখিত। এ ধরনের অর্থশূন্য বক্তব্য তাঁর মতো একজন বিশ্বনন্দিত নেত্রীর কাছ থেকে মানুষ কোনোভাবেই আশা করে না। ইউটিউব, ভিডিও ফুটেজ থেকে বলা যায়, মিয়ানমার একটি আদিম চরিত্রের মানুষের বাসস্থান, যা বর্বর প্রকৃতির। সভ্যতার আলো তাদের স্পর্শ করেনি। বর্তমানে রোহিঙ্গাদের সম্মানের সঙ্গে নাগরিকের মর্যাদায় দেশে ফিরিয়ে নিতে এবং ধ্বংসকৃত ঘরবাড়ি তৈরি করে দিতে হবে। জীবন্ত মাটিচাপা ও গুলি করে হত্যার মতো নিষ্ঠুর কাজ অতিসত্বর বন্ধ করতে হবে। আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশকে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের বোঝা থেকে মুক্ত করতে হবে।

লেখক : চেয়ারম্যান ও ডিন, হাজী মুহম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

সমুদ্র বিজয় ও আমাদের করণীয়

সমুদ্র জয়ে বাংলাদেশের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে কর্মক্ষেত্র ও পরিধি। তেল-গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার ও এর উত্তোলনে প্রয়োজন দেশি-বিদেশি দক্ষ জনবল, প্রয়োজনীয় মূল্যবান যন্ত্রপাতি। সমুদ্রসীমানায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও উদ্ধারকাজে ব্যবহারের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েই ক্রয় করা হয়েছে জার্মানির তৈরি অত্যাধুনিক ডর্নিয়ার ২২৮ এনজি মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট বা সমুদ্র টহল বিমান। এ বিমানটি ট্যাংকভর্তি জ্বালানি নিয়ে ৯৫২ নটিক্যাল মাইল পথ অতিক্রম এবং একটানা ১০ ঘণ্টা উড়তে সক্ষম

পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে চাওয়া-পাওয়ার অনেক বিষয় নিয়েই বিরোধ থাকলেও নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচারকাজ দ্বারা যেকোনো সমস্যার সমাধানও সম্ভব। ২০১২ সালের ১৪ মার্চ মিয়ানমারের কাছ থেকে এক লাখ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার এবং ২০১৪ সালের ৮ জুলাই ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশ পায় ১৯ হাজার ৪৬৭ বর্গকিলোমিটার। উল্লেখ্য, এ রায়ে ভারত পেয়েছে ছয় হাজার ১৩৫ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকা। এটা দীর্ঘদিনের বিরোধপূর্ণ সমুদ্রসীমানার স্থায়ী সমাধান এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। প্রথমত, এ বিজয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিজয়, তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার বিজয়, এ বিজয় সাড়ে ষোলো কোটি ধর্ম-বর্ণ-দলমত-নির্বিশেষে সবার বিজয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যে বহু দিনের সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে প্রথম চিঠি চালাচালি শুরু হয় ১৯৭৪ সালের ১৬ এপ্রিল থেকে বন্ধবন্ধুর নির্দেশে। পঁচাত্তরের পর এ কাজটি বন্ধ থাকে প্রায় ৩৫ বছর। ফরাসি সরকারের অর্থায়নে বর্তমান সরকার ২০০৩ সালে নৌবাহিনী চট্টগ্রামে হাইড্রোগ্রাফিক ও ওশানগ্রাফি সেন্টার স্থাপন করলে সমুদ্রসীমা নির্ধারণে কাজের গতি সঞ্চারিত এবং ২০০৯ সালে যথারীতি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজ পুরোদমে শুরু হয়। স্বল্পতম সময়ে সমুদ্র জরিপের জন্য বর্তমান সরকার ৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে হাইড্রোগ্রাফিক জাহাজ দিয়ে বাংলাদেশকে সহায়তা করে ব্রিটেন। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বর্তমান সরকার নৌবাহিনীকে একটি আধুনিক হাইড্রোগ্রাফার অনুসন্ধান জাহাজ হস্তান্তর করলে দ্রুতগতিতে সমুদ্র জরিপের কাজ চলতে থাকে। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ২৬ আগস্ট তথ্যাদিসহ নথিপত্র জমাদানের শেষ সময় নির্ধারিত থাকলেও প্রায় ছয় মাস আগেই আবেদনটি জমা পড়ে আন্তর্জাতিক আদালতে। ২০১১ সালের ২৬ আগস্টের মধ্যে আবেদন জমা দিতে ব্যর্থ হলে এ অর্জন কোনো দিনই সম্ভব হতো না। আন্তর্জাতিক আদালতে আবেদনের ক্ষেত্রে, দেশের অবস্থান, সমুদ্রসৈকতের দৈর্ঘ্য, সমুদ্রের তলদেশের ভূতাত্ত্বিক অবস্থা ইত্যাদি পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গত ২০১১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি জার্মানির হামবুর্গ শহরে অবস্থিত সমুদ্র আইনের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ বাংলাদেশের পক্ষে আবেদন করা হয়। আবেদনের যৌক্তিকতার চুলচেরা বিশ্লেষণ ও পক্ষে-বিপক্ষে সঠিক যুক্তি-প্রমাণাদির ভিত্তিতে গত ২০১২ সালের ১৪ মার্চ ২০০ নটিক্যাল মাইল—অর্থাৎ এক লাখ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব সীমানা এবং মহীসোপানে প্রবেশের পথসহ বাংলাদেশের পক্ষে রায় দেন আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল। একইভাবে ভারতের সঙ্গে ২৫ হাজার ৬০২ বর্গকিলোমিটার সমুদ্রসীমানার বিরোধ নিষ্পত্তিতেও ৮ জুলাই ২০১৪ তারিখে নেদারল্যান্ডসের স্থায়ী সালিস আদালতের রায়ে বাংলাদেশ পায় ১৯ হাজার ৪৬৭ বর্গকিলোমিটার। উভয় রায়ে মিয়ানমার ও ভারতের দখল থেকে মুক্ত হলো মোট এক লাখ ৩১ হাজার ৯৮ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকা। এ বিশাল অর্জনে সমুদ্র জয়ের পাশাপাশি উভয় দেশের জনগণের সঙ্গেও বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। জেলেরা নির্দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে মাছসহ সব সম্পদ আহরণ ও অবাধে চলাচল করতে পারবে। মৎস্যসম্পদ ছাড়াও রয়েছে গ্যাসের মজুদ। দুটি রায়ের ফলে বঙ্গোপসাগরে ২৮টি তেল-গ্যাস ক্ষেত্র বা ব্লক নিয়ে আবির্ভূত হলো আরেকটি নতুন ছোট বাংলাদেশ আমাদের মানচিত্রে। এখন বাংলাদেশকে আয়তনের দিক থেকে আর ছোট বলার অবকাশ নেই। এ ধরনের বিশাল অর্জন স্বাধীনতার ৪৩ বছরে দ্বিতীয়টি আর হয়নি। এ অর্জন ধরে রাখতে প্রয়োজন দলমতের ঊর্ধ্বে থেকে সবাইকে উন্নয়নে সহযোগিতা করা। তেল, গ্যাস, মাছসহ প্রয়োজনীয় সম্পদ রক্ষা ও এর আহরণে দেশি প্রযুক্তি ব্যবহার করার লক্ষ্যে সৎ ও দক্ষ জনবল অপরিহার্য। খনিজসম্পদ উত্তোলনে বিদেশি নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। তবেই তেল-গ্যাসের অভাবমুক্ত হবে বাংলাদেশ। বছরে ইলিশ মাছ আহরিত হবে প্রায় পাঁচ লাখ টন, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা। অন্যান্য মাছের বাজারমূল্য এর চেয়েও অনেক গুণ বেশি। এ ছাড়া রয়েছে প্রবাল, শামুক, ঝিনুক, শৈবাল, ক্রোরিন, ফ্লোরিন, আয়োডিনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পদার্থ, যা প্রাকৃতিক নিয়মেই উৎপন্ন হতে থাকবে। শুধু আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন করতে হবে মাত্র। সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ প্রক্রিয়াজাত ও বিপণনের মাধ্যমে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। কারণ এর আগে ২৮টি ব্লকের মধ্যে মিয়ানমারের দাবি ছিল ১৭টি এবং ভারতের ১০টি। বাংলাদেশের মধ্যে ছিল মাত্র একটি এবং অন্য একটির অংশবিশেষ। এমন সব কটিতেই বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৮ জুলাই ২০১৪-এর সমুদ্র বিজয় এর আনুপাতিক হারে হাজার হাজার কোটি টাকার মৎস্যসম্পদ। গত ২০১২ সালের ১৪ মার্চ ও ৮ জুলাই ২০১৪-এর অর্জনই শ্রেষ্ঠ অর্জন, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সবার জন্যই অমর হয়ে থাকবে 'সমুদ্র বিজয় দিবস' হিসেবে। বিশাল এ অর্জনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, যা জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে। এটি নিঃসন্দেহে আমাদের গর্বের ও আনন্দের। আমাদের এ অর্জন অনেক বড়। সমুদ্র জয়ে বাংলাদেশের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে কর্মক্ষেত্র ও পরিধি। তেল-গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার ও এর উত্তোলনে প্রয়োজন দেশি-বিদেশি দক্ষ জনবল, প্রয়োজনীয় মূল্যবান যন্ত্রপাতি। সমুদ্র সীমানায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও উদ্ধারকাজে ব্যবহারের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েই ক্রয় করা হয়েছে জার্মানির তৈরি অত্যাধুনিক ডর্নিয়ার ২২৮ এনজি মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট বা সমুদ্র টহল বিমান। এ বিমানটি ট্যাংকভর্তি জ্বালানি নিয়ে ৯৫২ নটিক্যাল মাইল পথ অতিক্রম এবং একটানা ১০ ঘণ্টা উড়তে সক্ষম। সমুদ্রসম্পদ দেশি প্রযুক্তিতে সৎ ও দক্ষ জনবল দ্বারা আহরিত হলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারও ভারী হবে, এটাই সবার প্রত্যাশা। সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত জলজ প্রাণী ও খনিজসম্পদ আহরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ অচিরেই মধ্যম আয়ের দেশে রূপ নিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে বহু দিনের বৈরিতার অবসান ও অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ লাভবান হয়েছে।

লেখক : অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

কালের কণ্ঠ

২৩ মে ২০১৩, বৃহস্পতিবার

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

মহাসেন ও জলবায়ু পরিবর্তন

যেকোনো উপায়ে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধির কারণে বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে, যা মানুষসহ সব প্রাণী, এমনকি উদ্ভিদের জন্যও অমঙ্গল বয়ে আনতে পারে। ১৮৯৬ সালে প্রথম তথ্যানুসন্ধান করেন সুইডিশ রসায়নবিদ আরহেনিয়াস এবং তিনি উল্লেখ করেন জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, বৃক্ষনিধন, জঙ্গল সাফ করা, কৃষিকাজসহ বিভিন্ন কারণে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ে। যানবাহন, কলকারখানা, ইটভাটা ও গ্রিনহাউস থেকে নিঃসৃত হয় ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (সিএফসি) গ্যাস, যা প্রাণিদেহের জন্য ক্ষতিকারক। বায়ুমণ্ডলে ক্রমবর্ধিষ্ণু গ্রিনহাউস গ্যাসের উদ্গিরণের প্রভাবেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে। ফলে উষ্ণতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। বিভিন্ন তথ্যে জানা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে এবং প্রতিবছর জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাবে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে প্রায় ১০ হাজার মানুষ মারা যায়। বিশ্ব জনসংখ্যার ৫ শতাংশ মানুষ আমেরিকায় বাস করে; আর বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছড়ায় ২৩ শতাংশ। অন্যদিকে ১৭ শতাংশ মানুষের দেশ ভারত ছড়ায় মাত্র ৪ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড। উল্লেখ্য, উন্নত দেশগুলোতে শিল্প বিপ্লবের কারণে অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহারের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। চীনের ডাচেস ব্যাংক পরিচালিত জরিপের ভাষ্যমতে, কলকারখানা ও যানবাহন থেকে নিঃসৃত ধোঁয়ার পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকলে ২০২৫ সাল নাগাদ দূষণের মাত্রা আরো ৭০ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে। চীনের রাজধানী ও বড় শহরগুলোতে বর্তমানে বায়ুদূষণের মাত্রা মানুষের সহনীয় মাত্রার ৪০ গুণ বেশি। ফলে অধিকাংশ শিশু শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হচ্ছে। বিষাক্ত বাতাসের কারণে অনেকেই চীন ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে (সূত্র : নিউ ইয়র্ক টাইমস)।

জাতিসংঘের উদ্যোগে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে মেক্সিকোর কানকুনে ২০১০ সালের ২৯ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৬তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তা হচ্ছে, কিয়োটো প্রটোকলে একটি নতুন নিয়ম চালু করা হয়, যাতে শিল্পের অগ্রগতি ঠিক রেখে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস কম নির্গত করানো। কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ নাইট্রাস অক্সাইড, সালফার হাইড্রোফ্লোরো কার্বন, হেক্সাফ্লোরাইড, কপার ফ্লোরোকার্বন স্যালিকেও গ্রিনহাউস গ্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাজারভিত্তিক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে ওই সম্মেলনে; যাকে 'কার্বন ট্রেডিং' বলা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে প্রতি টন কার্বন সঞ্চয়ের মূল্য ছিল ৫ থেকে ১৬ মার্কিন ডলার। বিশ্বের সব উন্নয়নশীল দেশে এ প্রকল্প চালু থাকলে ভবিষ্যতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মতো উষ্ণতাবর্ধক গ্যাস নির্গত হলেও সহনীয় মাত্রায় রাখা সম্ভব হবে। ফলে বিশ্বের সব জীববৈচিত্র্য যথারীতি বেঁচে থাকতে সহায়ক হবে। প্রকৃত অর্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির পক্ষে এবং পরিবেশদূষণের বিরুদ্ধে একাধিক সম্মেলন করেছে। ভালো ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে; কিন্তু বাস্তবে তা অনুসরণ করা হয়নি। উল্লেখ্য, অধ্যাপক মো. আখতার হোসেন (সাবেক উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) ২০১০ সালের ২৮ নভেম্বর একটি দৈনিকে প্রকাশিত প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যা ৭০০ কোটির অধিক; যা ২০৫০ সালে বেড়ে

> লবণের কারণে কৃষি ও মিঠা পানির মাছের উন্নয়ন বিঘ্নিত হবে। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ আশ্রয় ও খাদ্য অন্বেষণে এরই মধ্যে শহরমুখী হতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হবে

৯০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। ওই সময় বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাণিজ আমিষের চাহিদা বর্তমানের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হবে। এ অতিরিক্ত চাহিদার প্রেক্ষাপটে প্রাণী পালন বৃদ্ধি পাবে। এসব প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাস, পরিপাকতন্ত্র ও বর্জ্য থেকে উদ্গিরিত গ্যাসও জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত পানিতে নিমজ্জিত হলে পর্যটন করপোরেশনের বছরে শত শত কোটি টাকার লোকসান হবে। তা ছাড়া লবণের কারণে কৃষি ও মিঠা পানির মাছের উন্নয়ন বিঘ্নিত হবে। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ আশ্রয় ও খাদ্য অন্বেষণে এরই মধ্যে শহরমুখী হতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হবে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বৈশ্বিক উষ্ণতা ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে ভূপৃষ্ঠে ৩৩.৩৩ শতাংশ প্রাণীর প্রজাতি বিপন্ন অথবা বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অতিথি পাখি অতিরিক্ত শীতের প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলগুলোতে চলে আসায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এসব অতিথি পাখির সংখ্যা আশঙ্কাজনক পর্যায়ে হ্রাস পেয়েছে। মেরু অঞ্চলে চুষারে বাসকৃত প্রাণী, যেমন মেরু-ভল্লুক ও পেঙ্গুইন পাখির সংখ্যা হ্রাস পাবে। ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ২২ হাজার মেরু-ভল্লুকের মধ্যে প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার অকালে বিলুপ্ত হবে। তেমনি ১৮ প্রজাতির মেরু পেঙ্গুইনের মধ্যে ১১ প্রজাতিই বিপন্ন হতে পারে উষ্ণতা বৃদ্ধি ও মেরু অঞ্চলের বরফ গলার কারণে।

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আমরা সবাই কমবেশি দায়ী। কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রতিনিয়তই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বের হচ্ছে। বিষয়টি যেহেতু সমগ্র বিশ্বের সমস্যা, সেহেতু সমাধানে সব দেশকেই যৌথভাবে এগিয়ে আসতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনাবৃষ্টি, তাপপ্রবাহ, ঘূর্ণিঝড়, মরুকরণ, জুনোটিকসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব, অতিরিক্ত পতঙ্গ আক্রমণ, খাদ্যাভাবে মানুষসহ প্রাণিকুল অভাবনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। জলবায়ুর এ দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক পরিবর্তন অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে জল, স্থল, অরণ্য, অন্তরীক্ষ—সর্বত্র মানুষসহ সব পর্যায়ের প্রাণীই আক্রান্ত হবে। বিশ্ব মানবতার কল্যাণে আমাদের এ প্রিয় পৃথিবীকে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে ধনী-দরিদ্র সব দেশের সরকার ও জনগোষ্ঠীকে সচেতন হতে হবে। গ্রিনহাউসের মাত্রাতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ন্ত্রণে ধনী দেশগুলোর মুখ্য ভূমিকা পালন করার বিকল্প হতে পারে না।

লেখক : অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
fhoque.hstu@gmail.com

www.kalerkantho.com

মো. ফজলুল হক

গ্যাস সংকট প্রয়োজন সঠিক ব্যবস্থাপনা ও জনসচেতনতা

প্রাকৃতিক গ্যাস আমাদের নিয়ামত, যা বিবিধ শক্তির উৎস। ২০১১ সালের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে ২৩টি সচল গ্যাস ফিল্ডে ৮৯টি গ্যাসকূপ রয়েছে। বর্তমানে দৈনিক দুই হাজার মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ হয়ে থাকে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। বর্তমানে আমাদের দৈনিক দুই হাজার ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের চাহিদা রয়েছে। ঘর-বাড়ি, কল-কারখানা, পরিবহন বৃদ্ধির কারণে প্রতিবছর ৭ শতাংশ হারে গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, ৪০ শতাংশ গ্যাস ব্যবহার হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে, ১৭ শতাংশ শিল্প-কারখানায়, ১৫ শতাংশ ক্যাপটিভ পাওয়ার, ১১ শতাংশ গৃহস্থালি কাজে, ১১ শতাংশ সার উৎপাদনে, ৫ শতাংশ সিএনজি বা পরিবহনে, ১ শতাংশ বাণিজ্যিক ও কৃষিকাজে ব্যয় হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, চাহিদার তুলনায় গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ কম থাকায় ২১ জুলাই ২০০৯ তারিখ থেকে শিল্প-কারখানায় এবং ১৩ জুলাই ২০১০ থেকে আবাসিক এলাকায় নতুন সংযোগ প্রদান বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। কারণ ওই সময়ে গ্যাসের ঘাটতি ছিল। এ ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার পরই নতুন সংযোগের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। কিন্তু কিছু দুর্নীতিবাজের কারণে সরকারের সদিচ্ছা প্রতিফলিত হচ্ছে না। মাটির নিচে পুঞ্জীভূত গ্যাসের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যার দ্বারা দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে। নাগরিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ গ্যাস ও বিদ্যুৎ এ দুটির মধ্যে গ্যাসের গুরুত্ব সর্বোচ্চ। কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদনেও গ্যাস প্রয়োজন হয়। এক ঘণ্টা গ্যাস বন্ধ থাকলে হরতাল, ভাঙচুরসহ অনেক ঘটনাই ঘটে থাকে, যা আমাদের দেশে একটা সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য, এক দিন গ্যাস বন্ধ থাকলে লাখ লাখ টন কাঠের প্রয়োজন হবে। ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় কালো ধোঁয়ার কারণে মানুষ শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হবে। ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত হবে পুরো দেশ। সুতরাং গ্যাসের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়টি আমাদের সবার উপলব্ধি করতেই হবে। গ্যাস বর্তমানে দুভাবে সরবরাহ হয়, পাইপলাইন ও সিলিন্ডারের মাধ্যমে। বিশ্বের বেশির ভাগ দেশেই সিলিন্ডারের মাধ্যমে সরবরাহ হয়। পাইপলাইনের গ্যাস বিভিন্ন কারণে অপচয় হয়ে থাকে। যেমন—রান্নার কাজে অসতর্কতার কারণে অপচয় সবচেয়ে বেশি হয়। তা ছাড়া শীতকালে অনেক ক্ষেত্রে রুম গরম রাখার জন্য এবং একটি ম্যাচের কাঠি ব্যবহারের ভয়েও অনেকে গ্যাসচুলি জ্বালিয়ে রাখে। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে, একটি ডিম ভাজি বা চায়ের পানি বা দুধ তাপ দিতেও চুলির চাবি সামান্য ঘুরাতে হয়; কিন্তু দেখা যায় অজ্ঞতার কারণে পুরো মাত্রায় চাবি ঘুরিয়ে গ্যাস ছাড়া হয়। এতে সাধারণত কয়েকটি সমস্যা হতে পারে। যেমন—গ্যাসের অপচয়, অতিমাত্রায় কার্বনডাই-অক্সাইড তৈরি, প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য পুড়ে যাওয়া, খাদ্যের গুণগতমান নষ্ট হওয়া ইত্যাদি। অনেক সময় পানি বা দুধ ফুটন্ত অবস্থায় পড়ে চুলি নিভে গিয়ে নির্গমনকৃত গ্যাস দ্বারা অগ্নিসংযোগের মতো দুর্ঘটনাও ঘটে থাকে। অন্যদিকে সিলিন্ডারের গ্যাস ব্যবহারে খরচ বেশি, অপচয় কম। ইটখোলা এবং বিভিন্ন মিল, কল-কারখানায় অপচয়ের মাত্রা অনেক বেশি। গ্যাস লেকেজসহ বিভিন্ন লেভেলে বড় ধরনের অনীহা হয়ে থাকে নিজ নিজ বিভাগের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যোগসাজশে। উল্লেখ্য, গত ২১ জুন পত্রিকায় প্রকাশিত 'ঢাকায় লক্ষাধিক অবৈধ গ্যাস সংযোগ' শিরোনামটিতে পেট্রোবাংলার কিছু অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যোগসাজশে অবৈধ সংযোগের ঘটনা ঘটে, যা এ জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। এর সত্যতা প্রমাণিত হলে কয়েকটি প্রশ্ন জাগে। যারা এ কাজের সঙ্গে জড়িত তাদের সততা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশপ্রেম—সবই প্রশ্নবিদ্ধ। বিগত কোনো সরকারই গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির সমস্যা সমাধানে শতভাগ সফলতা দেখাতে পারেনি এই দুষ্ট চক্রের কারণে। আমাদের দেশে উত্তোলন ও সরবরাহের জটিলতাই বড় সমস্যা বলে ধারণা করা যায়। গ্যাসের প্রচুর মজুদ রয়েছে। পেট্রোবাংলার ভাষ্যমতে, বর্তমানে দৈনিক উৎপাদন দুই হাজার ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট ছাড়িয়ে গেলেও তা সরবরাহের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গ্যাস ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে। বর্তমানে জ্বালানি তেল দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় হচ্ছে। উল্লেখ্য, কুইক রেন্টাল দ্বারা সাময়িক বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণ সম্ভব। তবে এর ধারাবাহিকতা বহাল থাকলে দেশ দেউলিয়া হতে বাধ্য। আমাদের উত্তোলনের জন্য প্রযুক্তির অভাব। ফলে বেশির ভাগ গ্যাস বা টাকা নিয়ে যাচ্ছে উত্তোলনকারী বিভিন্ন বিদেশি কম্পানি। সিলেটের হরিপুর গ্যাসকূপ থেকে বিগত পাকিস্তান আমল থেকে গ্যাস বের হয়ে যাচ্ছে। এমনকি পাহাড়ের গায়েও ভাত-তরকারি রান্না করে যাচ্ছে স্থানীয় অনেকেই। ওই কূপটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে পাকিস্তান আমলেই। এভাবে অপচয় হতে থাকলে ২০২০ সালের মধ্যে গ্যাস ফুরিয়ে যাবে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে, সমুদ্রজয়ে আমাদের অতিরিক্ত প্রাপ্তি ১২টি ব্লক, সেখান থেকেও আমরা পাব আরো অনেক গ্যাস। গ্যাসের অপচয় রোধে নিজ নিজ বাসাবাড়ির গ্যাস ব্যবহারে আন্তরিক হতে হবে। ঢালাওভাবে গ্যাস সরবরাহের পরিবর্তে সিলিন্ডারের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অপচয় রোধকল্পে বাসাবাড়িসহ বিভিন্ন পর্যায়ে গ্যাস মিটারের ব্যবস্থা করা অতীব জরুরি। অবৈধ সরবরাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সিএনজি, ইটখোলায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করা প্রয়োজন। বিগত সরকার যে উদ্দেশ্যে গ্যাসচালিত সিএনজি গাড়ি আমদানি করেছিল তা বাস্তবায়িত হয়নি। মিটারের মাধ্যমে ভাড়া আদায় তো দূরের কথা, ৫০ টাকার দূরত্বের জন্য ভাড়া নেওয়া হচ্ছে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা। সিএনজিচালিত পরিবহনের অবাধ চলাচলের কারণে যানজটের মাত্রা বেড়েই চলছে ঢাকাসহ অন্যান্য মেট্রোপলিটন শহরে। গ্যাসচালিত গাড়ির সংখ্যা হ্রাস পেলে যানজটও হ্রাস পাবে—এটাই বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। সব কথার শেষ কথা, সবাইকে হতে হবে সৎ ও দেশপ্রেমিক। এ জন্য প্রয়োজন জনসচেতনতা। আমাদের দেশে বর্তমানে যেহেতু গ্যাসের মজুদ অনেকটাই আশাব্যঞ্জক, তাই গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প গ্রহণে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু গ্যাসই নয়, সব ক্ষেত্রেই সৎ ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ নিজ স্থান থেকে দেশের সার্বিক উন্নয়নের কথা ভাবতে হবে সবাইকে। তবে গ্যাসের পাশাপাশি বিদ্যুতের অভাবও দূর হবে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশাবাদী।

লেখক : অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
fhoque.hstu@gmail.com

কালের কণ্ঠ
www.kalerkantho.com রবিবার। ২৯ জুন ২০১৪। ১৫ আষাঢ় ১৪২১

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

বাস্তবতার নিরিখে র‍্যাব

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় র‍্যাব বাহিনী বন্ধের পক্ষে-বিপক্ষে অনেক মতামত, উপদেশ, যুক্তিতর্ক, বিভিন্ন টক শো, পত্রপত্রিকা ও রাজনৈতিক বক্তব্যে উপস্থাপিত হয়েছে। র‍্যাব নামের এ চৌকস বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য মহৎ। যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে দেশের উন্নতি ও অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখার দায়িত্ব-পাওয়াটা আরো সম্মানের, গৌরবের—এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের কাছ থেকে দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের ন্যায়সংগত চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা অনেক বেশি। এ বিষয়গুলো উপলব্ধি করতে হবে সংশ্লিষ্ট সব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে, বিশেষ করে দক্ষ ও চৌকস র‍্যাব সদস্যদের। বিগত দিনের কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনার মতো ঘটনা যেন আর না ঘটে, সেদিকে সবাইকে নজর রাখার বিকল্প নেই। যারা অপরাধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত, তাদের যথাযথ আইনের আওতায় এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সময়ের দাবিই শুধু নয়, পবিত্র দায়িত্বও বটে। র‍্যাব বাহিনীর বিলুপ্তির দাবি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নয়। জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে অনেক বিষয়ে। প্রকৃতপক্ষে দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে র‍্যাব বাহিনীর উপস্থিতি অতি জরুরি, তাদের অবদান অনস্বীকার্য। তবে যেকোনো বাহিনীকেই রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে দায়িত্ব পালনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তৎকালীন সরকার ২০০৩ সালে র‍্যাব নামের একটি চৌকস বাহিনী তৈরি করে, যার মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন পর্যায়ের সেনা সদস্য (স্থল, বিমান ও নৌবাহিনী), পুলিশ ও বিজিবি (বিডিআর) সদস্য। চাকরিজীবনে সৎ, দক্ষ, সাহসী যাঁরা, তাঁদেরই স্থান রয়েছে র‍্যাব বাহিনীতে। বাংলাদেশের গোড়ার দিকে চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মতো ছোটখাটো ঘটনা ঘটলেও তা পুলিশের পক্ষেই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধপ্রবণতা ক্রমেই তীব্র হতে থাকে। চাঁদাবাজি, ছিনতাই, চুরি-ডাকাতি, জমি, বাড়ি, মিল দখল ইত্যাদিতে দেশের মানুষের ঘুম হারাম হয়ে যেতে থাকে। বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। চাঁদা না পেলে প্রয়োজনে অপহরণ, গুম, কনস্ট্রাকশন দেওয়াল ভেঙে দেওয়া, মালামাল লুট ইত্যাদি করা হতো। মাদকের ছড়াছড়ি যেমন হেরোইন, গাঁজা, ফেনসিডিল ইত্যাদি বেড়ে যায় রাতারাতি। বনজঙ্গলে ও দ্বীপাঞ্চলে গড়ে উঠতে থাকে অবৈধ অস্ত্র কারখানা ও সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র। ইসলামের নামে জঙ্গি সংগঠনের প্রশিক্ষণ ও মহড়া চলতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় একপর্যায়ে আগমন ঘটে বাংলা ভাইয়ের। রাজশাহীর বাঘমারায় গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয় সাধারণ মানুষকে। ৬৪ জেলায় একই সময়ে বোমা ও গ্রেনেড ফাটিয়ে বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়। সে পরিস্থিতিতে র‍্যাবের ভূমিকা গ্রহণযোগ্যতা পায়। বাংলা ভাইকে দলবলসহ আহত অবস্থায় পাকড়াও করা হয় মধুপুর এলাকার বাসা থেকে। শায়খ আবদুর রহমানকে সিলেটের এক ভাড়া বাসা থেকে আটক করেন এই চৌকস র‍্যাব সদস্যরাই। ওই সব বীরত্বের ঘটনায় র‍্যাব সবার বন্ধুরূপে সর্বত্র গ্রহণযোগ্যতা পায়। খারাপ মানুষের মধ্যে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সন্ত্রাসীদের অনেকেই দেশ ত্যাগ করে বাইরে অবস্থান করছে। তবে মোবাইলের যুগে চাঁদাবাজি থেমে নেই। ভেতরে ভেতরে চলছে চাঁদাবাজি, অপহরণ, গুম, হত্যাসহ বিভিন্ন অপকর্ম। দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের ঘটনায় যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইন্ধন জুগিয়েছে ও হত্যায় অংশ নিয়েছে, তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি হওয়া প্রয়োজন এবং আদালতই তা নির্ধারণ করবেন।

> র‍্যাবের মধ্যে কোনো সদস্য অপরাধ করলে আইনগতভাবেই তাঁর সাজা হবে। তবে কয়েকজন সদস্যের অপরাধকে কেন্দ্র করে পুরো বাহিনীকে অপরাধীর পাল্লায় ফেলে বিলুপ্ত করা আত্মঘাতী কাজেরই অনুরূপ

নারায়ণগঞ্জের ঘটনা অবশ্যই র‍্যাব সদস্যদের প্রতি মানুষের আস্থা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থানটিতে আঘাত হেনেছে। তবে দুই-চারজন সদস্যের অন্যায়ের কারণে গোটা বাহিনীকে দোষ চাপিয়ে বা পুরো র‍্যাব বাহিনীকে বিলুপ্তির দাবি তোলা যুক্তিসংগত নয় বলেই বেশির ভাগ বিজ্ঞজন মনে করেন। দেশের স্বার্থেই সব শ্রেণি-পেশার মানুষের গঠনমূলক সমালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। ২০০৪ সালে ক্রসফায়ার চালুর পর বিরোধী দল আওয়ামী লীগও বলেছিল সন্ত্রাসীর পাশাপাশি আওয়ামী লীগ দলের সদস্যদের মারা হচ্ছে। যেমনটি দাবি তুলছে বর্তমানে বিএনপি দলের উচ্চ মহল থেকেও। প্রকৃতপক্ষে বিচারবহির্ভূত মৃত্যু বা হত্যা কারো কাম্য নয়। উল্লেখ্য, গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দুই বছরে এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে ৩৪০ জন। বর্তমান সরকারের সাড়ে পাঁচ বছরে ১১৭ জন। অর্থাৎ বছরে ১৭০ জন থেকে ২১ জনে নেমে এসেছে। র‍্যাবের চৌকস তদারকির কারণে গত সাড়ে ১০ বছরে বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত প্রায় দেড় লাখ সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ, মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অপরাধীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ, মাদকদ্রব্য আটক করা হয়েছে। ফলে জনমনে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসছে। নারায়ণগঞ্জের অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য সবাই দুঃখিত ও আতঙ্কিত। আইনের ঊর্ধ্বে যে কেউ নয়, তার প্রমাণিত হলো ২০১০ থেকে ২০১১ এই এক বছরে বিভিন্ন অপরাধের জন্য প্রায় এক হাজার ৩০০ জনের অধিকসংখ্যক র‍্যাব সদস্যকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৯০০-এর অধিক র‍্যাব সদস্যকে চাকরি থেকে বরখাস্তও করা হয়েছে। কাজ করলে ভুলত্রুটি হতেই পারে, তবে ইচ্ছাকৃত ভুল অমার্জনীয় অপরাধ। র‍্যাবের মধ্যে কোনো সদস্য অপরাধ করলে আইনগতভাবেই তাঁর সাজা হবে। তবে কয়েকজন সদস্যের অপরাধকে কেন্দ্র করে পুরো বাহিনীকে অপরাধীর পাল্লায় ফেলে বিলুপ্ত করা আত্মঘাতী কাজেরই অনুরূপ। দেশের শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে র‍্যাবের ভূমিকা সবার ঊর্ধ্বে। দলমত নির্বিশেষে সবাইকে নিরপেক্ষভাবে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে। র‍্যাব সদস্যদেরও ভাবতে হবে, তাঁরাও এ দেশেরই নাগরিক, দেশের উন্নয়নের অংশীদার, দেশের ভাবমূর্তি রক্ষায় র‍্যাব সদস্য হিসেবেই শুধু নয়, নাগরিক হিসেবেও অবদান রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

লেখক : অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

উপ-সম্পাদকীয় ঢাকা ❑ রবিবার ❑ ২৩ জুন ২০১৩ ইং

চার সিটিকর্পোরেশন নির্বাচন

নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতীক

প্রফেসর ডাঃ মোঃ ফজলুল হক

গত ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত ২৫ বছরের চাকুরী জীবনে পাঁচটি সংসদ নির্বাচন, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছি। সেখানে ভোট চুরি, ভোট বাক্স ছিনতাই, ব্যালট পেপার হাতা হাতি, মারামারি দাঙ্গা হাঙ্গামা দেখার ও প্রতিরোধ করার সুযোগ হয়েছে। হাঁ/না ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও হয়েছে। গত ২০০৮ সালের নির্বাচনটিতে আমার কেন্দ্রটির ভোট গ্রহন শতভাগ সঠিক হয়েছিল। তবে বিশেষভাবে আলোকপাত করার বিষয়টি হচ্ছে গত ১৫ ই জুন/২০১৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত চারটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিগত সকল নির্বাচনের উপরে স্থান করে নিয়েছে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ করে দিয়েছে সরকার। কয়েকটি ছোট খাট বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও ভোট গ্রহণ ও প্রয়োগে বাধার কারণ হয়নি। এ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার প্রমাণ করেছে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও তত্ত্বধায়ক সরকার ছাড়াই নিরপেক্ষ থেকে জাতীয় নির্বাচন করা সম্ভব। আরও অবাক করার বিষয় হচ্ছে সরকার দলের মেয়র প্রার্থীরা পরাজয়কে মেনে নিয়ে জয়ী প্রার্থীদের সাথে দেখা করে শুভেচ্ছা বিনিময় ও মিষ্টিমুখ করেছেন, ফুলের তোড়া দ্বারা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন একত্বতা ঘোষণা করেছেন। বিগত সময়ের কালচার ছিল হেরে গেলেই ভোট কারচুপী হয়েছে জিতলে সঠিক হয়েছে। তারপরও অবাক করেছে কয়েকটি মন্তব্যে সেখানে ১৮ দলের মন্তব্য হল; * পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছে ইসি ও সরকার, * ফল পাল্টে দিতেই সেনা মোতায়েন করা হচ্ছে না * কামরানকে জেতাতে মরিয়া আওয়ামীলীগ ইত্যাদি। লিফলেটের মাধ্যমে আপত্তি কর বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে বলেও জানা যায়। শত বাধা ও আপত্তির মুখে এধরণের একটি নির্বাচন উপহার দেওয়া দেশবাসীর পক্ষ থেকে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সকল সদস্যরাই ধন্যবাদ পাওয়ার দাবী রাখেন। এ নির্বাচনে বিশ্ববাসী জানতে পেয়েছে বাংলাদেশ একটি অন্যতম প্রধান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অনেকেই বক্তব্য করেছেন বিরোধী দল হেরে গেলে হরতাল, অবরোধসহ সহিংশ ঘটনা ঘটবেই। এ সংশয় ও সন্দেহ প্রায় সবার মধ্যে।

বিগত সাড়ে চার বছরে আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে ৪৬৪৯টি বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে। এ সরকার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মাধ্যমে আবারও প্রমান করল তাদের অধীনে তত্ত্বধায়ক নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া জাতীয় নির্বাচন হওয়া সম্ভব। জনগণও বুঝতে পেরেছে তত্ত্বাধায়ক সরকার দাবীর ইসুটি অত্যন্ত দুর্বল ও অযৌক্তিক। অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যাল এক টকশোতে মন্তব্য করেন বর্তমান সরকারের আমলে যে উন্নয়ন ঘটেছে তা পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশী কিন্তু জনগণকে সঠিক ভাবে বোঝাতে পারছেন না আওয়ামী লীগ। নেতাকর্মী ও জনগনের মধ্যে দুরত্ব কমিয়ে আনতে হবে। নাইমূল ইসলাম খান, সম্পাদক, আমাদের অর্থনীতি একই ধরনের মন্তব্য করেন, টকশোতে। এ বিষয়ে আমিও একমত পোষণ করছি বর্তমান সরকারের সময়ে যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটলেও তা জনসম্মুখে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে না। দেশের উন্নয়নের বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে জনগনের সামনে তুলে ধরতে হবে অন্যথায় আওয়ামীলীগ যতটা না ক্ষতিগ্রস্থ্য হবে তার চেয়েও বেশী ক্ষতিগ্রস্থ্য হবে এদেশের উন্নয়নের গতি। উন্নয়নের এ চাকা থেমে যাবে আংশিক বা সম্পূর্ণরুপে। গত নির্বাচনে আঠার দলের পক্ষে বড় বিজয়কে সাধুবাদ জানাই। তবে যুদ্ধাপরাধীকে বাঁচানোর চিন্তায় মগ্ন হলে হিতে বিপরীতও হতে পারে। শিংহভাগ ভোটারই নিরপেক্ষ থেকে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেন। তাঁদের ভোটেই পালা বদল হয়। তাঁদের হিসাব নিকাশই আসল। নির্বাচনের ১ ঘন্টা পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন অনেকে। অনেক সময় নির্বাচনের ফলাফল হতে পারে ক্রিকেট খেলার মতোই সুতরাং নিরাশ হওয়ার কিছু নেই কোন পক্ষের অনেক সময় শোনা যায় ভোট টাকা দিয়েও কিনা যায় কিন্তু ভোট কেনা যায় এমন বাস্তব উদাহরণও রয়েছে।

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

অপশক্তির এই দৌরাত্ম্য কত দিন

আমাদের দেশের অর্থনীতির ভিত নির্ভর করে প্রধানত তিনটি সেক্টরের ওপর, তা হলো : ১. কৃষি, ২. গার্মেন্ট সেক্টর এবং ৩. বৈদেশিক রেমিট্যান্স বা বৈদেশিক আয়। অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিভিন্ন কারণে। বর্তমানে সহিংস হরতাল ও অসুস্থ রাজনীতি, যেমন—মানুষ হত্যা, গাছ হত্যা, সম্পদে অগ্নিসংযোগ, ট্রেন ও বাসে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত এক আলোচনায় সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, জানমাল রক্ষা করা ফরজ এবং রাষ্ট্রকে অবশ্যই সন্ত্রাস রুখতে হবে। জনগণকে নিরাপত্তা দিতে হবে। উল্লেখ্য, স্বাধীনতা অর্জন যেমন কঠিন, তেমনি স্বাধীনতা রক্ষা করা আরো কঠিন। প্রমাণ বর্তমান প্রেক্ষাপট। বাংলাদেশের মানুষ আজ দ্বিধাবিভক্ত। এক দল বিগত দিনের স্বাধীনতাবিরোধী কার্যকলাপের সাক্ষী হয়ে বর্তমানেও হিংস্রতার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলছে।

গত কয়েক মাসে হিংসাত্মক অবরোধ ও হরতালের কারণে যাদের মূল্যবান জীবন নিঃশেষ হলো অগ্নিদগ্ধ হয়ে, যারা মৃত্যুর সঙ্গে বার্ন ইউনিটে কাতরাচ্ছে, তা যে কত কষ্টের ও মর্মান্তিক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গাড়িতে পেট্রলবোমা নিক্ষেপের মতো দুঃসাহস যারা দেখাচ্ছে, তারা হিংসা ও হিংস্রতার কোন পর্যায়ে, তা সবার কাছে পরিষ্কার। শান্তিপ্রিয় মানুষ অনুধাবন করলেও তারা আজ নির্বিকার। এ দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ প্রকৃত অর্থে দুর্বল নয়। সবার মধ্যে একটি সন্দেহের কল্পকাহিনীর জন্ম দিয়েছে, ধ্বংসকারী ও অগ্নিসংযোগকারী কারা? এদের আসল উদ্দেশ্য কী? এদের বুঝতে হলে ফিরে যেতে হবে ৪৩ বছর আগে, যে কারণে পূর্ব পাকিস্তানের কবর রচনা ও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম।

সেদিন মাত্র ১ শতাংশ মানুষ ৯৯ শতাংশ স্বাধীনতাকামী মানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। আজও তারাই বিভিন্নভাবে হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত। সেদিন পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসররা গণহত্যাসহ নানা অপকর্মে লিপ্ত ছিল। বোনের সম্ভ্রম ও ইজ্জতের ওপর আঘাত হেনেছে, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শিশুসহ গর্ভবতী মায়েদের হত্যা করেছে। ধরে নিয়ে গেছে কোমলমতি মেয়েদের, পুত্রবধূদের, মা-মেয়েকে একই ঘরে রেখে পৈশাচিক আচরণ করেছে, যার সাক্ষী এ দেশের পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সী মানুষ, যার সাক্ষী এ দেশের মুক্তিযোদ্ধারা, যার সাক্ষী এ দেশের মসজিদের ইমাম, সর্বোপরি যার সাক্ষী আক্রান্ত ও নির্যাতিত বীরাঙ্গনা মহিলারা, যাঁরা এখনো অবহেলিত জীবন যাপন করছেন। তাঁরা আজ কলঙ্কিনী এবং সমাজে অবহেলিত। পাকিস্তানিদের ভাষা উর্দু, পাঁতার কাটতে জানে না, রাস্তাঘাট চেনে না, অথচ তারাই দোসরদের সাহায্য ও সহযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষ হত্যা করেছে।

একটি দেশ পরাধীনতার বেড়াজাল থেকে মুক্তি চাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দল ও মতের বা রাজনৈতিক মতামতের ভিন্নতা থাকতেই পারে। কিন্তু যখন মানুষ হত্যা, সম্পদ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করার পথ বেছে নেয়, তখন সে আর স্বাভাবিক মানুষ হতে পারে না। আবদুল কাদের মোল্লার কথাই ধরুন। তাঁর জন্মস্থান আমার এলাকায়, অর্থাৎ ফরিদপুরের সদরপুরের জরিপের ডাঙ্গী গ্রামে। পরে বাড়ি করেছেন আমিরাবাদ গ্রামে। পড়ালেখা করেছেন আমিরাবাদ হাই স্কুলে। পরে রাজেন্দ্র কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। একই স্কুলে পড়াশোনা করেছি, তিনি বয়সে আমার চেয়ে কিছুটা বড় ছিলেন। তবে ইসলামী শিক্ষা বা আরবি লাইনে কোনো মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেননি তিনি। গরিব ও নিম্নমধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারণে অর্থলোভেই পা দিয়েছিলেন জামায়াতে ইসলামীর ফাঁদে। পরে সেখান থেকে জল্লাদের খাতায় নাম লিখিয়ে ফাঁসিতে মরতে হলো তাঁকে। তিনি মরলেন বাঙালির ঘরে জন্মগ্রহণ করে পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে, যা অত্যন্ত কলঙ্কজনক। অনেক আলেম বিভিন্ন লেখনী বা বিবৃতির মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন, জামায়াতে ইসলামী কোনো ইসলামী দল নয়। মাওলানা হাফেজজী হুজুরসহ উচ্চপর্যায়ের ৪৫২ জন আলেমের মন্তব্য হলো, জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করা বিষপান সমতুল্য এবং ফেরাজতে ইসলামের আমির আল্লামা আহমদ শফী এক সাময়িকীতে লিখেছেন, জামায়াতে ইসলামী কাদিয়ানিদের চেয়েও খারাপ। জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মওদুদী সাহেবের ছেলে ফারুক মওদুদী তাঁর বক্তব্যে একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, জামায়াতের এ দেশে রাজনীতি করার অধিকার নেই। প্রকৃত ইসলাম থেকে তারা বিপরীতমুখী, পাকিস্তানের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। তারা গরিব ছাত্রদের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে হিংস্রতার ট্রেনিং দেয়, যার প্রমাণ আবদুল কাদের মোল্লা। যিনি ঢাকার মিরপুরে অবস্থান করে ওই এলাকার জল্লাদের ভূমিকা পালন করেছেন। মানুষ হত্যা করেছেন, যার সাক্ষী আলুবদী গ্রামের মানুষ, মিরপুর এলাকার মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা অস্ত্র ধরেছি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। তার প্রমাণিত অপকর্মের জন্য শুধু সদরপুরবাসীই লজ্জিত বা দুঃখিত নয়, সমগ্র জাতি লজ্জিত। যুদ্ধাপরাধীদের পৈশাচিক কার্যকলাপ ভুলেই যেত, যদি গত ২০০৫ সালে ৬৮টি জেলায় বোমা ফাটানো, বিচারক হত্যা, বাস, ট্রেন ও লঞ্চে পেট্রলবোমা দ্বারা মানুষ হত্যা করা না হতো। তেমনিভাবে গাছ কেটে, মোটরসাইকেল, বাড়ি ও দোকানে অগ্নিসংযোগ না করা হতো। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করে দল বেঁধে লাঠিসোঁটা, রামদা, ককটেল, পেট্রলবোমাসহ বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা মানুষ হত্যা ও সম্পদের ক্ষতি করে থাকে ইসলাম নামধারী কিছু দলের সদস্যরা। এ মাসের প্রথম দিকে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের স্লোগান দিয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হলে অবস্থানরত বিদেশি ছাত্রদের কক্ষের কাচের জানালাসহ এ দেশীয় ছাত্রদের কক্ষের প্রায় ২০০টি জানালার গ্লাস, কিছু চেয়ার, আসবাব ভাঙচুর করে। একই কায়দায় পরদিন ছাত্রশূন্য শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হল, ড. ওয়াজেদ ভবন, ডরমিটরি-১, একাডেমিক ভবন-১ ও ক্যাম্পাসে অবস্থানরত বাসের গ্লাস ভাঙচুর করে এবং একটি হলে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করা হয়। এটিই হলো ইসলাম নামের অনৈসলামিক দলের হিংসাত্মক কাজের বহিঃপ্রকাশ। এতে ক্ষতির পরিমাণ লাখ লাখ টাকা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় প্রতিটি রাস্তাঘাট, ছাত্রাবাস, মসজিদ, এয়ারটেনশনসহ নতুন নতুন বিল্ডিং গড়ে উঠেছে এ দেশের জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে। এ ধরনের ধ্বংসাত্মক ঘটনা দলমত-নির্বিশেষে সবাইকেই ব্যথিত করেছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে নিঃসন্দেহে। ৪২ বছরে সব সরকারই উন্নয়নে কমবেশি ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে বিদেশি শত্রু-মিত্র সব দেশের প্রতিনিধিরাই উন্নয়নের মডেল হিসেবে দেখছেন, যা বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু গত তিন মাসের রাজনৈতিক অস্থিরতা উন্নয়নে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে এবং গণতন্ত্রের স্বার্থেই সহিংস হরতাল প্রত্যাহার করে রাজনৈতিকভাবে সমঝোতার মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হোক—এটি সবার কাম্য।

লেখক : অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সেদিন মাত্র ১ শতাংশ মানুষ ৯৯ শতাংশ স্বাধীনতাকামী মানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। আজও তারাই বিভিন্নভাবে হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত

ডা. মো. ফজলুল হক

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে বাধা

> ১৬টি বিভাগের অধীনে গবেষণার নামে প্রজেক্ট এনে কোটি কোটি টাকা কীভাবে ব্যয় হচ্ছে, প্রাণিসম্পদের কতটা ক্ষতি বা লাভ হচ্ছে, সে হিসাব মেলানোর সময় এসেছে। জনসাধারণের কষ্টার্জিত টাকা এভাবে আত্মসাত এবং গবেষণার নামে প্রতারণা করে প্রাণিসম্পদের ক্ষতি যারা করছে, তাদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতি জরুরি।

বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য একমাত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির নাম 'বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান' (বিএলআরআই) সাভারে অবস্থিত। এর অর্গানোগ্রাম দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, এটি কেনিয়ায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল লাইভস্টক রিসার্স ইন্সটিটিউটের মতোই একটি এনজিও প্রকৃতির গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ওই গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শাখা রয়েছে এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে। এটি এনজিও প্রতিষ্ঠান, যার মূল উদ্দেশ্য কৃষি প্রাণী-এর মাধ্যমে পরিব ও উন্নয়নশীল দেশের মানুষের ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করা। কিন্তু বাস্তবে বিএলআরআই বাংলাদেশের একটি সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যেখানে রয়েছে ১৭টি শাখা বা বিভাগ। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির অর্গানোগ্রাম এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমন্বিত কোর্সে ডিগ্রিধারী ভেটেরিনারিয়ানদের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে গবেষণায় ভূমিকা রাখার সুযোগ দেয়া হয়নি বললেই চলে। পক্ষান্তরে ভেটেরিনারিয়ানদের ১টি এবং অ্যানিমেল হাসবেনড্রি গ্রাজুয়েটের জন্য ১৬টি শাখা বা বিভাগে গবেষণার নামে চলছে অনিয়ম, যা সাবেক একজন ডিজি সাহেবের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ থেকেই ধারণা করা যায়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ছাড়া বিশ্বের অন্য কোথাও অ্যানিমেল হাজবেনড্রি নামে কোন ডিগ্রি দেয়া হয় না এবং বাংলাদেশেও তাদের এ ডিগ্রিকে অকার্যকর আখ্যায়িত করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১৯৬২ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে ভেটেরিনারি সায়েন্স ফ্যাকালটিতে সমন্বিত ডিগ্রি কোর্সের ১০০ ভাগ পড়ানো হতো। কিন্তু মাত্র কয়েকজন পদলোভী ব্যক্তির দ্বারা বিভক্ত হয়ে দুটি অনুষদে বিভক্ত হয়। এখানে অ্যানিমেল হাসবেনড্রি অনুষদের গ্রাজুয়েটরা সমন্বিত ডিগ্রি কোর্সের মাত্র ২০-২৫ শতাংশ এবং ভেটেরিনারি সায়েন্সের গ্রাজুয়েটরা সমন্বিত ডিগ্রি কোর্সের ৬২-৬৮ শতাংশ পড়ে থাকে। অন্যদিকে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান আমলে ম্যাট্রিক পাসের পর এএইচ গ্রাজুয়েটরা ৫ বছরের কোর্স এবং ভেটেরিনারিয়ানরা ৬ বছরের কোর্স পড়ত। বর্তমানে এইচএসসি পাসের পর এএইচ গ্রাজুয়েটরা ৬ মাস ইন্টার্নিসহ ৪ বছর ৬ মাস এবং ভেটেরিনারি গ্রাজুয়েটরা ৬ মাস ইন্টার্নিসহ ৫ বছরের কোর্স কারিকুলাম ও সিলেবাস পড়ে থাকে। অর্থাৎ ভেটেরিনারি গ্রাজুয়েটদের সময় বেশি লাগার কারণে একই সময়ে ভর্তিকৃত গ্রাজুয়েটের মধ্যে এএইচ গ্রাজুয়েটরা ছয় থেকে এক বছর আগেই চাকরিতে প্রবেশের সুযোগ পায়। ভেটেরিনারিয়ানরা ৬ মাস থেকে ১ বছর জুনিয়র হওয়ার কারণে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদই তাদের দখলে, যদিও তাদের সংখ্যা মাত্র ১৫ শতাংশ। প্রাণিসম্পদ অধিদফতর বিএলআরআই-এর ডিজিসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মহোদয় এএইচ গ্রাজুয়েট হওয়ায় আন্তর্জাতিকমানের ভেটেরিনারি পেশাকে ছেয়ে এবং প্রাণিসম্পদ ধ্বংসে করার জন্য তৎপর। পশুসম্পদ অধিদফতরেও একই অবস্থা। অর্গানোগ্রাম তৈরির মাধ্যমে অ্যানিমেল হাসবেনড্রি গ্রাজুয়েটদের চাকরিতে অধিক সুযোগ সৃষ্টি করাই মূল উদ্দেশ্য। সজ্ঞানেই প্রাণিসম্পদকে কম গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। সরেজমিনে তদন্ত করলে স্পষ্টভাবেই বোঝা যাবে অ্যানিমেল হাসবেনড্রি গ্রাজুয়েটদের কাজ করার মতো তেমন কিছু নেই। শুধু পদ ধরে রেখে ওইটেরিনারিয়ানদের ওপর চেপে বসা এবং রাজনীতির নামে নিজেদের রক্ষা করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ড. বিজন কুমার শীল, সায়েনটিফিক অফিসার বিএলআরআই-এ গবেষণা করে ছাগলের মহামারী রোগের বিরুদ্ধে পিপিআর ভ্যাকসিন এবং পোলট্রির গামব্রো রোগের প্রতিষেধক গামব্রো ভ্যাকসিন তৈরিতে সফল হন। তিনি একজন ভেটেরিনারিয়ান হওয়ায় তার আবিষ্কারের এ সুনাম অন্যরা সইবে কীভাবে? মিথ্যা অভিযোগ এনে তাকে ওই প্রতিষ্ঠান ছাড়তে বাধ্য করা হয়। তিনি বর্তমানে সিঙ্গাপুরে National Research Institute-এ সফল বিজ্ঞানী। তেমনিভাবে ফাও-এর চাকরির জন্য বাকুবির একজন জনমন্যা অধ্যাপক, যার ১০০টির বেশি গবেষণা প্রবন্ধ এবং ১২টি প্রাণিসম্পদের ওপর লিখিত পুস্তক রয়েছে, এমন একজন ভেটেরিনারিয়ানকেও কলাকৌশলে চাকরি পাওয়া থেকে বিরত রাখেন অবসরপ্রাপ্ত একজন প্রাণিসম্পদের মহাপরিচালক, যিনি এএইচ গ্রাজুয়েট। এমনি আরও অনেক ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বিএলআরআই-এর একজন সম্মানিত অদক্ষ ডিজি'র বিরুদ্ধে দুদকের মামলা হয়েছিল কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের। এ লাইনটি তাদের জন্য খোলা। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত ১৬টি বিভাগের অধীনে গবেষণার নামে প্রজেক্ট এনে কোটি কোটি টাকা কীভাবে ব্যয় হচ্ছে, প্রাণিসম্পদের কতটা ক্ষতি বা লাভ হচ্ছে, সে হিসাব মেলানোর সময় এসেছে। জনসাধারণের কষ্টার্জিত টাকা এভাবে আত্মসাৎ এবং গবেষণার নামে প্রতারণা করে প্রাণিসম্পদের ক্ষতি যারা করছে, তাদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতি জরুরি। আমরা যারা নিঃস্বার্থভাবে দেশের স্বাধীনতায় অবদান রেখেছি তাদের এগুলো ভাবতেও কষ্ট হয়। দুর্নীতি-অনিয়ম-খেল-তামাশার সুযোগ আর দেয়ার সময় নেই। চাই দেশের উন্নয়ন।

পরিতাপের বিষয়, পাকিস্তান আমলেও প্রতিটি থানায় ১টি ভেটেরিনারি সার্জনের পদ ছিল। স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও বিশেষ মহলের ষড়যন্ত্রের কারণেই প্রতিটি উপজেলায় ভেটেরিনারি সার্জনের একটি পদও বাড়ানো হয়নি। অধিকাংশ উপজেলায় ভেটেরিনারি সার্জনের পদ শূন্য রয়েছে। উল্লেখ্য, দিনাজপুর জেলার ১৩টি উপজেলায় মাত্র ৩ জন ভেটেরিনারি সার্জন কর্মরত আছেন। বাকি ১০টি পদ শূন্য। এ চিত্র সমগ্র বাংলাদেশের। অথচ বর্তমানে প্রায় ১ হাজার দক্ষ ভেটেরিনারি গ্র্যাজুয়েট বেকার। একটি কুচক্রী মহল ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অপ্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টিতে অতি আগ্রহী। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রিধারী ভেটেরিনারি গ্র্যাজুয়েট, যারা প্রাণীর চিকিৎসা, গবেষণা, প্রাণীর স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিষেধক উৎপাদন ও প্রয়োগসহ জনস্বাস্থ্য সেবায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সুতরাং এ মুহূর্তে প্রয়োজন প্রতি উপজেলায় ৪ জন এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ২ জন ভেটেরিনারি সার্জনের পদ সৃষ্টির মাধ্যমে জনসাধারণকে সেবা প্রদান ও বাকুবির এএইচ অনুষদটি বন্ধ করে তা ভেটেরিনারি সায়েন্স অনুষদের সঙ্গে একত্রীকরণের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের গতিকে সম্প্রসারিত করা। বর্তমানে প্রায় এক হাজার বেকার ভেটেরিনারিয়ানের কর্মসংস্থান করা জরুরি প্রয়োজন। অন্যথায় প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন আরও বাধাগ্রস্ত হবে আগামীতে।

ডা. মো: ফজলুল হক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান, মেডিসিন, সার্জারি ল্যান্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

‘মানবজাতির ত্রাণকর্তা’ হজরত মুহাম্মদ (সা.)

অধ্যাপক ডা. মো. ফজলুল হক

শ্রদ্ধা

‘আমি মুহাম্মদকে অধ্যয়ন করেছি। আমার বিশ্বাস, তাঁকে মানবজাতির ত্রাণকর্তা বলাই কর্তব্য। যদি তাঁর মতো কোনো ব্যক্তি আধুনিক জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তবে তিনি এর সমস্যাগুলো এমনভাবে সমাধান করতে পারতেন, ধারণাতীত শান্তি ও সুখ অর্জিত হতো। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, মুহাম্মদের ধর্ম আগামী দিনে পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করবে। যেমন আজকের ইউরোপ তাঁকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে।’ হজরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন ইউরোপের প্রখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০)। মহান রাসুল মুহাম্মদ (সা.)-কে মুসলিম উম্মাহ যেভাবে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, কোনো কোনো অমুসলিম পণ্ডিত তাঁকে এতটাই সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার স্বাক্ষর ইতিহাসে রেখে গেছেন, যা সত্যিই সত্যসন্ধানী প্রতিটি মানুষের জন্য চিন্তা ও চেতনার খোরাক হয়ে দেখা দেবে অনন্তকাল। পবিত্র কোরআন বিস্ময়কর আসমানি কিতাব। সেখানে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পাতায় পাতায় খুঁজে পাওয়া যায়। উম্মাহাতুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (রা.)-কে নবীজির চরিত্র, চেতনা ও আদর্শ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বলেছিলেন, হুবহু কোরআন শরিফ। মানে কোরআনে যা বর্ণিত আছে, তিনি ঠিক তা-ই করেছেন।

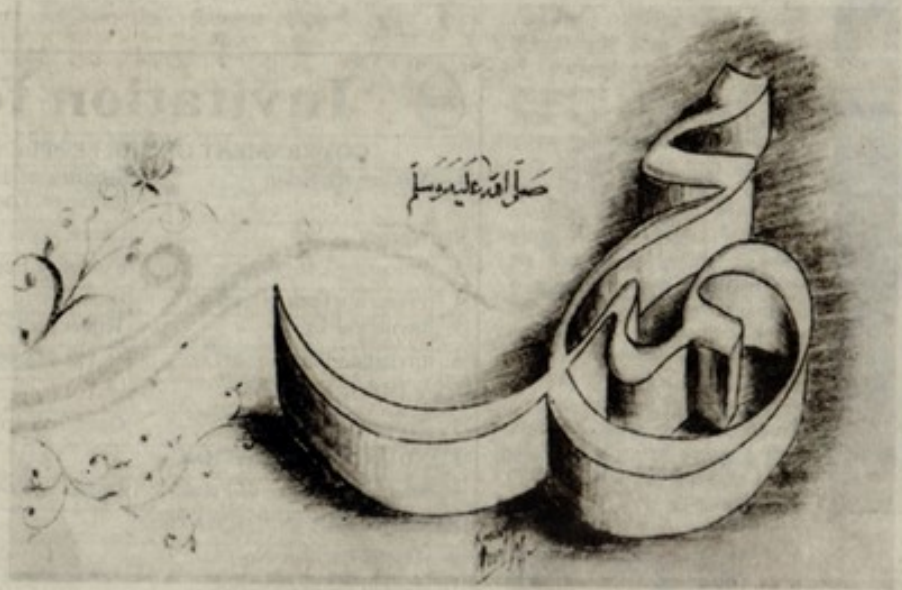

হজরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাইকেল এইচ হার্ট তার ‘দ্য হানড্রেড’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘মুহাম্মদ (সা.)-কে আমি বিশ্বের সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী মনীষীদের তালিকার শীর্ষে স্থান দিয়েছি। মানবজাতির ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি ধর্মীয় ও ধর্মবহির্ভূত উভয় ক্ষেত্রে একযোগে বিপুলভাবে ও সর্বাধিক সফলকাম হয়েছেন।’ স্যার উইলিয়াম ম্যুর বলেন, ‘আবির্ভূত হলেন একটি মানুষ, মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যক্তিত্ব ঐশী নির্দেশ পরিচালনার দাবিতে যুদ্ধরত গোত্রগুলোর অসম্ভব মিলনকে প্রকৃতই সম্পন্ন করলেন।’ লেবাননের হিট্টি বংশীয় প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও মার্কিন মুলুকে অধ্যাপনায় প্রশংসিত প্রফেসর ফিলিপকে হিট্টি আরব জাতি ও দেশ নিয়ে অনেক তথ্যপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি বলেছেন, ‘মুহাম্মদ তাঁর স্বল্প পরিসর জীবনে অনুল্লেখযোগ্য জাতির মধ্য থেকে এমন একটি জাতি ও ধর্মের গোড়াপত্তন করলেন, যার ভৌগোলিক প্রভাব খ্রিস্টান ও ইহুদিদেরও অতিক্রম করল। মানবজাতির বিপুল অংশ আজও তাঁর অনুসারী। অমায়িক ব্যবহার, অনুপম ভদ্রতা ও মহৎ শিক্ষার দ্বারা তিনি আরব জাতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটান। মহত্ত্ব, সহানুভূতি ও বদান্যতার মাধ্যমে তিনি মানুষের হৃদয় জয় করেন। তিনি ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কখনো ন্যায়নীতি ও পুণ্যতার পথ পরিহার করেননি। তিনি ওয়াদা খেলাফ করেননি বা কাউকে প্রতারিত করেননি। এমনকি তাঁর আজীবন শত্রু যারা তাঁকে দেশ হতে বের করে দিয়েছিল এবং আরব জাতিকে তাঁর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছিল—চূড়ান্ত বিজয়ে তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে তাদের ক্ষমা করে দেন। ব্যক্তিগত আক্রোশে তিনি কখনো কাউকে শাস্তি দেননি। দেশের শাসনকর্তা তিনি আগের মতোই গরিবি জীবন যাপন করতেন। ফলে মৃত্যুকালে তাঁর ওয়ারিশদের জন্য কিছুই রেখে যাননি।’

ডব্লিউ মন্টগোমারি ওয়াট বলেছেন, ‘মুহাম্মদ (সা.) তাঁর যুগে তিনি ছিলেন একজন সামাজিক সংস্কারক, এমনকি নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও। তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সামাজিক নিরাপত্তার এক নতুন পরিবার সংগঠন; উভয়টিই ছিল পূর্বেকার ব্যবস্থার ওপর বিরাট উন্নতি সাধন।’ ফরাসি পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ প্রফেসর লামার্টিন তার ‘তুরস্কের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব, উপায় উপকরণে স্বল্পতা এবং বিস্ময়কর সফলতা—এ তিনটি বিষয় যদি মানব প্রতিভার মানদণ্ড হয়, তাহলে ইতিহাসের অন্য কোনো মহামানবকে এনে মুহাম্মদের সঙ্গে তুলনা করবে এমন কে আছে?’

ইতিহাসবিদ স্টানলি লেনপুল বলেছেন, ‘জীবনে কখনো কাউকে মুহাম্মদ আঘাত করেননি। তিনি বলেছিলেন, কাউকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য আমি প্রেরিত হইনি, প্রেরিত হয়েছি বিশ্বজাহানের জন্য রহমতস্বরূপ।’ প্রাচ্য পণ্ডিত গিব ‘মুহাম্মদ ডেমিজম’ বইয়ে লিখেছেন, ‘আজ এটি এক বিশ্বজনীন সত্য যে মুহাম্মদ নারীদের উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন।’ ইউরোপের বিশ্ববিখ্যাত বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তাঁর অটোবায়োগ্রাফিতে বলেছেন, ‘আমি আল্লাহর মহিমা কীর্তন করি এবং পূত চরিত্র ও দিব্য প্রেরণাদীপ্ত মুহাম্মদকে তার পবিত্র কোরআনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।’ প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড গিবন বলেন, ‘আশ্রয়প্রার্থীর জন্য বিশ্বস্ততম রক্ষাকারী ছিলেন মুহাম্মদ (সা.)। তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী ও মনোজ্ঞ, যারা তাঁকে দেখেছেন তারা সহজেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছেন তাঁর প্রতি। যারা তাঁর কাছে এসেছেন তারা তাঁকে ভালোবেসেছেন। পরে তারা বিবরণ দিয়েছেন তাঁর মতো মহামানব আগে কখনো দেখিনি, পরেও না। মুহাম্মদ (সা.)-এর স্মৃতিশক্তি ছিল গভীর, তাঁর রসিকতা ছিল শালীন। তাঁর কল্পনা ছিল উন্নত ও মহৎ। তাঁর বিচার-বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ। জাগতিক শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেও মুহাম্মদ (সা.) নিজগৃহের কাজগুলোও করতেন। তিনি আগুন জ্বালাতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন, দুধ দোহন করতেন এবং নিজ হাতে কাপড় সেলাই করতেন। তাঁর আনীত ধর্ম বিধান সর্বলোকের জন্য প্রযোজ্য ও শতভাগ সঠিক এতে কোনো সন্দেহ নেই।’ ইংরেজ কবি জন কিটস বলেন, ‘পৃথিবীর যা কিছু মঙ্গলময়, যা কিছু মহৎ ও সুন্দর সবই মূলত নবী মুহাম্মদ। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই।’

এ ছাড়া জন ডেভেন পোর্ট, জোসেফ হেল, ডা. স্যামুয়েল জনসন, প্রফেসর গিবেন্স, জন উইলিয়াম ড্রেপার, আলফ্রেড মার্টিন মরিস গড ফ্রে, আর্থার গিলমান, ওয়াশিংটন আরভিং এডওয়ার্ড মন্টে, রেভারেন্ড ডব্লিউ স্টিফেন, রেমন্ড এলিয়ন নিকলসন; মানবেন্দ্র নাথ রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, মিসেস ইন্দিরা গান্ধীসহ অসংখ্য বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব মহানবী (সা.)-এর বিপুল প্রশংসা করেছেন। এনসাইক্লোপিডিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্বকোষেও হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সফল জীবনালেখ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে সন্নিবেশিত হয়েছে।

লেখক : অধ্যাপক, হাজী মুহম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

কালের কণ্ঠ
১৩ জুন ২০১৩, বৃহস্পতিবার

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

সমুদ্র বিজয় ও পরবর্তী পদক্ষেপ

বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যে বহু দিনের সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে প্রথম চিঠি চালাচালি শুরু হয় ১৯৭৪ সালের ১৬ এপ্রিল থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। প্রয়োজনীয় অর্থ, দক্ষ জনবল ও সঠিক প্রযুক্তির অভাবে এ কাজটি বন্ধ থাকে প্রায় ৩৫ বছর। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ফরাসি সরকারের অর্থায়নে নৌবাহিনী চট্টগ্রামে হাইড্রোগ্রাফিক ও ওশানগ্রাফি সেন্টার স্থাপন করলে সমুদ্রসীমা নির্ধারণে কাজের গতি সঞ্চারিত হয় এবং ২০০৯ সালে যথারীতি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজ পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়। স্বল্পতম সময়ে সমুদ্র জরিপের জন্য বর্তমান সরকার ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। নৌবাহিনী সততা ও দক্ষতার সঙ্গে মাত্র ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই জরিপের কাজটি শেষ করে। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে হাইড্রোগ্রাফিক জাহাজ দিয়ে বাংলাদেশকে সহায়তা করে ব্রিটেন। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বর্তমান সরকার নৌবাহিনীকে একটি আধুনিক হাইড্রোগ্রাফার অনুসন্ধান জাহাজ হস্তান্তর করলে দ্রুতগতিতে সমুদ্র জরিপের কাজ চলতে থাকে। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ২৬ আগস্ট তথ্যাদিসহ নথিপত্র জমাদানের শেষ সময় নির্ধারিত থাকলেও প্রায় ছয় মাস আগেই আবেদনটি জমা পড়ে। ২৬ আগস্ট ২০১১ তারিখের মধ্যে আবেদন জমা দিতে ব্যর্থ হলে এ অর্জন কোনো দিনই সম্ভব হতো না। আন্তর্জাতিক আদালতে আবেদনের ক্ষেত্রে, দেশের অবস্থান, সমুদ্রসৈকতের দৈর্ঘ্য, সমুদ্রের তলদেশের ভূতাত্ত্বিক অবস্থা ইত্যাদি পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ জার্মানির হামবুর্গ শহরে অবস্থিত সমুদ্র আইনের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ বাংলাদেশের পক্ষে আবেদন করা হয়। ফলে গত ১৪ মার্চ ২০১২ আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল ২০০ নটিক্যাল মাইল অর্থাৎ এক লাখ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব সীমানা এবং মহিসোপানে প্রবেশের পথসহ বাংলাদেশের পক্ষে রায় দেন। এ বিশাল অর্জন স্বাধীনতার ৪২ বছরে আর ছিনিয়ে হয়নি। এ অর্জন ধরে রাখতে প্রয়োজন দলমতের ঊর্ধ্বে থেকে সবাইকে উন্নয়নে সহযোগিতা করা। তেল, গ্যাস, মাছসহ প্রয়োজনীয় সম্পদ রক্ষা ও এর আহরণে দেশি প্রযুক্তি ব্যবহার করার লক্ষ্যে সৎ ও দক্ষ জনবল অপরিহার্য। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, কোনো খনিজ সম্পদ উত্তোলনে সিংহভাগ দিতে হয় বিদেশি কম্পানিকে। সুতরাং খনিজ সম্পদ উত্তোলনে বিদেশি নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। তবেই তেল-গ্যাসের অভাবমুক্ত হবে বাংলাদেশ। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতি ঘনকিলোমিটার সমুদ্রের পানিতে স্বর্ণ রয়েছে ৩৭ কেজি। (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারে মৎস্য বিজ্ঞানীর অভিমত) লবণ সংগৃহীত হয় বছরে তিন লাখ ৫০ হাজার টন। সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে ৪৭৫ প্রজাতির মাছের মধ্যে চিংড়ি রয়েছে ৩৬ প্রজাতির। বছরে ইলিশ মাছ আহরিত হবে প্রায় চার লাখ টন, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। অন্যান্য মাছের বাজারমূল্য এর চেয়েও অনেক বেশি। এ ছাড়া রয়েছে প্রবাল, শামুক, ঝিনুক, শৈবাল, ক্লোরিন, ক্লোরিন, আয়োডিনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পদার্থ, যা প্রাকৃতিক নিয়মেই উৎপন্ন হতে থাকবে। শুধু আহরণ,

> সমুদ্র সম্পদ দেশি প্রযুক্তিতে সৎ ও দক্ষ জনবল দ্বারা আহরিত হলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারও ভারী হবে, এটাই সবার প্রত্যাশা। সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত জলজপ্রাণী এবং খনিজ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ আচিরেই মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরিত হবে

প্রক্রিয়াজাত, সংরক্ষণ ও বিপণন করতে হবে মাত্র। সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ, প্রক্রিয়াজাত ও বিপণনের মাধ্যমে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। কারণ এর আগে ২৮টি ব্লকের মধ্যে মিয়ানমারের দাবি ছিল ১৭টি ও ভারতের ১০টি। বাংলাদেশের মধ্যে ছিল মাত্র একটি এবং অন্যটির অংশবিশেষ। আনন্দের বিষয় হলো, আন্তর্জাতিক রায়ে বাংলাদেশ পেয়েছে ১২টি ব্লক ও মিয়ানমার পাঁচটি। ১৪ ই মার্চ দিবসটি আমাদের সবার জন্যই অমর হয়ে থাকবে **'সমুদ্র বিজয় দিবস'** হিসেবে। বিশাল এ অর্জনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, যা জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে। কয়েকটি দৈনিকে প্রকাশিত তথ্যমতে, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফিক বিষয়ে দক্ষতা প্রশংসিত হয়েছে, যা বাংলাদেশে প্রকাশিত হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট ও প্রকাশনাগুলো আন্তর্জাতিক মানের হওয়ায় তা বিশ্বের অন্যান্য দেশে সমুদ্রসীমা নির্ধারণে নাবিকদের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য গর্বের ও আনন্দের। আমাদের এ অর্জন অনেক বড়, অপ্রত্যাশিত। সমুদ্র জয়ে বাংলাদেশের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে কর্মক্ষেত্র ও কর্মপরিধি। তেল-গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার ও এর উত্তোলনে প্রয়োজন দেশি-বিদেশি দক্ষ জনবল, প্রয়োজনীয় মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও মেশিনারিজ। সমুদ্র জলসীমানায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও উদ্ধারকাজে ব্যবহারের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েই এ বছর প্রথমবারের মতো আমদানি করা হলো জার্মানির তৈরি অত্যাধুনিক ডর্নিয়ার ২২৮ এনজি মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট বা সমুদ্র টহল বিমান। আরো একটি সমুদ্র টহল বিমান এ বছরই সংযুক্ত হবে বলেও আভাস পাওয়া গেছে। এ বিমানটি ট্যাংকভর্তি জ্বালানি নিয়ে ৯৫২ নটিক্যাল মাইল পথ অতিক্রম এবং একটানা ১০ ঘণ্টা উড়তে সক্ষম। হাইড্রোগ্রাফিক বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স চালুর উদ্যোগ নিচ্ছে বর্তমান সরকার। সমুদ্র সম্পদ দেশি প্রযুক্তিতে সৎ ও দক্ষ জনবল দ্বারা আহরিত হলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারও ভারী হবে, এটাই সবার প্রত্যাশা। সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত জলজপ্রাণী এবং খনিজ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ আচিরেই মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরিত হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, পাশের দেশ মিয়ানমারের সঙ্গে বহু দিনের বৈরিতার অবসান হয়েছে এবং আমাদের পাওনা সঠিক ও স্থায়ীভাবে হস্তগত হয়েছে।

লেখক : প্রফেসর, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
fhoque.hstu@gmail.com

১৪ কালের কণ্ঠ
২১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, শনিবার

ডা. মো. ফজলুল হক ▸

পদ্মা সেতু তৈরির গুরুত্ব

চুয়াল্লিশ বছর আগে ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগের একমাত্র নৌবন্দরটির নাম ছিল গোয়ালন্দ নৌবন্দর। যেখানে ঢাকার সদরঘাট থেকে সরাসরি স্টিমার-লঞ্চ যাত্রী ও মালামাল নিয়ে আসা-যাওয়া করত। নাব্যতা বৃদ্ধির কারণে স্টিমার বন্ধ হয়ে নতুনভাবে আরিচা-দৌলতদিয়া ঘাট হয়ে যাত্রীসহ বিভিন্ন যান চলাচল করতে থাকে। আরিচা থেকে বড় বড় ফেরি বাস, ট্রাক নিয়ে নগরবাড়ী ও দৌলতদিয়া পারাপার করলেও যমুনা নদীতে নতুন চর জেগে ওঠায় তা গত ১০ বছর বন্ধ রয়েছে। এক যুগ ধরে দৌলতদিয়া থেকে পাটুরিয়া হয়ে নতুন রাস্তা চালু রয়েছে। এ পথে লঞ্চ ও ফেরি পারাপারে সময় লাগে মাত্র ২০-২৫ মিনিট। এর পরও সমস্যার শেষ নেই। নাব্যতার কারণে নতুন চর জেগে ওঠায় প্রায়ই বাস ও ট্রাক নিয়ে আটকা পড়ে বড় বড় লঞ্চ ও ফেরি। নৌপথটি সচল রাখতে সারা বছরই চলে ড্রেজার দ্বারা মাটি কাটার কাজ। উইপোকার মতোই এক জায়গার বালু-মাটি কয়েক শ ফুট দূরে ফেলে নতুন ও মজবুত চর তৈরি করে নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করা হচ্ছে। লাখ লাখ লিটার পেট্রল ও ডিজেল খরচ হয় এ কাজে। প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকাও খরচ হয় এর পেছনে। অন্যদিকে জ্বালানি তৈল নিঃসরণের কারণে নদীর পানি দূষিত হচ্ছে, যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়। অন্যদিকে ইলিশসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রজনন ক্ষমতাও হ্রাস পাচ্ছে দিন দিন। দৌলতদিয়া ঘাটটি পদ্মা ও যমুনা নদীর সংযোগস্থলে হওয়ার কারণে উভয় নদীর স্রোত বিপরীত দিক থেকে ধাক্কা দেওয়ায় স্রোতের গতি মাঝ নদী দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় উভয় তীরেই পলি পড়তে থাকে। এটি একটি সাধারণ নিয়ম। ফলে ড্রেজার দিয়ে মাটি অপসারণ করলেও প্রতি বছরই ওই স্থানে পলিমাটি পড়ে নতুন চর তৈরি হয়। আমার বাড়িটি যেহেতু পদ্মা নদীর অনেকটাই কাছে সে কারণেই ভাঙাগড়ার কম-বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে কি? ভৌগোলিক অবস্থানগত প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে দেখা যায়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পদ্মা নদীর ওপর একাধিক সেতু নির্মাণ একান্ত প্রয়োজন। কয়েক দিন আগে এক টেলিভিশন টক শোতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন অনেকটা জোর দিয়েই তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করেন যে আমাদের নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু হতে কোনো সমস্যাই নেই। ব্যাংকে অলস টাকা যত কাজে খাটবে, ততই দেশের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। এ ছাড়া শেয়ার ছাড়লে দেশ-বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিরাও আগ্রহসহকারে অংশগ্রহণ করবে। ফলে পদ্মা সেতু তৈরিতে কোনো সমস্যাই হবে না। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থেই একাধিক পদ্মা সেতুর প্রয়োজন রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের নির্বাহী পরিচালক মুকেশ এন প্রসাদ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছেন, সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণদাতা সংস্থাটি তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করছে।

বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের নির্বাহী পরিচালক মুকেশ এন প্রসাদ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছেন, সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণদাতা সংস্থাটি তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করছে।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ সেতুটির গুরুত্ব অনেক বেশি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারত, পাকিস্তান, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ হয়ে মিয়ানমার ও চীনের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এটি গুরুত্ব বহন করবে। যাতায়াত ছাড়াও উভয় তীরে গড়ে উঠতে পারে পর্যটন শিল্পনগরী, যেখানে আগমন ঘটবে দেশি-বিদেশি পর্যটকের। অন্যদিকে নদী শাসনের কারণে পদ্মা নদীর ভাঙন হ্রাস পাবে অনেকাংশে। ট্রেন লাইনসহ বহুমুখী পদ্মা সেতু দেশের উন্নয়ন, যানজট সমস্যা ও যাত্রী ভোগান্তি নিরসন ও জ্বালানি তেলের অপচয় রোধকল্পেই বিশেষভাবে গুরুত্ব বহন করে। যেহেতু চট্টগ্রাম ও খুলনা সমুদ্রবন্দরের যোগাযোগের সহজ ও সংক্ষিপ্ত দূরত্ব তৈরির ক্ষেত্রেও গুরুত্ব বহন করবে পদ্মা সেতুটি। বিভিন্ন দৈনিকের তথ্যমতে, এ সেতুটি ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ডিপিপিতে (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) নির্মাণ ব্যয় ধরা ছিল ১০ হাজার ১৬১ কোটি ৭৫ লাখ ১০ হাজার টাকা। ২০১১ সালে অর্থাৎ চার বছরের ব্যবধানে একই নির্মাণকাজের জন্য ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ হাজার ৫০৭ কোটি ২০ লাখ ১৬ হাজার টাকা। ফলে অতিরিক্ত ব্যয় বেড়েছে প্রায় ১০ হাজার ৩৬৪ কোটি ৫৫ লাখ ছয় হাজার টাকা। ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এ সেতুটি যত তাড়াতাড়ি নির্মাণকাজ আরম্ভ ও শেষ হবে, ততই আমাদের জন্য মঙ্গল। পরবর্তী সরকারের আন্তরিকতার ওপর নির্ভর করছে সেতুটির ভবিষ্যৎ। মূলকথা হলো, এ সেতুটি না হওয়ায় কষ্টের ঘানি টানতে হচ্ছে এ দেশের সব শ্রেণীর মানুষকে বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লোকদের অনেক সময় খুলনা ও বরিশাল বিভাগের এবং ফরিদপুর জেলার গাড়িগুলো বিপদে পড়েই ভেড়ামারার লালন শাহ ব্রিজ হয়ে যাতায়াতের কারণে দুই থেকে আড়াই গুণ জ্বালানি তেলের অপচয় ও যাত্রীদুর্ভোগ পোহাতে হয়। আরিচা হয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও ফেরি পারাপারে দুই-তিন গুণ সময় বেশি লাগে। এই হিসাবে, বছরে প্রায় শত শত কোটি টাকার জ্বালানি তেলের পেছনেই পরিবহন খাতে লোকসান হয়ে থাকে। সুতরাং ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে পদ্মা সেতুর গুরুত্ব নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বিগত ৪২ বছরে নৌকা ও লঞ্চডুবিতে প্রায় লক্ষাধিক লোক মারা গেছে সেতু না থাকার কারণে। অন্যদিকে এ অঞ্চলের মানুষ প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় সম্পদের প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত, যেমনটি ছিল যমুনা নদীর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর অবস্থা। বঙ্গবন্ধু সেতুর কারণে আজ গ্যাস পৌঁছে গেছে বগুড়া, রাজশাহীসহ বিভিন্ন জেলায়। কমছে যাত্রীদুর্ভোগ ও যানযটের মাত্রা। দক্ষিণাঞ্চল গ্যাসসমৃদ্ধ জেলাগুলোর অনেক কাছাকাছি অবস্থান করেও এ ধরনের বড় প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত বহুমুখী সেতুর অভাবে। এ দেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠী ঐকমত্য এ সেতু তৈরির প্রশ্নে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সহজভাবে যাতায়াতের সুবিধার্থে ও যানজট নিরসনে দৌলতদিয়া, চরভদ্রাসন ও শরীয়তপুরের সুবিধাজনক এলাকা দিয়ে পদ্মা, মেঘনা নদীতে আরো তিনটি সেতু প্রয়োজন রয়েছে, যার দাবি এরই মধ্যে তুলেছিল ওই অঞ্চলের জনগণ। প্রয়োজন দল-মত-নির্বিশেষে সবারই সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা। তাই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একত্রে কাজ করলে শুধু পদ্মা সেতুই নয়, আরো অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে এ দেশে—এটিই বাস্তব সত্য।

লেখক : অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
fhoque.hstu@gmail.com

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার

জনমনে ধারণা বিদ্যমান যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকরাই বুদ্ধিজীবী। কারণ তাঁরাই বিশ্বের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষাগুরু। তাঁদের মেধা ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনায় একটি জাতি তথা দেশ তথ্যপ্রযুক্তিতে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে সক্ষম। তেমনি তাঁদের পরিকল্পনায় কোনো ত্রুটি হলে দেশ বা জাতির জন্য বয়ে আনবে অপরিমিত দুঃখ-দুর্দশা। প্রাণিসম্পদ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত এবং জিডিপিতে এর অবদান প্রায় ৬ শতাংশ। তা ছাড়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল প্রায় ৭০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১১ কোটি মানুষ। সদাশয় সরকার এ সেক্টরের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হলেও আশানুরূপ লক্ষ্য পূরণে সফল হয়নি। এর মূল কারণ হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ ভেটেরিনারি সায়েন্স অনুষদ ভেঙে দুটি অনুষদের জন্ম, যা প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধক। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে একই অধিদপ্তরে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত ভেটেরিনারি এবং পশুপালন (অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি) গ্র্যাজুয়েটরা একে অপরের চির প্রতিপক্ষ, যা প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে বাধার মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০ বছর ধরে। উল্লেখ্য, ভেটেরিনারি অনুষদ থেকে ডিভিএম (ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন) ডিগ্রিধারীরা রোগের চিকিৎসা, রোগ দমন, গবেষণা, বাসস্থান ব্যবস্থাপনা এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কিন্তু পশুপালন গ্রাজুয়েটদের ক্ষেত্রে এই সুযোগ না থাকায় একজন কৃষক বা প্রাণী পালনকারী কৃষক বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বিএসসি (এএইচ) নামকরণের ডিগ্রিটি প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের মানদণ্ডে অকার্যকর বিধায় ১৯৫৮ সালে বিশ্বের সব ভেটেরিনারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে চিরতরে বন্ধ করার সুপারিশ করা হলেও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) এখনো বন্ধ করা হয়নি। ভেটেরিনারি অনুষদটির বয়স এক বছর পার হতে না হতেই ১৯৬২ সালে ভেটেরিনারি সায়েন্সের ২০-২৫ শতাংশ প্রাণী উৎপাদনবিষয়ক এবং অবশিষ্ট ৬৮-৭০ শতাংশ প্রাণী চিকিৎসাবিষয়ক কোর্স কারিকুলাম ও সিলেবাস নিয়ে ভেটেরিনারি সায়েন্স অনুষদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, একটি ভেটেরিনারি পেশায় দুটি ডিগ্রি (ডিভিএম, বিএসসিএএইচ) প্রদানের ব্যাপারে ভেটেরিনারিয়ানরা দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ দুজন ভেটেরিনারিয়ান প্রশাসনিক ক্ষমতার আকর্ষণে ভেটেরিনারি শিক্ষাব্যবস্থাকে বিভাজিত করে দুটি অনুষদের জন্ম দেন এবং দুজনেই ডিন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। একটি ভেটেরিনারি পেশার শিক্ষা, গবেষণা, প্রশাসন ও মাঠপর্যায়ের কর্মক্ষেত্রে দুটি প্রতিপক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে শুধু দ্বন্দ্বই সৃষ্টি করা হয়নি; সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, গবেষণা ও কর্মক্ষেত্রকে কলুষিত করে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ভেটেরিনারি পেশাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে দুটি অনুষদ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। মেডিক্যাল এবং ভেটেরিনারি পেশার মূল বিষয়টি দিয়ে উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার করা যায়। যেমন—মানুষের যে ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করেন, সেই ডাক্তারই ওই রোগীর খাদ্য সম্বন্ধে বলে দেন। আবার যে ডাক্তার পরিবার পরিকল্পনায় নিয়োজিত, তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসহ চিকিৎসা ও খাদ্যব্যবস্থাসহ প্রেসক্রিপশন দিয়ে থাকেন। বিশ্বের সব দেশে ভেটেরিনারি মেডিক্যাল ডাক্তাররাই একইভাবে কার্য সম্পাদন করে থাকেন। অর্থাৎ ভেটেরিনারি ডাক্তাররাই প্রাণীর উৎপাদন এবং স্বাস্থ্যের ওপর কাজ করেন। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম একমাত্র বাংলাদেশে। কারণ পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই একটি ভেটেরিনারি বা প্রাণিসম্পদ পেশায় দুই ধরনের গ্র্যাজুয়েট তৈরি করা হয়। বাকৃবি ছাড়া অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি নামে বিশ্বের অন্য কোথাও কোনো অনুষদ নেই বা স্নাতক পর্যায়ে এ বিষয়ের ওপর কোনো ডিগ্রিও দেওয়া হয় না। তবে বিভিন্ন দেশে ভেটেরিনারি সায়েন্স অনুষদের আওতায় একটি বিষয় হিসেবে অ্যানিম্যাল সায়েন্স পড়ানো হয়। অন্যদিকে মাস্টার্স ও পিএইচডিতে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে অ্যানিম্যাল সায়েন্সের ওপর বিশেষ ডিগ্রির ব্যবস্থা রয়েছে।

ভেটেরিনারি সায়েন্স আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পেশা, যাতে পশুপাখি ও বন্য প্রাণীর রোগের চিকিৎসা, রোগের প্রতিরোধ এবং বাসস্থান নির্বাচনসহ উৎপাদন বিষয়ে বিস্তারিত কোর্স কারিকুলাম ও সিলেবাস পড়ানো হয় এবং বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হয়ে প্রাণীর চিকিৎসাসহ যাবতীয় কাজের অনুমতি নিয়েই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয়। বাংলাদেশ সরকার পশুসম্পদ অধিদপ্তরের প্রশাসন ও মাঠপর্যায়ে দুই ধরনের গ্র্যাজুয়েট নিয়োগ ও কর্মক্ষেত্রে জটিলতার কারণে বাকৃবির প্রশাসনকে পরপর দুবার ভেটেরিনারি সায়েন্স এবং এএইচ অনুষদ দুটিকে একত্রিত করে আগের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি প্রদানের জন্য বাকৃবিকে দুটি অফিস স্মারক পাঠিয়েও ব্যর্থ হয়। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত তৎকালীন পাকিস্তানের একজন প্রথিতযশা প্রাণিসম্পদ বিজ্ঞানী বলেন, একটি দেশে দুটি অনুষদ অযৌক্তিক। এ সমস্যাগুলো দূরীকরণের জন্য বিগত সরকার আমলেও চেষ্টা চালানো হয়, যেমন—১৯৬৯ সালে শিক্ষা সম্পর্কিত মূল্যায়ন কমিটি, ১৯৭৪ সালে তৎকালীন মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী, ১৯৭৬ সালে পশুসম্পদ অধিদপ্তরের তৎকালীন পরিচালক ড. আলাউদ্দিন আহম্মেদ, ১৯৭৭ সালে সিএমএলএ, ১৯৮২ সালে রিগেডিয়ার এনাম কমিটি, ১৯৯৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ ভেটেরিনারি অ্যাসোসিয়েশনসহ বিগত সব সরকারই এএইচ অনুষদটি অকার্যকর বিধায় বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক বলেন, বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ভেটেরিনারি মেডিসিন নামেই কোর্স রয়েছে। তা ছাড়া জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, এডিবি, বিশ্বব্যাংক, প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যুরি কমিশন প্রাণিসম্পদ শিক্ষায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ভেটেরিনারি কোর্স নামে দেশে একটি মাত্র কোর্স রেখে অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অনুষদ (বাকৃবি) বন্ধের সুপারিশ করে; কিন্তু অদ্যাবধি তা কার্যকর হয়নি।

প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৬, ১৯৯৭, ২০০২ ও ২০০৩ সালে দেশে চারটি সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ (চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল ও দিনাজপুর) প্রকল্প গ্রহণ করে। বর্তমানে ঝিনাইদহেও একটি সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য, পূর্ণাঙ্গ কোর্স কারিকুলাম ও সিলেবাসসহ ডিভিএম ডিগ্রি প্রদানের মাধ্যমে জনসাধারণকে সেবা দেওয়া। কলেজগুলোর প্রকল্প মেয়াদ শেষে স্বতন্ত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষদ হিসেবে অন্তর্ভুক্তির আগেই বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের জন্য একটি সার্চ কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটিতে বাকৃবির অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অনুষদের আওয়ামী লীগ সমর্থিত একজন সম্মানিত সদস্য থাকায় তাঁর অনুষদের দুজন গ্র্যাজুয়েটকে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগের সুযোগ করে দেন। তাঁদের প্রথম দায়িত্বই ছিল অনুষদের নাম ভেটেরিনারি মেডিসিন পরিবর্তন করে ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্স অথবা অ্যানিম্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন নামে অনুষদের নামকরণ করা। এটি একটি ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ, যা অতীতের সেই ভুল সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি। উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সাহেব একজন অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি গ্র্যাজুয়েট হওয়ায় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অর্গানোগ্রাম তৈরি করে এএইচ গ্র্যাজুয়েটদের অপ্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করে দেশের জনসাধারণের কতটা স্বার্থ সংরক্ষিত হবে, তা খতিয়ে দেখা দরকার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিএলআরআইয়ের অর্গানোগ্রামে মোট ১৭টি বিভাগের মধ্যে একটি ভেটেরিনারি গ্রাজুয়েটদের জন্য, অবশিষ্ট ১৬টি বিভাগে এএইচ ডিগ্রিধারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে গবেষণার নামে অনিয়ম ও দুর্নীতি চলছে। বিএলআরআই-এ গবেষণার নামে অর্থের অপচয় হচ্ছে বলে বিশেষ মহল মনে করছে। অন্যদিকে স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও আমরা এ সেক্টরে আশানুরূপ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ, এর একটি কারণ—কিছু লোকের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকে গতিশীল করতে এ মুহূর্তেই বাকৃবির এএইচ অনুষদটি বন্ধ করে ভেটেরিনারি সায়েন্স অনুষদের সঙ্গে পুনরেকত্রীকরণ করা এবং প্রতিটি উপজেলায় চারটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে দুটি ভেটেরিনারি সার্জনসহ প্রয়োজনীয় পদ জরুরি ভিত্তিতে সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান, মেডিসিন, সার্জারি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

ডা. মো. ফজলুল হক

জ্বালানো-পোড়ানোর রাজনীতি আর কতদিন?

সংসার কি সরকার দেখবে, না বিরোধী দল দেখবে? কেউ দেখবে না। আমার পেটের ভাত আমাকেই সংগ্রহ করতে হবে। আমি (চালক) কারও কথা শুনব না। গাড়ি পুড়লে মালিকের যাবে। তবে যারা মানুষ পোড়ায় তারা পশুর চেয়েও অধম।' শান্তিপূর্ণ হরতাল গণতন্ত্রের ভিত শক্ত করে। সহিংস হরতাল জঙ্গিবাদকে উসকে দেয়; অর্থনীতিকে ধ্বংস করে। মানুষ হত্যা দ্বারা জনসমর্থন হ্রাস পায় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের। তবে রাজনীতিকদের বিষয়টি ভিন্ন, কারণ তাদের অনেকের সন্তান বিদেশে লেখাপড়া করে। আগুনের ছোঁয়া তাদের গায়ে লাগে না। এরই মধ্যে বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর বাংলাদেশের ধ্বংসাত্মক হরতালের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। তারা আরও বলেছেন, গণতান্ত্রিক ও উদীয়মান বাংলাদেশে হরতাল-অবরোধের নামে এ ধরনের অপকর্মের ন্যূনতম যৌক্তিকতা নেই। এছাড়াও মানুষ হত্যার বিভীষিকাময় ঘটনায় বিভিন্ন শক্তিধর রাষ্ট্র, এমনকি জাতিসংঘও উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

মানুষ হত্যার কৌশল দ্বারা গণতন্ত্র রক্ষা বা সুসংহত করা যায় না। রাজনীতির মূল শক্তিই হচ্ছে জনগণ। জনগণের জীবনের নিরাপত্তা বিধান ও রাষ্ট্রের সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব সরকারের। মানুষ হত্যার যে আন্দোলন চলছে, তা রাজনৈতিক আন্দোলন নয়; জঙ্গি আন্দোলন, যা কোনো দিন দেশ ও জাতির জন্য ধ্বংস ছাড়া কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। আমাদের দেশের রাজনীতিতে ক্ষমতার মোহই মুখ্য বিষয়। স্বচ্ছ নির্বাচন হলেও হেরে যাওয়া বিরোধী দল কোনোভাবেই তা মেনে নিতে পারে না। সে কারণে কোনো ঘটনায় একটি সন্তান বা পরিবারের কর্মক্ষম লোকটির অকাল মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নেয়া সম্ভব নয়। সূরা বাকারার ১১নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'তোমরা জমিনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না।' রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও জন্য আগুন দিয়ে কাউকে শাস্তি প্রদান করা অবৈধ (আবু দাউদ, হাদিস নং ২৬৭৫)। বিষধর সাপসহ অন্য কোনো হিংস্র প্রাণীকেও অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। অগ্নিদগ্ধসহ বিভিন্ন কারণে প্রতিদিন ৪ থেকে ৫ জনের মৃত্যুর খবর আসছে, আহত হচ্ছে কমবেশি ৫০ থেকে ৬০ জন।

জনগণের একটাই আবেদন, মানুষ পোড়ানোর হরতাল-অবরোধ বন্ধ হোক চিরতরে। মানুষ নিরাপদে বাঁচার অধিকার চায়। সরকারকে শক্ত হাতে সহিংসতা দমন করতে হবে। অপরাধীদের দায় এড়িয়ে যাওয়ার পথ নেই। দায় নিয়েই বা কী হবে, কেউ কি পারবেন মায়ের কোলে তার শিশুকে ফিরিয়ে দিতে? পারবেন কি স্বামীহারা বিধবার দুঃখ ও অভাবের সংসার চালানোর দায়িত্ব নিতে? কোনো দিনই সম্ভব নয়। সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাসের মদদদাতাদের খুঁজে বের করার এখনই উপযুক্ত সময়। সন্ত্রাসীরা দলমত নির্বিশেষে সব শান্তিপ্রিয় মানুষের শত্রু। সুতরাং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি সবাইকে স্বউদ্যোগেই সহযোগিতা করতে হবে। অন্যথায় অপরাধপ্রবণতা বেড়েই চলবে।

ডা. মো. ফজলুল হক : অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

মরণব্যাধি জলাতঙ্ক

বিশ্বব্যাপী একটি ভয়াবহ রোগের নাম জলাতঙ্ক। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসেই এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি, তবে বারো মাসই এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। এ রোগের কথা মনে পড়লেই গা শিউরে ওঠে। কারণ এ রোগের উপসর্গ প্রকাশ পাওয়ার অর্থই হচ্ছে মৃত্যু। তবে সঠিক সময়ে প্রতিষেধক (টিকা) প্রয়োগে মৃত্যুর ছোবল থেকে রক্ষা পাওয়াও সম্ভব। উল্লেখ্য, ১৮৮৫ সালে বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর সর্বপ্রথম টিকা আবিষ্কার করেন। কিন্তু আজও নিরাময়ের জন্য কোনো ওষুধ আবিষ্কার করতে কেউই সক্ষম হননি। বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ৬৬টি জুনোটিক (যে রোগ পশু থেকে মানুষে এবং মানুষ থেকে পশুতে সংক্রমিত হয়) রোগের মধ্যে জলাতঙ্ক সবচেয়ে মারাত্মক। লাইসা নামক ভাইরাস এ রোগের কারণ। ৯০-৯৫ শতাংশ জলাতঙ্ক রোগের প্রধান বাহক বেওয়ারিশ কুকুর। তা ছাড়া শিয়াল, বিড়াল, বেজি, বানর ও বাদুড়ের কামড়, আঁচড় বা লালার সংস্পর্শে এ ভাইরাস মানুষসহ যেকোনো সুস্থ প্রাণীর দেহে প্রবেশ করতে পারে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জলাতঙ্ক রোগের প্রকোপ বেশি। বর্তমানে জলাতঙ্ক রোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ স্থানে রয়েছে। যে এলাকায় বেওয়ারিশ কুকুরের সংখ্যা বেশি, সেখানেই জলাতঙ্ক রোগের প্রকোপ তুলনামূলক বেশি। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল যেমন—বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলে কুকুরের সংখ্যা বেশি হওয়ায় ওই অঞ্চলে জলাতঙ্কে আক্রান্ত প্রাণীর সংখ্যাও বেশি।

বর্তমানে উন্নয়নশীল বিশ্বের ৮০টি দেশের প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ কুকুর থেকে সংক্রমিত জলাতঙ্ক রোগের ঝুঁকিতে রয়েছে। আমাদের জানা প্রয়োজন, সঠিক সময়ে প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগে যেমন ১০০ শতাংশ সুস্থ হওয়া সম্ভব, তেমনি টিকা প্রয়োগ না করলে শতভাগ প্রাণীর মৃত্যু অবধারিত। সুতরাং জলাতঙ্ক সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন হতে হবে। পাগলা কুকুরের কামড়ে লালার মাধ্যমে ক্ষতস্থান দিয়ে জলাতঙ্কের ভাইরাস শরীরে প্রবেশের পর বিপুল হারে সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং ওই স্থানে বিদ্যমান স্নায়ুতন্ত্রের শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে (মস্তিষ্কে) প্রবেশ করে। সেখান থেকে লালাগ্রন্থি ও নাকের কোষকে আক্রমণ করে। দুই ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

প্রথমত, খাওয়া বন্ধ, মুখ দিয়ে লালা নির্গত হওয়া, পাগলামি করা, শিং দিয়ে মারতে আসা, ভাঙা স্বরে ডাকাডাকি করা, ঘন ঘন প্রস্রাবের চেষ্টা করা, কান খাড়া করে সতর্ক ভাব দেখানো, চোখ লাল ও বড় আকার ধারণ করা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, আক্রান্ত প্রাণীটির খাওয়া বন্ধ, শান্ত ও ঝিমানি এবং মুখ দিয়ে লালা নির্গত হওয়া, মুখের সামনের যেকোনো বস্তু খাওয়ার চেষ্টা করা এবং পাঁচ-ছয় দিন পর পশুটি মাটিতে লুটিয়ে পড়বে ও উভয় ক্ষেত্রে আক্রান্ত প্রাণীটি উপসর্গ প্রকাশ পাওয়ার ৮-১০ দিনের মধ্যে মারা যাবে।

বিশ্বে প্রতি ১০ মিনিটে একজন মানুষ জলাতঙ্কে মারা যায় অর্থাৎ বছরে গড়ে প্রায় ৫৫-৬০ হাজার। আর প্রাণী মৃত্যুর সঠিক হিসাব কে রাখে? অবশ্যই মানুষের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। একটি পাগলা কুকুর গড়ে প্রায় ৮-১০টি গবাদিপশুকে কামড়ানোর ঘটনাও রয়েছে। জলাতঙ্কে প্রতিবছর বাংলাদেশে কতটি গবাদিপশু মারা যায় তার সঠিক হিসাব না থাকলেও প্রায় ৫০ হাজার গবাদিপশুর মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। উল্লেখ্য, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর ক্যাম্পাসে অবস্থিত একটি মিনি ফার্মে পাগলা কুকুরের কামড়ে (কর্তৃপক্ষের অজান্তে) একটি গরু, একটি মহিষ ও একটি ঘোড়া জলাতঙ্ক রোগে মারা যায় এবং চারজন মানুষকে কামড়ায়। তিনজন টিকা গ্রহণ করায় বেঁচে যান। অন্যজন টিকা গ্রহণ না করে টোটকা চিকিৎসা নেওয়ায় মারা যান। এখান থেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত—টিকা গ্রহণ ১০০ ভাগ নিরাপদ এবং টিকা গ্রহণ না করা ১০০ ভাগ মৃত্যু অবধারিত।

বিশ্বের অনেক দেশই নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ ও বেওয়ারিশ কুকুর নিধনের মাধ্যমে জলাতঙ্ক নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী লিবিয়া, কংগো, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, হংকং, বাহরাইন, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, ফিজি, নিউজিল্যান্ড, উরুগুয়ে, জামাইকা, মাল্টা, গ্রিস, আয়ারল্যান্ড, সুইডেন ও যুক্তরাজ্যসহ আরো অনেক দেশ জলাতঙ্ক নির্মূলে সক্ষম হয়েছে। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০০৬-এর রিপোর্ট অনুযায়ী এশিয়া মহাদেশের মধ্যে জাপান ও মালয়েশিয়া সম্পূর্ণরূপে এবং ইন্দোনেশিয়ার বেশির ভাগ স্থানই জলাতঙ্ক রোগ দমনে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের সিটি করপোরেশনগুলোয় জলাতঙ্ক সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য বেওয়ারিশ কুকুর নিধন বা মেরে ফেলার বিধান রয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ঢাকা সিটি করপোরেশনে প্রতিবছর গড়ে ২০ হাজার বেওয়ারিশ কুকুর মারা হয়। তবে গৃহপালিত কুকুর-বিড়ালকে নিয়মিত টিকা যেমন—লেপ, রেবিসিন, পেন্টাডক, হেক্সাডক নামক প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। আমাদের মূল বাধা সচেতনতার অভাব। গ্রাম এলাকার গবাদিপশু ও মানুষ এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে শিশুর সংখ্যাই বেশি—প্রায় ৪৫ শতাংশ। জলাতঙ্ক রোগ নির্মূলের উত্তম পন্থা হচ্ছে বেওয়ারিশ কুকুর নিধন ও গৃহপালিত সুস্থ কুকুরকে নিয়মিত প্রতিষেধক প্রয়োগ।

জীবন-বিধ্বংসী এ রোগ থেকে রক্ষা পেতে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন যেমন;

১. কুকুর, বিড়াল, বানর, শিয়াল, বাদুড় ইত্যাদি কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থানটি সাবান-পানি দ্বারা ধৌত করুন এবং দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় টিকা দিন। টিকা প্রয়োগে যত বিলম্ব হবে, মৃত্যুঝুঁকি ততই বাড়বে।

২. পাগলা কুকুরে কামড়ানো কোনো ব্যক্তি বা কোনো গবাদিপশুকে ঝাড়ফুঁক, পানিপড়া, গুড়পড়া বা টোটকা চিকিৎসা দিয়ে কোনো লাভ হবে না। এগুলো কুসংস্কার এবং অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩. ক্ষতস্থানটি মাথার যত কাছে হবে, বিপদ তত তাড়াতাড়ি আসবে। কারণ ভাইরাসগুলো স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়। সুতরাং কালক্ষেপণ না করে তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে প্রতিষেধক টিকা দিন।

৪. ক্ষতস্থানে কোনো ক্রমেই এসিড বা গরম পানি ব্যবহার করা যাবে না।

৫. গৃহপালিত কুকুর-বিড়ালকে নিয়মিত জলাতঙ্ক ভ্যাকসিন দিন ও কৃমির ওষুধ খাওয়ান। কারণ এরা কৃমিসহ আরো কয়েকটি মারাত্মক রোগের বাহক।

৬. কুকুরে কামড়ানো গবাদিপশুকে প্রতিষেধক না দিয়ে বাজারে বিক্রি করা বা জবাই করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এবং অমানবিক কাজ। সুতরাং এ কাজ থেকে সবারই বিরত থাকা উচিত।

৭. গবাদিপশু ক্রয়ের সময় লক্ষ রাখতে হবে শরীরের কোথাও কোনো কামড়ের দাগ আছে কি না? এ ক্ষেত্রে অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে গবাদিপশু ক্রয়ের সময় বেশি সাবধান থাকতে হবে।

৮. হঠাৎ খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার পাশাপাশি মুখ দিয়ে লালা নির্গত হলে কোনো ক্রমেই মুখে হাত দেবেন না, কারণ জলাতঙ্ক রোগের ক্ষেত্রে ক্ষতের মাধ্যমে আপনিও এ রোগে আক্রান্ত হতে পারেন।

৯. জলাতঙ্কে আক্রান্ত প্রাণীর দুধ খাওয়া যাবে না, কারণ ভাইরাস দুধের মাধ্যমেও সংক্রমিত হতে পারে।

১০. প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে জলাতঙ্কের ভয়াবহতা ও প্রতিরোধের বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণ একান্ত প্রয়োজন।

১১. পেন্টাডক, হেক্সাডক, রেবিসিন ইত্যাদি ভ্যাকসিন কুকুরের জন্য বিদেশ থেকে আমদানি করা অনেক ব্যয়বহুল। সুতরাং আমাদের দেশে স্থানীয়ভাবে তৈরি করলে খরচ অনেক কম হবে। এতে জনসাধারণ তা সহজেই সংগ্রহ করতে পারবে।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্তধারা

মো. ফজলুল হক ▶

ধূমপানজনিত ক্যান্সার রোধে সচেতনতাই একমাত্র পথ

আদিকাল থেকে হুঁকো ও বাঁশের চোঙার মাধ্যমে ধূমপানের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে বিড়ি ও সিগারেট হিসেবে এর প্রচলন রয়েছে। পানের সঙ্গে জর্দা খাওয়া আরো মারাত্মক, যা সরাসরি লিভার, ফুসফুস ও কিডনিকে আক্রান্ত করে। জর্দা বা তামাকের পাতা সেবনের অর্থ হচ্ছে—ভেজালমুক্ত বিষপান। বাংলাদেশে মোট জিডিপির ১ শতাংশ খরচ হয় ধূমপানের পেছনে। বর্তমানে বিশ্বে প্রতিবছর ২০ লাখের অধিক লোক মারা যায় ধূমপানজনিত ক্যান্সারে। এর মধ্যে বাংলাদেশে মারা যায় বছরে ৫৭ হাজার। এক গবেষণায় জানা যায়, ধূমপান বন্ধ হলে বছরে ৯ হাজার কোটি টাকা লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পাবে বাংলাদেশ। অন্যদিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধূমপানজনিত ক্যান্সারের হাত থেকে রেহাই পাবে। উল্লেখ্য, বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে পরিমাণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তার ১২ গুণ বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ধূমপানের কারণে। Financial Express Report (FER) ২০০৬ অনুযায়ী ২০৩০ সালে বিশ্বে এক কোটি লোক ধূমপানজনিত রোগে মারা যাবে। আর ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে লিটলবয় এবং ফ্যাটম্যান নামের অ্যাটম বোমায় মারা যায় প্রায় দুই লাখ ১০ হাজার লোক (১৯৭৬ সালের তথ্য মতে)। আমাদের দেশে গরিব, অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত লোকের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা তুলনামূলক বেশি। বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, একজন ছাত্র যতক্ষণ মা-বাবার দৃষ্টির আওতায় থাকে, ততক্ষণ ভালোই থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে ভর্তি হওয়ার পর হাতছাড়া হয়ে যায় নজরদারির বিষয়টি। ওই সময় ব্যক্তিস্বাধীনতার সুযোগে অনেক ধূমপায়ী বন্ধুর আড্ডায় জড়িয়ে পড়ে। সাধারণত ১৪ থেকে ২০ বছর বয়সে বেশির ভাগ যুবক যেকোনো উপায়ে ধূমপানে আসক্ত হতে পারে—এ বয়সটাই মারাত্মক। এ বয়সটা ধূমপানমুক্ত অবস্থায় অতিক্রম করতে পারলে বাকি জীবন মুক্ত থাকা সম্ভব। বর্তমানে সমাজের মধ্যে সচেতন নাগরিকরা ধূমপায়ীদের এড়িয়ে চলেন। এমনকি পাত্র খুঁজতে গিয়েও কনের পক্ষ বলে, বরের কোনো খারাপ অভ্যাস আছে কি না? অর্থাৎ ধূমপান করে কি না? কারণ যার ধূমপানের অভ্যাস থাকে, তার অন্য অভ্যাসও থাকতে পারে—এটাই অনেকের ধারণা। বর্তমানে বাংলাদেশে ১০টি জেলায় ১১৭টি বিড়ি ফ্যাক্টরি রয়েছে। সেখান থেকে প্রতিবছর প্রায় ১০ হাজার ৮০০ কোটি বিড়ি উৎপাদিত হয়। প্রতিটি ফ্যাক্টরির চারপাশে অর্ধকিলোমিটার থেকে এক কিলোমিটার পর্যন্ত তামাকের গুঁড়ো বাতাসের মাধ্যমে বাহিত হয়ে এলাকার লোকজনের ক্ষতি করে, যা অনেকের ধারণারও বাইরে। বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৯০ শতাংশ। তাদের সঙ্গে চার-পাঁচ বছরের ছেলেমেয়েরাও ফ্যাক্টরির মধ্যে ঘোরাফেরা করে, যেটি ফুসফুস ক্যান্সারের বড় কারণ। বিড়ি শ্রমিকের প্রায় শত ভাগই শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে আলাপ করায় তাঁরা বলেন, 'আমরা জানি আমাদের পরিণতি ভালো নয়। পেটের দায়ে কাজ করি। তবে এলাকায় যদি গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি বা অন্য কিছু হতো, সেখানে কাজ করতাম।' পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হলেও এ আইনের পুরোপুরি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। উল্লেখ্য, আইনি কাঠামো যতই কঠিন হোক না কেন, বাস্তবায়িত না হলে তাতে কোনো লাভ হয় না। ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, বর্তমান বিশ্বে দৈনিক ১৫০ কোটি পিস সিগারেট বিক্রি হয়ে থাকে এবং ধূমপায়ীদের প্রতি ১০ জনে একজন (১০ শতাংশ) মৃত্যুবরণ করে ক্যান্সারে। অনুন্নত দেশে ধূমপায়ীর সংখ্যা ৩.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয় হচ্ছে, সিনেমা-নাটকে সিগারেট বিষয়ক অভিনয়ের দৃশ্য দুঃখজনক, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধূমপানের বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণের অনুরূপ। সিনেমা বা টেলিভিশনে এ ধরনের দৃশ্য যুবসমাজকে উৎসাহী করছে, যা বন্ধ রাখা একান্ত প্রয়োজন। আমেরিকায় প্রতি পাঁচজনে একজন মারা যায় ধূমপানজনিত কারণে। কম্বোডিয়া, চীন, জাপান ও মালয়েশিয়ায় একইভাবে ধূমপায়ীদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ ফুসফুস ক্যান্সারের ঝুঁকি বহন করছে। সুতরাং ধূমপানে বিষ পান—এটিই সত্য। ধর্মীয় আঙ্গিকেও ধূমপান নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে জনসচেতনতার পাশাপাশি দেশে তামাক চাষ বন্ধ করা অত্যাবশ্যক। তামাক চাষে জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়। ওই জমিতে ধানসহ অর্থকরী ফসলের আবাদে সবাইকে উৎসাহী করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারকে ওই সব এলাকায় কৃষকদের ভর্তুকিসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। দেশের বিড়ি ফ্যাক্টরির মালিকদের দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ প্রাধান্য দিয়ে ফ্যাক্টরি বন্ধ করে ওই শ্রমিকদের নতুনভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন ও মানবিক দাবি। দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা ওইসব এলাকায় বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কলকারখানা স্থাপন করে কর্মচারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। এটি সবার নৈতিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশেই বিড়ি-সিগারেটের দাম অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় ধূমপায়ীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে উচ্চ হারে করারোপ একান্ত প্রয়োজন। অনেক সময় সিগারেটের টাকা সংগ্রহ করতে ছিনতাই, মা-বাবাকে ছুরিকাঘাত করার মতো ন্যক্কারজনক ঘটনাও ঘটেছে, খাঁ মাঝেমধ্যে পত্রিকার পাতায় প্রকাশ পায়। সব শেষে বলতে হয়, সিগারেটের গায়ে লেখা আছে, 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর'—এ ধরনের সতর্কবাণীই যথেষ্ট নয়। আসুন, দলমত-নির্বিশেষে সবাই মিলে এটিকে না বলি, ঘৃণার চোখে দেখি, ফুসফুস ক্যান্সারের হাত থেকে নিজে বাঁচি, অন্যকে বাঁচতে সহযোগিতা করি।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

ক্ষুরা রোগঃ লক্ষণ ও প্রতিকার

প্রফেসর ডা. মোঃ ফজলুল হক

প্রাণিতে অত্যন্ত ছোঁয়াচে তীব্র প্রকৃতির ভাইরাসজনিত রোগের মধ্যে ক্ষুরারোগ অন্যতম। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হরিণ ও হাতিসহ বিভক্তি ক্ষুরা বিশিষ্ট প্রাণিতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যাধিক। ৬ মাস বয়সের নীচের বাচ্চায় এ রোগটি মড়ক আকারে দেখা যায়। এছাড়া মহিষে এ রোগের তীব্রতা তুলনামূলক কিছুটা কম। বাংলাদেশের সব ঋতুতেই ক্ষুরারোগ দেখা গেলেও সাধারণত বর্ষার শেষে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী পরিলক্ষিত হয়।

লক্ষণঃ শরীরের তাপমত্রা বেড়ে যায়; জিহ্বা, দাঁতের মাড়ি, সম্পূর্ণ মুখ গহ্বর, পায়ের ক্ষুরের মাঝে ঘা বা ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ক্ষত সৃষ্টির ফলে মুখ থেকে ফেনাযুক্ত লালা নির্গত হয়। কখনোবা ওলানে ফোসকা পড়ে। প্রাণী খোঁড়াতে থাকে এবং মুখে ঘা বা ক্ষতের কারণে খেতে কষ্ট হয়। অল্প সময়ে প্রাণী দূর্বল হয়ে পড়ে। এ রোগে গর্ভবতী গাভীর প্রায়ই গর্ভপাত ঘটে। দুধালো গাভীর দুধ উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। বয়স্ক গরুর মৃত্যুহার কম হলেও আক্রান্ত বাছুরকে বাঁচিয়ে রাখা খুবই কঠিন। অর্থাৎ ৬ মার বয়সের নীচে আক্রান্ত বাছুরের ৯৫ শতাংশই মারা যায়। বাছুরে এ রোগকে Tiger heart disease বলা হয়।

চিকিৎসাঃ আক্রান্ত পশুকে সুস্থ প্রাণী থেকে আলাদা রাখতে হবে। অসুস্থ প্রাণীর ক্ষত পটাশ মিশ্রিত পানি (০.০১ শতাংশ পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট) দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। ফিটকিরির পানি ১০ গ্রাম (২ চা চামচ) ১লিটার পানিতে মিশিয়ে মুখ পরিস্কার করতে হবে। সোহাগার খৈ গুড়া করে মধু মিশিয়ে মুখের ঘায়ে প্রলেপ দিতে হবে। নরম খাবার দিতে হবে। প্রাণীকে শুষ্ক ও ছায়াযুক্ত স্থানে মেঝেতে রাখতে হবে। কোন অবস্থায়ই কাদা মাটি বা পানিতে রাখা যাবে না। খাওয়ার সোডা ৪০ গ্রাম ১লিটার পানিতে মিশিয়ে পায়ের ঘা পরিষ্কার করে সালফানিলামাইড পাউডার লাগাতে হবে। মাছি হতে সাবধান থাকতে হবে যাতে পোকা না দিতে পারে। এক্ষেত্রে সালফানিলামাইড পাউডার ও নিগুভন পাউডার নারিকেল তৈল এর সাথে বা ভেজেলিনের সাথে মিশ্রিত করে ঘায়ে লাগানো সর্বোত্তম। উল্লেখ্য ঔষধ লাগানোর পূর্বে পায়ের ঘা হাইড্রোজেন পার অক্সাইড দ্বারা পরিস্কার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। আক্রান্ত গরু মহিষকে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য পেনিসিলিন অথবা অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ইনজেকশন প্রয়োগ করতে হবে (ডাক্তারের পরামর্শক্রমে)। মুখে ঘায়ের কারণে অতিরিক্ত লালা নির্গত ও খাওয়া ছেড়ে দিলে অবশ্যই স্যালাইন (৫% গ্লুকোজ +০.৯% সেডিয়াম ক্লোরাইড যুক্ত) শিরায় পুশ করতে হবে। এর সাথে ভিটামিন বি-কম্প্লেক্স ইনজেকশন প্রয়োগে ঘা, সেরে উঠার পাশাপাশি খাওয়ার আগ্রহ বাড়বে। তবে সতর্ক থাকতে হবে শুধুমাত্র গ্লুকোজ ইনজেকশন প্রয়োগ করা যাবে না।

রোগের বিস্তারঃ ক্ষুরারোগে আক্রান্ত পশুর লালা, ঘায়ের রস, মলমূত্র, দুধ ইত্যাদির মাধ্যমে এই ভাইরাস নির্গত হয়। এ ভাইরাস বাতাস ও খাদ্যের মাধ্যমে সংবেদনশীল পশুতে সংক্রমিত হয়। আক্রান্ত গরু ও মহিষের সংস্পর্শে এ ভাইরাস সুস্থ পশুতে সংক্রমিত হতে পারে। আক্রান্ত পশুর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও পশুজাত দ্রব্যের (চামড়া, মাংস, দুধ ইত্যাদি) মাধ্যমে এ ভাইরাস একস্থান থেকে অন্যস্থানে এমনকি বাতাসের মাধ্যমে এক দেশ থেকে অন্যদেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

প্রতিরোধে বিধিব্যবস্থাঃ রোগ যাতে না ছড়ায় সে জন্য আক্রান্ত প্রাণীকে সুস্থ প্রাণী হতে আলাদা করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। সুস্থ গবাদি প্রাণীকে বছরে দু'বার প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে। ক্ষুরারোগসহ যে কোন মৃত প্রাণীকে ৪/৫ ফুট মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে, কোনো ক্রমেই খোলা স্থানে ফেলে রাখা যাবে না। ৬ মাসের কম বয়সের বাচ্চাকে অসুস্ গাভীর দুধ খাওয়ানো যাবে না এবং আলাদা স্থানে রাখতে হবে। ক্ষুরা রোগের টিকা স্থানীয় উপজেলা ও জেলা হাসপাতালে পাওয়া যায় যা সময়মত দিলে ক্ষুরারোগের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়।

লেখক-

অধ্যাপক মেডিসিন, সার্জারী এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দিনাজপুর।

ই-মেইলঃ fhoque.hstu@gmail.com

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

রামপাল ইস্যু এবং আশার আলো

বর্তমানে দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় কয়লাভিত্তিক ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রটি সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রেখেই চালু রয়েছে। সুতরাং সুন্দরবন থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে রামপালে নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি স্থাপিত হলে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। বড়পুকুরিয়ার সঙ্গে তুলনা করলে পরিবেশের জন্য তেমন একটা ক্ষতির আশঙ্কা আছে বলে মনে হয় না। তার পরও সতর্কতা অবলম্বন করা মঙ্গলজনক। বিশ্বের অনেক দেশেই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতেও রয়েছে। আমেরিকায় প্রায় ৩০০টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে। ২০১০ সালে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সুন্দরবন থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে রামপালে এক হাজার ৮৩৪ একর জমি অধিগ্রহণ ও মাটি ভরাটের কাজ চলে। রামপাল সমুদ্রবন্দরের কাছাকাছি হওয়ায় কয়লা আমদানিতে এ পথ সহজ এবং খরচও তুলনামূলক কম। সুতরাং বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে নিঃসন্দেহে। ২০১৩ সালের ২০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার পিডিবি ও এনটিপিসি প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, ২০১৩ সালের ২০ জানুয়ারি Center for Environment and Geographical Information Services (CEGIS) রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা বা যাচাই-বাছাইপূর্বক ১০ জুলাই পিডিবি পরিবেশ অধিদপ্তরে জমা দেয়। বাগেরহাটের রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হলে পরিবেশের জন্য সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বিশ্বে যত ধরনের ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে প্রায় সব কয়টি থেকেই কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ বিভিন্ন ধরনের গ্যাস নির্গত হয়ে বৈশ্বিক জলবায়ুর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে, তাই বলে কি ইন্ডাস্ট্রিগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বা বন্ধ করে দেওয়া কোনো দেশের জন্যই অর্থবহ হবে না। রামপালের বিষয়টিকেও একই বিবেচনায় ভাবতে হবে। সব ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বিদ্যুৎ উৎপাদন তথা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মানদণ্ডে অত্যন্ত প্রয়োজন। উল্লেখ্য, একমাত্র ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের চারপাশেই রয়েছে প্রায় দুই হাজার কয়লা ও গ্যাসভিত্তিক ইটভাটা। প্রায় ১০০ একর জমির ওপর ঢাকার মিরপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা ও কেন্দ্রীয় হাঁস-মুরগির খামার স্থাপিত। এ এলাকা থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার বা তার চেয়েও কম দূরত্বে বেশ কয়েকটি কয়লাভিত্তিক ইটভাটা রয়েছে। সেখানে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির বিষয়ে তেমন কোনো আলোচনা বা সমালোচনা হচ্ছে না। এ এলাকায় গাছপালা, লতাপাতা ও শাকসবজি উৎপাদিত হচ্ছে যথারীতি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সুন্দরবন অঞ্চল থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটির অবস্থান সুন্দরবনের জন্য কোনো ক্ষতির কারণ হবে না। অন্যদিকে এ বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিবেশের দিকে নজর রেখেই করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ বিন্দুমাত্রও অবহেলা করবে না—এ বিশ্বাসটুকু না থাকলে দেশে উন্নয়নের ছোঁয়াই বা লাগবে কিভাবে? ভারতের নবায়নযোগ্য জ্বালানিমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন, রামপালে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতেই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হতে যাচ্ছে। সুন্দরবনের জন্য কোনো ক্ষতির কারণ হবে না। কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রটি পরিবেশবান্ধব কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। একটি উদাহরণ দিয়ে উল্লেখ করা যায়, বাংলাদেশে প্রায় ১০ হাজারেরও বেশি ইটভাটা রয়েছে, যেখানে কয়লা, কাঠ, গ্যাস ও ফার্নেস অয়েল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গত আশির দশকে ইটভাটার ধোঁয়া নির্গমন চিমনিগুলোর উচ্চতা ছিল মাত্র ৩০-৪০ ফুট। ফলে পার্শ্ববর্তী ক্ষেতের ফসলের ক্ষতিসহ পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ত। বর্তমানে ওই চিমনির উচ্চতা হচ্ছে ১২০ থেকে ১৩০ ফুট। ফলে এখন আর সে ধরনের ক্ষতি হচ্ছে না। তেমনি নতুন প্রযুক্তিতে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র হতে উদ্গীর্ণ ধোঁয়া বা ছাইও ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সুন্দরবনের গাছপালার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। এ বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে এক হাজার ৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হলে ওই এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে বড় বড় কলকারখানা স্থাপন করা সম্ভব হবে। ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে খুলনা, বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের। ভবিষ্যতে সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। নেপাল, ভুটান থেকে বিদ্যুৎ বাংলাদেশে আমদানিতে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার ছাড়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সঙ্গে সব ক্ষেত্রেই সুসম্পর্ক স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশ ও জনগণের স্বার্থেই বর্তমান সরকার সীমাহীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভাগ্যে জুটছে বাধা আর বাধা। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে সব ধরনের আনুষ্ঠানিকতা যথাযথভাবে শেষ করেই সরকার এ প্রকল্পের মূল অবকাঠামো তৈরিতে হাত দিয়েছে। অর্থাৎ সুন্দরবনের পরিবেশ ও স্থানীয় জনগণের মঙ্গলের দিকটি বিবেচনায় এনেই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি স্থাপন করা হচ্ছে। এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

> রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে সব ধরনের আনুষ্ঠানিকতা যথাযথভাবে শেষ করেই সরকার এ প্রকল্পের মূল অবকাঠামো তৈরিতে হাত দিয়েছে। অর্থাৎ সুন্দরবনের পরিবেশ ও স্থানীয় জনগণের মঙ্গলের দিকটি বিবেচনায় এনেই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি স্থাপন করা হচ্ছে। এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ

এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে রূপপুরে একটি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে ১০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরে আরো ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এ ব্যাপারে সব শ্রেণীর মানুষ আনন্দিত। জনগণ সরকারের এ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের জন্য সাধুবাদ জানিয়েছে। পরিবেশ রক্ষায় গাছপালা, বনজঙ্গল ও প্রাণিকুলের প্রয়োজনকে গুরুত্বসহকারে অনুধাবন করতে হবে। তবে জনহিতকর উন্নয়নমূলক কোনো সরকারি কাজে বাধা দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল জনগণ কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না বা কারো জন্য সুখকর নয়। এটিই বাস্তব সত্য। তবে সুন্দরবন ও বনের মধ্যে সব শ্রেণীর প্রাণিকুল যেন স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারে সেদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে। প্রয়োজনে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

লেখক : অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার

নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকার রাখে। এটি কারো দয়া বা আন্তরিকতার বিষয় নয়। বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষের আবাসস্থল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের যথেষ্ট সুনাম থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে ১৮ দলের, বিশেষ করে জামায়াত-শিবিরের হরতাল-অবরোধে যে ধ্বংসাত্মক ঘটনাগুলো ঘটেছে, তা দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই শুধু নয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও এর নেতিবাচক প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়তে শুরু করেছে। বিশ্বের প্রায় সব ক্ষমতাধর দেশই জামায়াত-শিবিরের ধ্বংসাত্মক জ্বালাও-পোড়াও নীতিকে অনৈতিক বলে অ্যাখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি দলটির রাজনীতি করার বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্টে জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করা হয়। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বা ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে এ দেশ ও জাতিকে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে এবং বাংলাদেশ সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের তালিকায় চলে যাবে। পবিত্র ধর্ম ইসলামে ধ্বংসাত্মক বা হিংস্রতা গ্রহণযোগ্য নয়। হত্যা তো দূরের কথা, মানুষের মনে কষ্ট হোক—এমন ব্যবহার করাও নিষেধ রয়েছে। সুরা আল বাকারার ১৭৮ নম্বর আয়াতে কোনো মানুষ ছেচ্ছায়, সজ্ঞানে, ইচ্ছাকৃতভাবে, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করলে বিনিময়ে হত্যা করার বিধান রয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'কেসাস'। একই সুরার ২১৭ নম্বর আয়াতে উল্লেখ রয়েছে, হত্যার আদেশদাতার শাস্তি ওই হত্যাকারীর চেয়েও কঠিন। গত ২০১৩ সালের শেষের দিকে ও এ বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে হরতাল ও অবরোধকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল, তা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। প্রাণীকুলের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সুখ-শান্তিতে বসবাসের নিমিত্তে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আলো-বাতাস-পানিসহ কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু রেখেছেন সবার জন্য উন্মুক্ত। চলাচল ও বসবাসের জন্য জল ও স্থলভূমি রেখেছেন সবার জন্য অবারিত। সব শ্রেণী, পেশা ও বর্ণের মানুষ বিশ্বের যেকোনো দেশেই শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবে—এটিই প্রকৃত বিধান। সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু বলে সমাজে শ্রেণীবিন্যাস করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দূরত্ব ইসলাম ধর্মসহ কোনো মতাদর্শেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্বে প্রায় ২০০টির অধিক ছোট-বড় দেশ রয়েছে। এর মধ্যে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত মোট দেশের সংখ্যা ১৯৫টি, যার মধ্যে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের সংখ্যা ১৯৩টি। তা ছাড়া বেশ কয়েকটি দেশ আজও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। সব দেশেই রয়েছে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাভাষী মানুষের জন্য আবাসস্থল। বিশ্বের সব দেশেই বিভিন্ন আনুপাতিক হারে এসব শ্রেণীর মানুষ বাস করে যাচ্ছে। কম-বেশি সবাই বাস্তুভিটায় বাস করে জীবনের শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে আত্মতৃপ্তি পায়। সবাই বিভিন্ন পেশায় কাজকর্ম করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে। বিদেশে গিয়েও পুনরায় নিজ দেশে ফিরে এসে শান্তির সঙ্গে ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন নিয়েই জীবন সচল রাখতে নিজ নিজ কাজে মনোনিবেশ করে থাকে। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই একটি ধর্মের মানুষ সংখ্যাগুরু, বাকি সবাই সংখ্যালঘু। বাংলাদেশে যারা সংখ্যালঘু, অন্য দেশে একই শ্রেণীটি সংখ্যাগুরু। সুতরাং এ ধরনের ভাবার অবকাশ নেই। দৃশ্যমান বা অদৃশ্য—সব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রধানত মানুষের উপকার বা মঙ্গলের জন্য। তাই জন্মগত সূত্রেই হোক আর গ্রিনকার্ডের মাধ্যমেই হোক, রাষ্ট্র বা দেশ সবার। মানুষ হিসেবে সবারই যার যার অবস্থান থেকে সাধ্যানুযায়ী স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার রয়েছে। কেউ যেন অধিকার বঞ্চিত না হয়।

৫ জানুয়ারির নির্বাচনপূর্ব ও উত্তর সময়ে বাংলাদেশের ধ্বংসাত্মক ঘটনাগুলোতে শুধু বিবেকবান এ দেশের মানুষই নয়, বিদেশি বন্ধুরাও শঙ্কিত। বিদেশে অবস্থানরত অনেক বাংলাদেশিও সন্দেহের চোখে

দেশ ও সমাজের উন্নয়নে প্রয়োজন দল-মত, ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে হিংসাবিদ্বেষ, হানাহানির রাজনীতি পরিহার করে দল-মত-নির্বিশেষে সবাই মিলেই বর্তমান উন্নয়নের গতিতে আরো শক্তির সঞ্চার করতে হবে। সে ক্ষেত্রে সব দল-মত, ধর্ম ও বর্ণের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে হবে একটি সন্ত্রাসমুক্ত, হিংসাত্মক হরতাল-অবরোধমুক্ত বাংলাদেশ

রয়েছে বিদেশিদের কাছে। হরতাল-অবরোধে হিংসাত্মক ঘটনাবলি দ্বারা মানুষ হত্যা, কল-কারখানা, যানবাহন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বইপত্রসহ বিভিন্ন স্থাপনায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ঘটনায় সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ হাজার হাজার কোটি টাকা। সহিংসতায় যথাক্রমে ৪৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮৭টি উচ্চ মাধ্যমিক, ২৬টি মাদ্রাসা ও ১২টি কলেজে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। তা ছাড়া রয়েছে ব্যাংক-অফিসসহ বিভিন্ন স্থাপনা। আরো রয়েছে বসতবাড়ি, গাড়ি, মিল-কারখানা, ট্রেন ও লঞ্চসহ অনেক কিছু। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও মন্দির। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ যাই হোক না কেন, বড় ক্ষতি হয়েছে শিক্ষার্থী ও স্বজনহারা পরিবারগুলোর। গত এক বছরে এক হাজার বাস, মিনিবাস, ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সে হিসাবে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত এর সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। তা ছাড়া বাস-ট্রাক ভাঙচুর করা হয়েছে প্রায় তিন হাজার ৫০০টি, যার ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৩০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতির তথ্যমতে, অগ্নিসংযোগ ও বোমাবাজিতে ৫৫ জন পরিবহন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। পরিবহন খাতে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। এক দিনের হরতালে কৃষকের পণ্য বাজারজাতে বাধাগ্রস্ত হওয়ায় লোকসানের পরিমাণ ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা এক হাজার ৯০০ কোটি টাকা। সে হিসাব অনুযায়ী জানুয়ারি ২০১৩ থেকে জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত এক বছরে ৭২ দিন হরতাল-অবরোধে কৃষকের লোকসানের পরিমাণ এক লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা। সিলেট প্রবাসী সমিতির এক আলোচনা সভায় উল্লেখ করা হয়, গত ৪২ দিনের হরতাল ও অবরোধে একমাত্র সিলেট জেলায় পাথর, কয়লা ও চুনাপাথর আমদানিতে সরকার রাজস্ব আদায় থেকে বঞ্চিত হয়েছে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। এমনিভাবে হোটেল ব্যবসায় ক্ষতির পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা, গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে ২২৫টি, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩৮ কোটি টাকা। গাছ কর্তন প্রায় ৫৫ হাজারটি, যার অনুমানিক মূল্য প্রায় ১০ কোটি টাকা। দেশ ও সমাজের উন্নয়নে প্রয়োজন দল-মত, ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে হিংসাবিদ্বেষ, হানাহানির রাজনীতি পরিহার করে দল-মত-নির্বিশেষে সবাই মিলেই বর্তমান উন্নয়নের গতিতে আরো শক্তির সঞ্চার করতে হবে। সে ক্ষেত্রে সব দল-মত, ধর্ম ও বর্ণের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে হবে একটি সন্ত্রাসমুক্ত, হিংসাত্মক হরতাল-অবরোধমুক্ত বাংলাদেশ।

লেখক : অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

কালের কণ্ঠ

সোমবার। ৩ মার্চ ২০১৪। ১৯ ফাল্গুন ১৪২০

www.kalerkantho.com

ডা. মো. ফজলুল হক

বিচারকাজে শৈথিল্য অপরাধ বাড়ায়

আগে এত কোর্ট-কাছারি ও আইন বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। তখন অপরাধের বিচার হতো গ্রাম্য সালিসে। সেখানে বিচার দ্রুত সম্পন্ন হতো। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি বা মোড়লরাই উভয় পক্ষকে একত্র করে সালিস বসাতেন। উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিচারকাজ শেষ করতেন। রায়ের মধ্যে ছিল বেত্রাঘাত, কান ধরে উঠবোস, সমাজ থেকে বয়কট করা, অর্থদণ্ড ইত্যাদি। দিন দিন শিক্ষিতের হার বাড়ছে এবং বিচার-বিভাগের ভিত মজবুত হচ্ছে। বিচারকাজ পরিচালনার জন্য শক্তিশালী আইনের কাঠামো তৈরি হচ্ছে। একই সঙ্গে মানুষ বাড়ছে। অন্যায়-অবিচার বাড়ছে এবং বিচারপ্রার্থীর সংখ্যাও বাড়ছে। ফলে আদালতে মামলাজটও বাড়ছে এবং বিচারপ্রক্রিয়া ক্রমেই বিলম্বিত হচ্ছে। এতে কিন্তু অপরাধ কার্যক্রমও উৎসাহিত হয়। অন্যদিকে অপরাধীরা বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক কারণে পার পেয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। অনেক অপরাধীর স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ, দেশত্যাগ, বিদেশে আত্মগোপন ও রাজনৈতিক দলের সদস্য বনে গিয়ে অপরাধ বিষয়টি আড়াল হয়ে যাচ্ছে—এমন অনেক ঘটনাও ঘটেছে। অনেক সময় অপরাধী শনাক্ত করতে সন্দেহজনকভাবে কিছু ভালো লোক ধরা পড়ে হাজত খেটে জীবনের মূল্যবান সময় শেষ হয়েছে। এমন অনেক ঘটনার জন্ম হয়েছে এ দেশে। কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণেও ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি রাতে পুলিশের দুই সার্জেন্ট আলাউদ্দীন ও হেলালউদ্দীন ভূইয়া চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতীরের ফার্টিলাইজার লিমিটেডের জেটিতে ১০ ট্রাক অস্ত্রের চালান আটক করেন। বিধি মোতাবেক ওই পুলিশ সার্জেন্টদের মহৎ কাজের জন্য প্রাপ্য ছিল পুরস্কার ও পদোন্নতি। তা না হয়ে তাঁদের ভাগ্যে জুটল শারীরিক অত্যাচার, জেল-জুলুম ও সামাজিকভাবে সম্মানহানি। একে-৪৭ রাইফেল হাতে তুলে দিয়ে ছবি পত্রিকায় প্রকাশ করে তাঁদের মানসম্মান ভূলুণ্ঠিত করা হয়। অথচ ওই ১০ ট্রাক অস্ত্রের মধ্যে একে-৪৭ রাইফেল ছিলই না, যা তদন্তে প্রমাণিত হয়। ফলে ২০১১ সালে উভয়েই নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে পুনরায় চাকরিতে যোগদান করার সুযোগ পান। এটিই যথেষ্ট নয়। কিন্তু জীবনের প্রায় ২৭টি মাস চলে যায় তাঁদের, যা অফেরতযোগ্য। ১০ ট্রাক অস্ত্র আটকের কারণে তাঁরা রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পাওয়ার দাবিদার। এ ধরনের ঘটনায় মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে নিরুৎসাহিত হবে। ফলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে।

এমনিভাবে স্বাধীনতার ৪২ বছরে বেশ কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের বিচার যথাসময়ে না হওয়ায় এরই মধ্যে হাজারো অপরাধী জন্ম নিয়েছে এ দেশে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের বিচার, জেলহত্যাকারীদের বিচার, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যাকারীদের বিচার, ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলাকারীদের বিচার, ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলাসহ বিভিন্ন অন্যায়ের বিচারকাজ বিলম্বিত হওয়ায় সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য বেড়েই যাচ্ছে। বিলম্বিত হলে যে সমস্যা হতে পারে তা হলো—১. অন্যায়কারীর দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়া; ২. পাবলিক সেন্টিমেন্ট স্তিমিত হওয়া; ৩. আসামির দেশত্যাগ; ৪. সাক্ষী পেতে সমস্যার সৃষ্টি; ৫. আসামি ও সাক্ষীর বার্ধক্যজনিত মৃত্যু; ৬. বৃদ্ধ বয়সে ফাঁসি কার্যকরের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ফাঁসির রায়কে অমানবিক মনে করা ইত্যাদি। এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়ে। যুবক বয়সে অপরাধ করেছেন, রায় হয়েছে বৃদ্ধ বয়সে। নতুন প্রজন্মের কাছে বৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে ফাঁসি দেওয়া বা জেল-জরিমানার বিষয়টি কষ্টকর মনে হয়। অথচ তাদের অপরাধের মাত্রা এতটাই বেশি ছিল, যা নতুন প্রজন্মের ধারণার বাইরে। সুতরাং অপরাধ যে দলের বা দেশেরই হোক, বিচার হতে হবে দ্রুততম সময়ে। সাক্ষীদের নিরাপত্তা বিধান যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। উল্লেখ্য, যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির রায়ে কয়েকজন সাক্ষীকে হত্যা ও গুম করার ঘটনাসহ ঘরবাড়ি, দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ আদালতে স্বল্প সময়ে বিচারকাজ সম্পন্ন, রায় বাস্তবায়নই অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাব ফেলতে পারে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। গত ৫ জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে জীবনবাজি রেখেই ৪০ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছে। বাধা না দিলে ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ ভোটার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হতো, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই বলে মন্তব্য করেছেন অনেকেই। বিগত ১৩ মাসের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার এ দেশের শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কৃষক ও কৃষিপণ্য, শিল্পকারখানা ও শ্রমিক, মসজিদ-মাদ্রাসা, এমনকি মসজিদের কার্পেট ও বায়তুল মোকাররম এলাকায় কোরান শরিফসহ ধর্মীয় মালামালে অগ্নিসংযোগ বিগত ৪৩ বছরের বিচারকাজ বিলম্বিত হওয়ারই ফসল। দেশ বাঁচাতে হবে, দেশের সম্পদ বাঁচাতে হবে, দেশের কৃষক ও কৃষিপণ্য বাঁচাতে হবে, শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের বাঁচাতে হবে। এ কাজটি সরকারকেই করতে হবে।

অনেক অপরাধীর স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ, দেশত্যাগ, বিদেশে আত্মগোপন ও রাজনৈতিক দলের সদস্য বনে গিয়ে অপরাধ বিষয়টি আড়াল হয়ে যাচ্ছে—এমন অনেক ঘটনাও ঘটেছে। অনেক সময় অপরাধী শনাক্ত করতে সন্দেহজনকভাবে কিছু ভালো লোক ধরা পড়ে হাজত খেটে জীবনের মূল্যবান সময় শেষ হয়েছে

লেখক : অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ১৩ মে ২০১৪। ৩০ বৈশাখ ১৪২১

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

অপহরণ-গুমের পেছনে রয়েছে অর্থ

দেশে অব্যাহত অপহরণ, হত্যা ও গুমের ঘটনায় সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে। রাস্তায় বা মাঠে-ঘাটেই শুধু নয়, বাসাবাড়ি থেকেও র‍্যাব-ডিবি পুলিশের নাম ভাঙিয়ে অপহরণ, ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপকর্ম করে যাচ্ছে অপহরণকারীরা। অনেক বছর ধরে এ ধরনের ঘটনা চলে আসছে। দিন দিন এ অপরাধীচক্রের দৌরাত্ম্য বেড়েই যাচ্ছে। এ অবস্থার অবসান সবার কাম্য। অন্যথায় দেশের অর্থনীতি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ব্যাহত হবে জীবনজীবিকা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চলমান ধারাবাহিকতা। বর্তমান পরিস্থিতির অবসানকল্পে সব শ্রেণির নাগরিককে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়ে।

দেশে শক্তিশালী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থাকার পরও এ ধরনের ঘটনা কেন ঘটছে? গুম-খুন-অপহরণের চলমান ঘটনায় কোনোভাবেই নিরাপত্তা বাহিনী তাদের দায়দায়িত্ব অস্বীকার করতে বা এড়িয়ে যেতে পারে না। দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশের ভাবমূর্তিও আজ প্রশ্নবিদ্ধ। পাল্টাপাল্টি দোষারোপ পেছনে ফেলতে হবে। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন, অপরাধী যে দলেরই হোক না কেন, তাকে শাস্তি পেতেই হবে। তিনি নারায়ণগঞ্জের খুনের ঘটনায় খুনিদের খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান বলেন, 'গুম-অপহরণ হঠাৎ করেই বাড়েনি, দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে।' কারণ হিসেবে বলেন, 'একটি প্রশাসনের অবক্ষয়, অন্যটি রাজনৈতিক কারণে।'

পবিত্র কোরআন শরিফে উল্লেখ রয়েছে, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের আপনজন ছাড়া অন্য কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের বিভ্রান্ত করতে ত্রুটি করবে না। তোমাদের ক্ষতিই তাদের কাম্য, তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায়, যা তাদের অন্তরে গোপন রাখে।' (সুরা আল-ইমরান, আয়াত-১১৮)। উল্লেখ্য, একই কায়দায় র‍্যাব-পুলিশের পোশাক পরে নামিদামি গাড়িতে উঠিয়ে ক্লসটেপ বা চেতনানাশক দ্বারা অচেতন করে চোখে রুমাল বেঁধে, শারীরিক অত্যাচার করে মুক্তিপণ আদায় বা হত্যা করে লাশ গুমসহ অসহনীয় ঘটনা ঘটছে, যার শেষ কোথায়?

দেশে স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বা ধরে রাখতে দল-মত-নির্বিশেষে সবার সহযোগিতা অপরিহার্য। দেশের স্বার্থেই সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সহযোগিতা দিতে হবে। অন্যথায় ইতিবাচকের পরিবর্তে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে সব ক্ষেত্রে। ভবিষ্যতে মাত্রা বেড়েই যাবে, যা ক্যান্সার সমতুল্য। এর দায়ভার চেপে বসবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর। নারায়ণগঞ্জ শিল্পাঞ্চল হওয়ায় বিভিন্নভাবে চলে চাঁদাবাজি, দখল বাণিজ্য—যার কারণে উত্থান ঘটেছে প্রায় ২৬টি নতুন সন্ত্রাসী গ্রুপের (পত্রিকার তথ্যমতে)। মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার তথ্যমতে, গত এপ্রিল মাসেই অপহরণ হয়েছে ৩৪ জন এবং নিখোঁজ রয়েছে ২৬ জন। এ বিষয়গুলো ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক।

শিশু অপহরণে গৃহকর্মী, পরিচিত জন, নিকট আত্মীয়রাই বেশি জড়িত থাকতে দেখা যায়। মেয়েদের অপহরণ করা হয় বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বা ভালো চাকরির কথা দিয়ে। পাচার করা হয় অন্যান্য দেশে। এদের পরিণতি ভয়াবহ ও অসম্মানের। অনেকেই জেলখানায় মানবেতর জীবনযাপন করে মূল্যবান জীবন শেষ করছে চোখের জলে। মাঝেমধ্যে মানবাধিকার সংগঠনের তৎপরতার কারণে জেল থেকে খালাশ পেয়েছেন; কিন্তু সুস্থ জীবনে ও সংসারে সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকারবঞ্চিত হয় অনেক মেয়েই।

অপহরণ বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে, যেমন—মুক্তিপণ আদায়, ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক বিরোধ, ব্যক্তি আক্রোশ, চাঁদাবাজির ভাগাভাগি ইত্যাদি। পাহাড় ও সমুদ্রবেষ্টিত চট্টগ্রামেই অপহরণের ঘটনা ঘটে বেশি।

যেমন—গত সাড়ে চার মাসে বাংলাদেশে প্রায় ৬০ জন বিভিন্ন পেশা ও বয়সের মানুষকে অপহরণ ও গুম করা হয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রামেই ২৫ জন অর্থাৎ প্রায় ৪০ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে নোয়াখালী এবং তৃতীয় অবস্থানে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ। তবে গুমের দিক থেকে নারায়ণগঞ্জ প্রথম স্থানে। উল্লেখ্য, চট্টগ্রামে শিশু এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে রাজনৈতিক দলের সদস্য, ব্যবসায়ী, ছাত্র, আইনজীবী ইত্যাদি। সমুদ্রে অপহরণ হয়ে থাকে শ্রমজীবী মৎস্য শিকারি বা জেলেরা। অনেক সময় নৌবাহিনীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে জাল, অর্থকড়ি, মাছ, ট্রলার ছিনিয়ে নিয়ে সব জেলেকে হত্যা করে লাশ ফেলে দেয় গভীর সমুদ্রে। গত আশি ও নব্বইয়ের দশকে অপহরণের ঘটনা বেশি ঘটেছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। শান্তিবাহিনীর সদস্যরাই গভীর জঙ্গলে কাঠ ব্যবসায়ী, রাস্তা উন্নয়নে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার, কন্ট্রাক্টর, বিদেশি সংস্থায় কর্মরত অফিসারদের অপহরণ করে নিয়ে মুক্তিপণ আদায় করা হতো। সেখানে হত্যা ও গুমের ঘটনা বিরল। দেশের মানুষের জানমালের নিরাপত্তায় রয়েছে দক্ষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকেও এ ধরনের ঘটনা অপ্রত্যাশিত ও রহস্যাবৃত নিঃসন্দেহে। সব অপহরণের কারণ অবশ্যই উদঘাটিত হবে বলে বিশ্বাস করি এ কারণে যে, সোনালী ব্যাংকের পাঁচ বস্তাভর্তি ১৬ কোটি ৪৩ লাখ টাকা চুরি হয়েছে কিশোরগঞ্জের ব্যাংক থেকে, তা উদ্ধার করা হয়েছে ঢাকা থেকে। এ থেকে বোঝা যায়, সদিচ্ছা থাকলে অবশ্যই উদঘাটিত হবে, বিচার হবে। রাস্তায় গাড়ি চলবে যথারীতি। তবে যাঁরা বিদায় নিলেন তাঁদের কোনো দিন ফেরত পাওয়া যাবে না। নিকটাত্মীয়সহ মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার লাভ কী হবে? হৃদয়ের ব্যথা চোখের জল এবং নির্মম আজীবনের ব্যথা সহ্য করার মতো নয়। স্বজনের রেখে যাওয়া স্মৃতি ভোলার নয়। এটিই বাস্তব সত্য। একটি ঘটনার বিচারকার্য বিলম্বিত হলে বা বিচারকার্য সৃষ্ট না হলে অপরাধীরা অপরাধ চালাতে উৎসাহী হয়। ফলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। আইন চলবে তার নিজস্ব গতিতে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ঘটনার সঠিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও আইনের সঠিক বাস্তবায়নই শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

লেখক : অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

দেশে স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বা ধরে রাখতে দল-মত-নির্বিশেষে সবার সহযোগিতা অপরিহার্য। দেশের স্বার্থেই সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সহযোগিতা দিতে হবে। অন্যথায় ইতিবাচকের পরিবর্তে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে সব ক্ষেত্রে। ভবিষ্যতে মাত্রা বেড়েই যাবে, যা ক্যান্সার সমতুল্য। এর দায়ভার চেপে বসবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর

কালের কণ্ঠ
www.kalerkantho.com

ডা. মো. ফজলুল হক

সুস্থ বিবেকই শ্রেষ্ঠ আদালত

জনগণ স্বাধীনভাবে ভোট দেবে, যাকে ইচ্ছা তাকে দেবে। বিস্ময়কর ঘটনা হলো পরাজিত প্রতিপক্ষও নির্বাচনকে সুষ্ঠু বলেছেন, মেনে নিয়েছেন, এমনকি ঘাড়ে হাত রেখে মিষ্টিও খেয়েছেন, যা বিগত ৪২ বছরের সব ঘটনাকে হার মানিয়েছে। মানুষ আজ আশার আলো দেখছে, অবাকও হচ্ছে

একটি বিদেশি চ্যানেলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের কৃষকদের সর্বস্বান্ত করেছে ধ্বংসাত্মক হরতাল। কারণ কৃষক তাঁর উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত না করতে পেরে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যার পরিমাণ দুই হাজার কোটি টাকা। গণতন্ত্র, অর্থনীতি ও আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহিংসতাই প্রধান অন্তরায়। এটিই সর্বজনস্বীকৃত ও যথার্থ মন্তব্য। সহিংসতায় জড়িতদের মানবতা ও বিবেক বলতে কিছুই থাকে না। অনেক সময় নিজের জীবনেও নেমে আসে বিপর্যয়, এমনকি নিজের সংসারেও নেমে আসে ধূমায়িত অন্ধকার। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি ছোট ও ঘন জনবহুল দেশ। অনুকূল জলবায়ুর দেশ। উন্নয়নশীল দেশ। কিন্তু দুঃখের বিষয় উন্নয়নের গতি মন্থর কেন? বাস, ট্রেন, রিকশায় ভ্রমণ নিরাপদ নয় কেন? তা হলো সহিংস হরতাল। এ দেশে শান্তিপ্রিয় মানুষের কত শতাংশ হরতাল চায়? উত্তর হলো বেশির ভাগই চায় না। সহিংস হরতাল কোনো বিবেকবান মানুষই সমর্থন করে না, করতে পারে না। শান্তিপূর্ণ হরতাল বলতে যা বোঝায় স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত একটি মাত্র হয়েছে ২০১৩ সালে। সহিংস হরতাল দেশ ও জনগণের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক তা সরকার ও বিরোধী দল মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে; কিন্তু বাস্তবে তা আমলে আনা হচ্ছে না। যেমন—মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিরোধীদলীয় নেতা খালেদা জিয়া যথাক্রমে ১৯৯৯ সালের ২ মার্চ কক্সবাজার জনসভায় ও ২০০৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারিতে সাভার জনসভায় (উভয়েই) বলেছিলেন জনগণ হরতাল চায় না। খালেদা জিয়া আরো বলেছিলেন, হরতাল দিয়ে মানুষের সমর্থন আদায় করা যায় না। সমর্থন আদায় করতে হলে সংসদের বিকল্প নেই (দৈনিকের তথ্যমতে)। উভয়ের মন্তব্যই সঠিক ও যথাযথ নিঃসন্দেহে। বাস্তবে কী ঘটছে? দেশের উন্নয়নে প্রয়োজনে গঠনমূলক সমালোচনার পাশাপাশি গঠনমূলক উপদেশও দিতে হবে সরকারকে। সরকারি দল সব সময়ই হরতালের বিপক্ষে। কারণ রাষ্ট্র ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব সরকারের। বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ হরতালকে ক্যান্সার মনে করে। বেশ কয়েক বছর ধরে বিশ্ব অর্থনীতিতে ধস নামলেও বাংলাদেশের প্রায় সব সেক্টরেই অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে, যার দাবিদার এ দেশের কৃষক, গার্মেন্ট সেক্টর, বিদেশে কর্মরত শ্রমিক ও বর্তমান সরকারের সঠিক সিদ্ধান্তও এর বাস্তবায়ন। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য মডেল দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা গত কয়েক দিন আগে এক সভায় বাংলাদেশের উন্নয়নে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, উন্নয়নের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম পর্যায়ে। অনেকে মন্তব্য করেছেন, বাংলাদেশ এখন আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয়। যৌথ সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন আন্ডারসেক্রেটারি শারমেন বলেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশকে গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাই সংকট নিরসনের পথটাও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মতোই বাংলাদেশের মানুষকেই খুঁজে বের করতে হবে। ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত শাহের মোহাম্মদ বলেন, একজন বিদেশি হিসেবে বলব, 'হরতাল বাংলাদেশিদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেয়। খারাপ ধারণা দিচ্ছে বহির্বিশ্বের কাছে। ওআইসি বর্তমান সরকারের উদ্যোগকে স্বাগত জানায় (পত্রিকায় প্রকাশিত)। অন্যদিকে বর্তমান সরকারকে বিগত ৩৫ বছরের পুঞ্জীভূত সমস্যা দূরীকরণে আইনের সংশোধন ও নতুন আইন তৈরি, এর বাস্তবায়নে কঠিন পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। পদক্ষেপগুলো দেশ ও জাতি গঠনে যথেষ্ট সহায়ক হলেও সমালোচনা থেকে বাদ পড়ছে না সরকার। তবে কিছু দুর্নীতির কারণে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই প্রকৃত বিশ্লেষণে। কৃষি, গার্মেন্টস, শিক্ষা ও জনশক্তি রপ্তানিতে অসাধারণ উন্নয়ন ঘটেছে। তা ছাড়া বিদ্যুৎ, গ্যাস ও যোগাযোগের ক্ষেত্রেও উন্নয়ন ঘটেছে। বিদেশিদের দৃষ্টিতে এ ধরনের হরতাল ক্যান্সারের চেয়েও মারাত্মক। গরিব মানুষ বলে, পেটে লাথি মারার হরতাল। রাজনৈতিক অস্থিরতাই বর্তমানে বড় সমস্যা, যার সমাধান রাজনৈতিক দলগুলোর মতানৈক্যের মাধ্যমেই সম্ভব। এ দেশের কৃষকসহ সাধারণ জনগণ এখন নির্বিকার। টক শোতে নিরপেক্ষ আলোচনার পাশাপাশি অনেকে দলের পক্ষে-বিপক্ষেও বলছেন। দল ও ব্যক্তিস্বার্থে কেউই এক বিন্দু ছাড় দিতে নারাজ। আজ যাঁদের বয়স সর্বনিম্ন ৫০ বছর তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার যোগ্য ছিলেন না বটে। কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের দ্বারা ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও মানুষ হত্যার দৃশ্য কমবেশি দেখেছেন। আজকের অগ্নিসংযোগের ধরন, মানুষ হত্যা, লুটপাট—সবই সেই ১৯৭১ সালের অনুরূপ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই দেখা যাচ্ছে, কয়েকটি নির্বাচন ছাড়া প্রায় সব নির্বাচনই ভেজালমুক্ত হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে বিগত সাড়ে চার বছরে সদ্য সমাপ্ত চারটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনসহ প্রায় পাঁচ হাজার ৬৮৯টি বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন হয়েছে, যার বেশির ভাগই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। গণতন্ত্রের মূল মন্ত্রও এটাই—জনগণ স্বাধীনভাবে ভোট দেবে, যাকে ইচ্ছা তাকে দেবে। বিস্ময়কর ঘটনা হলো পরাজিত প্রতিপক্ষও নির্বাচনকে সুষ্ঠু বলেছেন, মেনে নিয়েছেন, এমনকি ঘাড়ে হাত রেখে মিষ্টিও খেয়েছেন, যা বিগত ৪২ বছরের সব ঘটনাকে হার মানিয়েছে। মানুষ আজ আশার আলো দেখছে, অবাকও হচ্ছে। এ কালচার ধরে রাখতে হবে ভবিষ্যতের জন্য। আমরা আশা করছি, আগামী সংসদ নির্বাচনও সুষ্ঠু হবে। আমি নিজেও ১৯৮৩ সাল থেকে প্রায় সব নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছি। ২০০৮ সালের নির্বাচনেও ছিলাম। আমার কেন্দ্রটির ভোটগ্রহণ শতভাগ নির্ভেজাল হলেও জামায়াতের একজন নেতা আমাকে চার্জ করে বললেন, নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে, ভোটগ্রহণ বন্ধ করুন। আমি বললাম, ভাই, নির্বাচন শতভাগ সঠিক হয়েছে। পরাজয়ের আভাস পেয়েই তারা ভোট বাক্স ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য প্রায় ৫০ জন জড়ো হতে না হতেই আমি এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করি। ছেলেমেয়েদের তথা নতুন প্রজন্মের জন্য স্বচ্ছ ও ভেজালমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে থাকবে না মারামারি, হানাহানি। সুস্থ মন নিয়ে সুস্থ চিন্তার প্রতিফলন ঘটুক। এটাই হোক দলমত নির্বিশেষে সবার চিন্তাচেতনা। সবার বিবেকই হোক সব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আদালত।

লেখক : অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
fhoque.hstu@gmail.com

কালের কণ্ঠ

মওদুদীবাদ ইসলাম সম্পর্কে মনগড়া ব্যাখ্যা

ডা. মোঃ ফজলুল হক

তারিখ ৮ অক্টোবর/২০১০ ইং, পৃষ্ঠা- ১৭

বর্তমান জামানায় জামায়াতে ইমলামী নামের রাজনৈতিক সংগঠনের মুল তাত্ত্বিক ও প্রতিষ্ঠাকালীন নীতিনির্ধারক, মাওলানা মওদুদী নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোরআন ও হাদিসের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে হাজার হাজার সহজ-সরল ধর্মপ্রাণ মানুষকে যুগ যুগ ধরে বিভ্রান্ত করার একটি দ্বার খুলেছেন। এই ভ্রান্ত দ্বারের স্বরূপ সাধারণ মানুষের কাছে উন্মোচনের জন্যই আমার এ লেখা। উপমহাদেশের খ্যাতনামা উলামাদের প্রায় সবাই মওদুদী সাহেবের চিন্তাধারায় যেসব মারাত্মক ভুল-ভ্রান্তি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে, প্রথমে তা মওদুদী ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের বিভিন্নভাবে অবহিত করে সেগুলো প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করতে বলেছেন। কিন্তু দেখা গেল, মওদুদী বা জামায়াতের নেতারা তা প্রত্যাহার করার পরিবর্তে দলের স্বার্থে বাড়তি কিছু বিভ্রান্তি যোগ করে ক্রমাগত তা প্রতিষ্ঠিত করতেই অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তখন মুসলিম জনসাধারণকে গোমরাহি থেকে বাঁচানোর স্বার্থে উলামায়ে কেরাম মওদুদী সাহেবের মৌলিক ভুলগুলো সুদৃঢ় প্রমাণসহ মুসলিম উম্মাহর সামনে তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি মওদুদীর প্রাথমিক পর্যায়ের তুলনামূলক ভ্রান্তিমূলক রচনা-প্রবন্ধ ইত্যাদি দেখে বিদগ্ধ উলামায়ে কেরাম ও ইসলামী বুদ্ধিজীবীরা জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠালগ্নে মওদুদীকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। অতঃপর মওদুদীর ক্রমশ ভুল পথে চলতে থাকা দেখে তাঁকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। মওদুদীর ভুল বুঝতে পেরে ওই সময় জামায়াতের উচ্চপদস্থ নেতারা একে একে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে জামায়াত থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাঁরা হলেন-নায়েবে আমির মাওলানা মনজুর নো'মানী সেক্রেটারি কমরুদ্দীন বেনারসী (এমএ), মজলিসে শূরার অন্যতম সদস্য হাকিম আ. রহীম আশরাফী ও মাওলানা আমীর আহসান এসলাহী, বিশ্ববরেণ্য দাঈয়ে ইসলাম মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী। জামায়াতের অন্যতম রুকন ও মওদুদীর জন্য নিবেদিতপ্রাণ ডক্টর এসরার আহমাদ প্রমুখ প্রথমসারির প্রায় আরো ৭০ জন জামায়াতে ইসলামীর নেতা দল থেকে পদত্যাগ করেন (ফাতাহওয়ায়ে রাহমানিয়া প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৯)। এ থেকে বোঝা যায়, জামায়াতে ইসলামী একটি অনৈসলামিক ও ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক দল। মওদুদী নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং নিজের জ্ঞান জাহির করার জন্য ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠালগ্নে যে সাহাবায়ে কেরামরা জীবনপণ চেষ্টা করে শহীদ হয়েছেন, যাঁদের ব্যাপারে আল্লাহপাক রাজি হয়েছেন। তাঁদের ব্যাপারেই দোষচর্চা করে নিজের ভবিষ্যৎ পরকালের জন্য কতটা ক্ষতি করেছেন এবং তাঁর তৈরিকৃত পার্টি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও এর অঙ্গসংগঠনের সদস্যদের কতইনা ক্ষতি করেছেন, নিরপেক্ষভাবে তা একটু ভেবে দেখুন। আল্লাহ তায়ালা ইসলামের দুশমনদের যাবতীয় চক্রান্তের সব আশাকে নিরাশ করে ঘোষণা দিলেন- আমিই এ স্মারকলিপিকে (কোরআন) অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই ইহার হেফাজতের ভার গ্রহণ করিয়াছি। কাজেই ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র যতই সুদূরপ্রসারী হোক না কেন, আল্লাহর হেফাজতের মোকাবিলায় সব চক্রান্তই ধূলিসাৎ হইয়া যাইতে বাধ্য। ইসলামের সহিত শত্রুতা করিয়া নিজের কপাল পোড়ানো ছাড়া অন্য কিছুই লাভ করিবার নাই (আল-কোরআন)।

মওদুদী ফেতনা থেকে আমাদের নিজেকে বাঁচতে হবে, মনে রাখতে হবে-তাঁর ভ্রান্ত মতবাদের কারণে ইমানহারা হয়ে মৃত্যুবরণ করে পরকালের কঠিন আজাবে গ্রেপ্তার হলে কেউই দায়-দায়িত্ব নেবেন না। তাই সময় থাকতে মেধা ও জ্ঞান দ্বারা চিন্তার প্রতিফলনের জন্য বিশেষ করে সহজ ও সংক্ষেপে বোঝার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। এ ক্ষেত্রে হজরত মাওলানা শামছুল হক (রহঃ)-এর ভুল সংশোধন বইটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইদের কমপক্ষে একবার পড়া অতীব জরুরী। মওদুদী সাহেবের ফেতনা তথা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ফেতনা থেকে নিজেকে রক্ষার্থে বইগুলো পড়ুন- (১) মাওলানা মনসুর নো'মানী লিখিত মওদুদী সাহেবের সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত, (২) শাইখুল হাদিস যাকারিয়া (রহঃ)-এর ফিতনায়ে মওদুদীয়্যাত, (৩) বিশ্ববরেণ্য আলেম ও ইসলামী দার্শনিক জাস্টিস মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ তকী উসমানীর 'হযরত মুয়াবিয়া আওর তারিখ-ই-হাক্কায়েক-এর বাংলা অনুবাদ ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুআবিয়া'। সবশেষে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, যেহেতু বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মূল আকিদা ইসলামবিরোধী। সুতরাং ওই দল কর্তৃক পরিচালিত ব্যাংক, জাকাত ফান্ডসহ যাবতীয় প্রতিষ্টানে আর্থিক লেনদেন ইসলামসম্মত কি না? সঠিক মাসয়ালা সম্মানিত হক্কানি মুফতি আলেম সাহেবদের কাছ থেকে জেনে নিন। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে ইসলামের সঠিক পথে চলার ও আমল করার তওফিক দান করুন।

লেখক ডা. মো. ফজলুল হক
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান
মেডিসিন, সার্জারী এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

www.kalerkantho.com

কালের কণ্ঠ

১৪

৯ জুলাই ২০১৩, মঙ্গলবার

সম্পাদকীয়

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

মাদকের ছোবল থেকে রক্ষা করুন

অর্থনৈতিক উন্নতি যত হচ্ছে ততই মানুষের চাহিদা বাড়ছে বিভিন্ন দিক থেকে। মাদকাসক্তির কারণে চারিত্রিক অবক্ষয়ও হচ্ছে এক শ্রেণীর মানুষের। কতিপয় অধিক ধনী ও অতি দরিদ্র শ্রেণীই এ বিষয়ে জড়িয়ে পড়ছে বেশি। ধনী শ্রেণীটি টাকার গরমে এবং দরিদ্র শ্রেণীটি হতাশা, অভাব, অনটন ইত্যাদির দরুণ। মাদকাসক্তির কারণে মানুষ তার সাধারণ মনুষ্যত্ব বোধ, লজ্জা, ভয়, সামাজিকতা সব কিছুই হারিয়ে ফেলছে। এমনকি চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানিসহ বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও অশান্তিতে রয়েছে। এমনও শোনা যায়, মা-বাবাও তাঁর প্রিয় মাদকাসক্ত সন্তানটির জন্য মৃত্যু কামনা করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে জীবন হচ্ছে দুর্বিষহ। ইচ্ছা থাকলেও সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারছে না। এমনকি সে হয়ে ওঠে বিবেকহীন পশুর মতোই। মা-বাবা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, কেউই তার হিংস্রতা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। উল্লেখ্য, প্রত্যেক আদম সন্তানই জন্মগ্রহণ করে নিষ্পাপ শিশুরূপে। কাদা মাটির মতোই তার মন। ভালো পরিবেশ ও শিক্ষা তাকে মঙ্গলের দিকে নিয়ে যায় এবং খারাপ পরিবেশ ও কুশিক্ষা তাকে খারাপের দিকে নিয়ে জীবনটাই শূন্যের কোটায় পৌঁছে দেয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে একজন হাক্কানি আলেমই ধর্মের সঠিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে সন্ধান দিতে পারেন সঠিক পথের। প্রতি ওয়াক্ত বিশেষ করে জুমার নামাজে খুতবার আগে জ্ঞানগর্ভ ধর্মীয় বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক মানুষ প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ করে থাকে মা-বাবা ও ভাইবোনদের কাছ থেকে। সঠিক শিক্ষা পায় মাদ্রাসা, মক্তব, প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলী থেকে। তবে মসজিদের ইমাম সাহেবদের গুরুত্ব সবার উর্ধ্বে যদি তিনি হন সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হাক্কানি আলেম। তাঁর দায়িত্ব দল-মত-নির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষের ওপর। তাঁর সঠিক দিকনির্দেশনাই একজন মানুষের জীবনের মোড় ঘুরে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যায়। এ লক্ষ্য সামনে রেখে ২২ মার্চ ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। দেশ ও জাতি গঠনে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামরা মসজিদের ইমামতির পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করা। এর মধ্যে দীনি দাওয়াতের স্থান সর্বোচ্চে যার মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করা সম্ভব। আজ সঠিক দীনি এলেমের অভাবে মানুষ বিভিন্নভাবে ভুল পথে পরিচালিত ও প্রতারিত হচ্ছে। প্রশিক্ষিত ইমামরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে ইমামতির পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞানদানের মাধ্যমে সমাজের মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, ইভ টিজিং, যৌতুক, মাদকাসক্তি ও ঘাতক ব্যাধি এইডস ইত্যাদি প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখতে পারেন। ভয়াবহ মাদকের ছোবল থেকে নতুন প্রজন্মকে বাঁচাতে আমাদের সবাইকে দল-মত নির্বিশেষে এগিয়ে আসতে হবে। মাদকের অপব্যবহার মানুষের মেধা ও মনকে শেষ করে দেয়, বিনষ্ট করে সুস্থ প্রতিভা ও সুস্থ চিন্তা। মাদক গ্রহণের ফলে শরীরের স্নায়বিক ভারসাম্য ভেঙে পড়ে। মাদকাসক্তের প্রধান ধাপ হচ্ছে ধূমপান করা, মাদকাসক্তদের সঙ্গে সঙ্গ দেওয়া, ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব, বেকারত্ব ও হতাশাগ্রস্ত, মাদকদ্রব্যের সহজ প্রাপ্যতা, অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন (ঘুষ, দুর্নীতি), অল্প বয়সে বেশি টাকা খরচের সুযোগ পাওয়া ইত্যাদি। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে ১৮ বছরের ওপর ০.৬৩ শতাংশ মানুষ মাদকাসক্ত। মাদকাসক্তের মধ্যে ৮৫ শতাংশের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। ২০০৬ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জরিপে মাদকাসক্তের সংখ্যা ৪৬ লাখের বেশি। এদের মধ্যে প্রায় ৯১ শতাংশ কিশোর ও যুবক, নারীর সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ। প্রতি বছর মাদকের পেছনে অপচয় হয় প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত যেমন–চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি। ইয়াবা এতই ভয়াবহ যে সমাজ রক্ষার জন্য থাইল্যান্ড সরকার তিন হাজারেরও বেশি ইয়াবা বিক্রেতা ও সেবীকে ক্রসফায়ারে মৃত্যুদণ্ড দেয়। মালয়েশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডা. মাহাথির মোহাম্মদের শাসনামলে মাদক ব্যবসায়ীদের সরাসরি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বর্তমান বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ লোক মারা যায় ধূমপানজনিত ক্যান্সারে। রাজধানী ঢাকাকে ট্রানজিট রুটের মূল পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের মাদক ব্যবসায়ীদের একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট। যারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মাদক ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় ভারত, মিয়ানমার, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশ থেকে মাদকদ্রব্য সংগ্রহ করে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, নাইজেরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে সরবরাহ করে থাকে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক 'ড্রাগস ইনফরমেশন'-এর ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, ইয়াবা হেরোইনের চেয়ে ভয়াবহ ও আত্মঘাতী। চিকিৎসকদের মতে, ইয়াবা সেবনে যেকোনো সময় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে মৃত্যুবরণ অবধারিত। মাদক, ইয়াবা সেবনকারীর প্রাথমিক উপসর্গ যেমন অধিক বেলায় ঘুম থেকে ওঠা, চড়া মেজাজ, টাকা চেয়ে না পেয়ে আসবাব ভাঙচুর, রাতজাগা ও ক্ষুধামন্দা ইত্যাদি। পরবর্তী সময়ে মাদকসেবী কিডনি, লিভার ও ফুসফুস বিকল হয়ে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। যেহেতু মাদক একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা, আন্তর্জাতিকভাবে এর উৎপাদন ও অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে। আন্তর্জাতিক মাফিয়ারা দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম ও মংলাবন্দর এবং শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে মাদক পাচারের নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহার করছে। এ ছাড়া তাদের ব্যবহৃত রুটের মধ্যে কুমিল্লা-চান্দিনা, আখাউড়া রেলওয়ে জংশন, বেনাপোল স্থলবন্দর, শেরপুর সীমান্তপথ, সাতক্ষীরা, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার সীমান্তপথ, বুড়িমারী-বাংলাবান্ধা-হিলি বন্দর, দিনাজপুর সীমান্তপথ, টেকনাফ, উখিয়া ও কক্সবাজার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোয়েন্দা সংস্থার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকা নগরীর ১১০টি বস্তি মাদক বিক্রেতা, সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের অভয়ারণ্য। এরা বিভিন্ন অপকর্ম ও বেআইনি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

গোয়েন্দা সংস্থার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকা নগরীর ১১০টি বস্তি মাদক বিক্রেতা, সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের অভয়ারণ্য। এরাই নগরীর বিভিন্ন অপকর্ম ও বেআইনি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিঘ্ন ঘটাচ্ছে

লেখক : অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
fhoque.hstu@gmail.com

কালের কণ্ঠ

সোমবার। ২৫ আগস্ট ২০১৪। ১০ ভাদ্র ১৪২১

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

নৌ দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলতে যা প্রয়োজন

এক হিসাবে দেখা যায়, প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৪০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এত লঞ্চ দুর্ঘটনা ও শত শত যাত্রীর অকালমৃত্যুতে লঞ্চ কর্তৃপক্ষ বা মালিকদের মনে যৎসামান্য পরিবর্তন আসবে কি? ইচ্ছাকৃত বা অবহেলার কারণে যাত্রীর মৃত্যু হত্যারই অনুরূপ। সঠিক আইন ও তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। লঞ্চ দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব দিলে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব

আজ থেকে ৩০ বছর আগে যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম ছিল নৌপথ। পালের নৌকাই বেশি ব্যবহার হতো। মাঝেমধ্যে গাজী নামে বড় আকারের স্টিমার, লঞ্চ ও মালবাহী কার্গো নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা বা ঢাকার সদরঘাট থেকে ফরিদপুরের গোয়ালন্দসহ দেশের বিভিন্ন রুটের উদ্দেশে যাতায়াত করত। এ স্টিমারটি (গাজী) এখনো চলতে দেখা যায় ঢাকা-বরিশাল-খুলনা রুটে। স্টিমারটির বয়স প্রায় ৭০ বছর হলেও বর্তমানের যেকোনো নতুন লঞ্চ বা স্টিমারের চেয়েও অনেক শক্তিশালী। দুটি হুইল বা পাখার ওপর ভর করে চলে। স্টিমারটি দ্রুত গতিতে চলার কারণে প্রতিবছর প্রায় কয়েক ডজন ছোট ইলিশ মাছ ধরার নৌকা পদ্মায় ডুবে যেত। কিন্তু সাঁতার জানার কারণে প্রাণহানির ঘটনা তেমনটা শোনা যেত না। ওই সময় বড় আয়তনের যাত্রীবাহী ও মালামাল নিয়ে লঞ্চ ও লঞ্চসদৃশ কার্গো যাতায়াত করত। সদরঘাট ও নারায়ণগঞ্জ থেকে ফরিদপুরের টেপাখোলা ও গোয়ালন্দ (দৌলতদিয়া) ঘাট পর্যন্ত যাতায়াত করত। বর্ষাকালে দুর্ঘটনা এড়াতে ঢাকার সদরঘাট থেকে মুন্সীগঞ্জের তালতলা খাল দিয়ে পদ্মা নদীতে প্রবেশ করত। লৌহজং ও জশিলদা ঘাট ধরে সোজা চলতে থাকত পশ্চিম তীরের দিকে। অনেক কষ্টে মাদারীপুরের মাতব্বরের চরঘাট ও পেঁয়াজখালী স্টেশন ধরে সদরপুর উপজেলার পাশ কাটিয়ে সোজা চলে যেত ফরিদপুরের টেপাখোলায়। বর্ষাকালে ছোট ছোট শাখা নদীর মধ্য দিয়ে যাতায়াতের কারণে এবং বড় আয়তনের লঞ্চ হওয়ায় দুর্ঘটনা তেমনটা হতো না। ওই সময় পেশাদার ড্রাইভার বা সারেং ছাড়া লঞ্চ চালানোর দায়িত্ব কাউকেও দেওয়া হতো না। সে সময় প্রায় শতভাগ মানুষই সাঁতার কাটতে জানার কারণে লঞ্চ ও নৌকা দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা খুব একটা শোনা যেত না। মোদ্দা কথা হলো, জীবনের জন্য শিক্ষা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সাঁতার শেখা সবার জন্য বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। নদীর তীরবর্তী এলাকার মানুষ অত্যন্ত সাহসী। সাঁতার কাটতে জানে। নদীভাঙনের হিংস্রাত্মক ও ধ্বংসাত্মক দৃশ্য জীবনভর অবলোকন করার সুযোগ পেয়েছে। নদীর তীরবর্তী বাসিন্দাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নদীভাঙনের হিংস্র থাবা থেকে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয় প্রতিনিয়ত। ফরিদপুরের একটি প্রবাদ আছে, পদ্মা নদীতে ভাঙন লাগলে তেজি ঘোড়াও দৌড়িয়ে সারতে পারে না। এক মাসে এক থেকে দেড় কিলোমিটার এলাকাও নদীতে চলে যেতে দেখেছি। আমিও পদ্মার তীর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে ছোটবেলা থেকে বেড়ে উঠেছি। ১০০ ফুট গভীর থেকে ইলিশ মাছ কিভাবে ধরতে হয় সেটিও জানি। অনেক ঘটনায় মানুষের লাশ ভেসে যাওয়ার চিত্রও মনে দাগ কাটে। পাকিস্তান আমলে পদ্মা নদীর প্রস্থ ছিল সাত-আট মাইল। নদীর গভীরতাও ছিল প্রায় ১৫০-২০০ ফুট। সে কারণে ইলিশ মাছ ধরার দড়ির দৈর্ঘ্যও হতো প্রায় ১৫০ ফুট থেকে ২১০ ফুট। বর্তমানে নাব্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ছোট-বড় বালুর চর জেগে ওঠায় শীতকালে নদীর হিংস্রতা বোঝাই যায় না। তবে বর্ষাকালে হিংস্র সিংহের মতো স্রোতের শাঁই শাঁই শব্দ এবং ঢেউয়ের গর্জনে শিউরে ওঠে অনেকেই। ওই সময় মাঝেমধ্যে মাছ ধরা নৌকা ডুবলেও নৌকা হারিয়ে যেত কিন্তু মানুষের তেমন ক্ষতি হতো না। কারণ দক্ষ সাঁতার জানা লোকেরাই নদীতে যাতায়াত করত। আমি নিজেও নৌকাডুবির ঘটনায় প্রত্যক্ষ সহচর। প্রায় এক কিলোমিটার স্রোতের অনুকূলে গিয়ে তীরে উঠতে সক্ষম হয়েছি। লঞ্চডুবির ঘটনাও তেমনটা হতো না। কারণ বড় বড় লঞ্চ ও স্টিমার ছাড়া যাতায়াতে সাহস কেউ করত না। মাত্রাতিরিক্ত যাত্রী বহন করার প্রশ্নই ওঠে না। বর্তমানে প্রায়ই লঞ্চডুবিতে প্রাণহানি ঘটছে। লঞ্চ মালিকরা যাত্রীদের মানুষই মনে করে না। আইনকানুন মেনে চলে না। তাদের কাছে টাকাই আসল। যাত্রীদের মৃত্যুতে লঞ্চ মালিকদের কিছুই যায়-আসে না। গত ৪ আগস্ট মাদারীপুরের কাওড়াকান্দি থেকে মাওয়ার উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া পিনাক-৬ লঞ্চটি পদ্মায় ডুবে যাওয়ায় হৃদয়বিদারক ঘটনার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন তথ্যে জানা যায়, ওই লঞ্চের প্রকৃত ধারণক্ষমতা মাত্র ৮৫ জন। অথচ যাত্রী ছিল প্রায় ৩০০ জন। উল্লেখ্য, প্রায় সবাই ঈদের আনন্দ শেষ করে কর্মস্থলে যাচ্ছিল। নারী-পুরুষের পাশাপাশি শিশু-কিশোরের সংখ্যাও কম ছিল না। তাদের অনেকে এমন রয়েছে, যাদের পরিবারের সব সদস্যই যাত্রী হয়ে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে যাচ্ছিল। যারা নিখোঁজ তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০১২ সালে মেঘনায় এমভি শরিয়তপুর-১ লঞ্চডুবিতে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৮৭ জন। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, গত ২০ বছরে মোট ৬৫৮টি ছোট-বড় দুর্ঘটনায় প্রায় সাত হাজার যাত্রীর মৃত্যু হয়। পরিবারের সবাই মারা গেছে এমন পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৩৯৩টি এবং উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে উদ্বাস্তু হয়েছে প্রায় ৬৫৬টি পরিবার। ২০০৩ সালে ৬৪টি দুর্ঘটনায় প্রায় এক হাজার ২৫০ জনের মৃত্যু হয়। এক হিসাবে দেখা যায়, প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৪০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এত লঞ্চ দুর্ঘটনা ও শত শত যাত্রীর অকালমৃত্যুতে লঞ্চ কর্তৃপক্ষ বা মালিকদের মনে যৎসামান্য পরিবর্তন আসবে কি? ইচ্ছাকৃত বা অবহেলার কারণে যাত্রীর মৃত্যু হত্যারই অনুরূপ। সঠিক আইন ও তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। লঞ্চ দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব দিলে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। যেমন—১. ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী বহন না করা, ২. দক্ষ সারেং বা মাঝি অথবা ড্রাইভার দ্বারা লঞ্চ চালানো, ৩. আবহাওয়ার পূর্বাভাসের প্রতি লক্ষ রাখা, ৪. ঝড়বৃষ্টি ও নদীর ঢেউয়ের ক্ষিপ্ততা বুঝে লঞ্চ ছাড়া, ৫. লঞ্চ রেলিং বা ঢেউয়ের তালে দোল খেলে ওপরের তলায় অতিরিক্ত যাত্রীর ওঠানামা ও দৌড়াদৌড়ি থেকে বিরত রাখা, ৬. প্রত্যেক যাত্রীর জন্য সাঁতারকাটা জ্যাকেট বা বয়ার ব্যবস্থা রাখা, ৭. লঞ্চের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিধিমোতাবেক হওয়া, ৮. প্রতিটি লঞ্চে কমপক্ষে দুটি ইঞ্জিনের ব্যবস্থা রাখা, যাতে একটি বিকল হলে অন্যটি দ্বারা চালিয়ে গন্তব্যে পৌঁছানো যায়, ৯. বর্ষা মৌসুমে ছোট লঞ্চ চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করা, ১০. সবার জন্য সাঁতার শেখা বাধ্যতামূলক এবং শিশু ও মহিলাদের ফেরি পারাপারকে প্রাধান্য দেওয়া, ১১. মালিকপক্ষের ভুলের কারণে মৃত্যুর জন্য সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রাখা, ১২. চুক্তি লঞ্চ বা স্টিমারের অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে প্রত্যেকটি লঞ্চের সর্বোচ্চ ছাদে একটি করে গোলাকার প্লাস্টিকের বড় বয়লার বা বলের সঙ্গে মেটালিক তার বা নাইলন দড়ি বেঁধে রাখা। তার বা দড়িটি ২০০-৩০০ ফুট লম্বা হতে হবে। লঞ্চ ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই গোলাকার প্লাস্টিকের বলটি ভেসে থেকেই চুক্তি যানবাহনটির অবস্থান নির্ণয় করবে। এটি হতে পারে সহজ উপায়। এ নিয়মটি অনুসরণ করলে চুক্তি লঞ্চটি ওঠানোর জন্য এত হয়রানি ও অর্থকড়ি খরচের প্রয়োজন হবে না। ভবিষ্যতে এ নিয়মটি অনুসরণ করার জন্য লঞ্চ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যেন আর একটিও না ঘটে সে বিষয়ে তৎপর হতে হবে এ মুহূর্তেই। সচেতন হতে হবে মালিক, যাত্রী সবাইকে।

লেখক : প্রফেসর, হাজী মোহাম্মদ দানেশ
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

ভূমি ক্ষয়ে জলাশয়ের নাব্যতা হ্রাস ও তার প্রভাব

প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হক

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, আফগানিস্থান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভূটান নিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চল গঠিত । ভূমি ক্ষয়ের কারণে এ অঞ্চলে বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা এ অঞ্চলের মোট আয়ের ২ শতাংশ বা মোট কৃষি আয়ের ৭ শতাংশ। ভূমি ক্ষয়ের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে পানি ও বাতাস। পানির মাধ্যমে ভূমি ক্ষয়ের কারণে ক্ষতির পরিমাণ ৮৮ মিলিয়ন হেক্টর জমি অথবা ২৫ শতাংশ কৃষি জমি। শুষ্ক মৌসুমে বাতাসের দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ ৫৯ মিলিয়ন হেক্টর জমি বা ৪০ শতাংশ কৃষি জমি। নেপালে ভূমি ক্ষয়ের কারণে কৃষি জমির উর্বরতা শক্তি স্থায়ীভাবে হ্রাস পায়। জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাওয়ার বিভিন্ন কারণ যেমন ভূমি ক্ষয় ও কৃত্রিম সার ব্যবহার ইত্যাদি। এ কারনে ৬৩ শতাংশ কৃষি জমি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ইরানে ৯৪ শতাংশ, বাংলাদেশে ৭৫ শতাংশ, পাকিস্তানে ৬১ শতাংশ, শ্রীলকায় ৪৪ শতাংশ, আফগানিস্থান ৩৩ শতাংশ, নেপালে ২৬ শতাংশ, ভারতে ২৫ শতাংশ, ভূটানে ১০ শতাংশ মাটির ক্ষয় প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপায়ে হয়ে থাকে।

প্রাকৃতিক উপায়ে ক্ষয়ের মাধ্যম হচ্ছে বাতাস, বৃষ্টির পানি বা নদী ভাঙ্গন বা স্রোতের মাধ্যমে। কৃত্রিম উপায়ে, যেমনঃ ইট তৈরী রাস্তাঘাট তৈরী ও মেরামতের পাহাড় কাটার মাধ্যমে ক্ষয়কৃত মাটি। গভীর নলকূপের পানি সেচ দেওয়ার কারণে পানির লেভেল নীচে নেমে যাওয়ায় জমিতে লবনাক্ততা বৃদ্ধিতে জমির উর্বর শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। পানি উত্তোলনের কারণে ভূমি ধ্বস হতে পারে। বৈচিত্র্যময় মাটি যেমন; পলি, কাদা, বালু, দো-আঁশ, পাথর সহ বিভিন্ন মাটির দ্বারা স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত হয়ে তৈরী হয়েছে ভূমন্ডল। মাটি ও পানি হতে জীব ও উদ্ভিদের সৃষ্টি। বিশেষ করে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। এ মাটির উপরেই সকল জীব বৈচিত্রের আবাসস্থল ও বেঁচে থাকার খাদ্য উৎপাদনের একমাত্র উৎস। এর বুকচিরে তৈরী হয়েছে সমুদ্র, লক্ষ লক্ষ পাহাড় পর্বত, নদনদী, খালবিল ও এর শাখা প্রশাখা। যে নদীর গভীরতা যত বেশী সেখানে জলজ প্রাণির সংখ্যাও তত বেশী। বাংলাদেশের প্রথমদিকে প্রতিটি নদীর গভীরতা ছিল অনেক বেশী ফলে মাছের প্রজননের সুযোগও ছিল বেশী। মাছের আকার তুলনামূলক বড় ছিল যেমন পদ্মা নদীর ইলিশ মাছের গড় ওজন ছিল প্রায় ১-২ কেজি।

বর্তমানে বিভিন্ন কারণে নদীর নাব্যতা, চর পড়া বা ভরাট ইত্যাদির প্রধান কারণ হচ্ছে ভূমি ক্ষয়। নদীর গভীরতা কমায় বর্ষাকালে নদীর দুই তীর প্লাবিত হয়, নদী ভাঙ্গন বৃদ্ধি পাওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে বালুর প্রলেপ পড়া জমির শস্য উৎপাদন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হ্রাস পায়। সকল সমস্যার মূলকারণ ভূমি ক্ষয় ও নদী ভাঙ্গন। ১৯৬৫ সালের দিকে পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা নদীর গভীরতা ছিল গড়ে প্রায় ৭৫ হতে ১০০ ফুট। প্রস্থ প্রায় ৫-৮ কিলোমিটার। স্রোতের গতি বেগও ঘন্টায় প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার। লঞ্চ, ষ্টীমার, নৌকা ব্যবহার হত মালামাল ও যাত্রী পরিবহনে, ফলে কম খরচ ও যানজট ছিল প্রায় শূণ্যের কোঠায়। নদী ভরাট হওয়ার সাথে সাথে নদী পথের যাতায়াতের পথ হ্রাস পাচ্ছে ফলে মালামাল পরিবহন খরচ বৃদ্ধি, মাছের প্রজনন স্থল ধ্বংস, পরিবেশের ভারসাম্য ব্যহত হওয়াসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। উল্লেখ্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ভূমি ক্ষয়ের কারণে নদনদী ও সমুদ্রগুলোর মহনায় পলি পড়ে ভরাট হয়ে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে প্রায় পতি বছরই বন্যার আগমন ঘটে। ফলে মৌসুমি ফসল, রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ীর মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। এ সময়ে নদী ভাঙ্গন বৃদ্ধি পেয়ে নতুন চরাঞ্চল তৈরী হয়। এ ক্ষেত্রে ভাঙ্গন প্রবণ নদীর তীরবর্তী বাসিন্দার বাস্তভিটা হারিয়ে নিঃস্ব হওয়ার পরোক্ষ কারণ হচ্ছে ক্রমাগত ভূমি ক্ষয়। প্রাকৃতিক সম্পদের সমন্বয়ে মাটি জীবন ফিরে পায়। সজীব হয় উদ্ভিদ, ফলমূলে ভরপুর হয় বনজঙ্গল, খাদ্যের যোগান দেয় মানুষসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণিকূলের। সভ্যতা গড়ে উঠে পাহাড় ও সমতল ভূমিতে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের প্রয়োজনীয় উপকরণের কাঁচামাল সরবরাহ হয় উর্বর জমি হতে। কোন কারণে জমি বা মাটির গুনগত মান কমলে, শস্য উৎপাদন ব্যহত হয় ফলে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। অর্থনীতিতে ভাটা পড়ার সাথে সাথে উন্নয়নের গতি হ্রাস পায়। সকল ক্ষেত্রেই ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়।

নদ-নদী ভরাটের কারণে পানির প্রাপ্যতা হ্রাস সহ মৎস্য উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছে। ভূমি ক্ষয়ের কারণে ড্রেনেজ সিস্টেম ব্যাহত হয়ে পরিবেশের ভারসম্য নষ্ট হওয়ায় মানুষসহ সকল প্রাণির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। বিজ্ঞানীদের কৃষি বিষয়ক গবেষণা ব্যাহত হবে। স্থলভাগের উচ্চতা কমে যাওয়ায় সমুদ্রের লবণাক্ত পানি জমিতে প্রবেশ করে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের উর্বরা শক্তি হ্রাস ও মৎস্য চাষ ব্যহত হচ্ছে। বিগত ৬০-৭০ বছর পূর্বে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বৃক্ষ লতা এবং কাশ বনের কারণে মাটি কম ক্ষয় হত। বর্তমানে নদনদী, খাল বিল ও পুকুর গুলো ক্ষয়কৃত মাটি দ্বারা ভরাট হয়ে যাচ্ছে রাতারাতি। নদীর নব্যতার মূল কারণ হচ্ছে পদ্মা ও যমুনার উজানে বাঁধ। তাছাড়া বৃক্ষ নিধন এজন্য দায়ী কম নয়। নদীর শেষ আধার সমুদ্র। সমুদ্রের সংযোগ স্থলে পলিমাটি জমে স্রোতের তীব্রতা তুলনামূলক হ্রাস পাওয়ায় পলিমাটি জমে নদীর তলদেশের গভীরতা কমে যাচ্ছে। ফলে বর্ষার মৌশুমে হঠাৎ পানি বৃদ্ধির কারণে বন্যায় নদীর উভয় তীরের সমতল ভূমি প্লাবিত হয়ে ফসল নষ্টসহ মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসছে প্রায় প্রতি বছরই। সমতলভূমি ক্ষয় হওয়ার কারণে সমুদ্রের পানি দ্বারা উপকূল এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। লবনাক্ত পানি মিঠা পানির সাথে মিশ্রিত হওয়াতে মিঠা পানির মাছ অগভীর পানিতে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে ফলে মাছের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস ও ব্যহত হচ্ছে। ভূমি ক্ষয়ের কারণে জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাওয়ায় কৃত্রিম সার ব্যবহারে কৃষক বাধ্য হচ্ছে। সুতরাং ক্ষয় রোধকল্পে প্রয়োজন নদনদী ও খালবিল সহ বিভিন্ন জলাশয়ের তীরে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ রোপণের উপর গুরুত্বারোপ একান্ত প্রয়োজন।

লেখক, অধ্যাপক
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর
ই-মেইলঃ fhoque.hstu@gmail.com
মোবাইল নং- ০১৭৫০০৯০৪৫৮

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

শান্তি প্রতিষ্ঠায় আইনের শাসন

আইন তৈরি হয় দেশ ও জনগণের স্বার্থে। আইন অবস্থান নেয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের পক্ষে। বাস্তবায়নে অবহেলা বা বিলম্ব হলে অপরাধ বাড়ে। যে দেশে আইনের ভিত যত শক্তিশালী ও মজবুত, সে দেশের মানুষ ততটাই সুখী, সমৃদ্ধিশালী ও সম্মানিত। গত কয়েক দশকে বিভিন্ন কারণে অপরাধপ্রবণতা ও দুর্নীতি বেড়েই চলছে। এর মূল কারণ, যথাসময়ে আইনের সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে কালক্ষেপণ। পত্রিকার একটি খবরে বলা হয়েছে, 'অভাব ঘোচাতে বিদেশে গিয়েও খুন ও ধর্ষণের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশের মানুষ।' এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, আমরা কোথায় আছি? যথাযথ আইন ও এর সঠিক বাস্তবায়নের দুর্বলতাই কি এর জন্য দায়ী নয়?

১৯৭১ সালে যাঁদের বয়স তিন-চার বছর বা পরে জন্মগ্রহণ করেছেন, স্বাধীনতাযুদ্ধের বিভীষিকাময় ঘটনা ও দৃশ্য দেখার সুযোগ তাঁদের হয়নি। একটি দেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন স্বাধীনতার পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষ থাকতেই পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে নিজ দেশ ও সমাজের মানুষকে হত্যা, লুট, অনৈতিক কাজ দ্বারা মহিলাদের অসম্মান করা, বেছে বেছে শিক্ষিত লোক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের হত্যা করা। এই অপরাধকারীরা কি ক্ষমা পেতে পারে? এ কারণেই বিচারাধীন ও বিচারকৃত রাজাকার, আলবদর ও আলশামসদের ঘৃণ্য কাজগুলো দেখার সৌভাগ্য না হওয়ায় বিচারকার্য প্রসঙ্গে অনেকেরই ধারণা এদিক-ওদিক ঘুরপাক খাচ্ছে। ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের গভীর রাতে রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসসহ একযোগে আক্রমণ চালায় পাকিস্তানের নরপশু সৈন্যরা। নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে কয়েক হাজার নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে। তাদের ভাষা উর্দু, সাঁতার কাটতে জানে না, রাস্তা ও বাসাবাড়ি চেনে না, তাদের শহর ও গ্রামগঞ্জে এনে হত্যা, ধর্ষণ, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটে যারা সহযোগিতা করেছে, তারাই রাজাকার, আলশামস ও আলবদরের সদস্য। তারাই যুদ্ধাপরাধী বা মানবতাবিরোধী অপরাধী। ওই সময়ে বর্তমানের বৃদ্ধ যুদ্ধাপরাধীদের বয়স ছিল ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। সে সময়ে তাদের হিংস্রতার দৃশ্য যারা দেখেছে, তাদের মনে অবশ্যই দাগ কেটেছে। বর্তমানে বৃদ্ধ হওয়ার কারণে অনেকেই আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল। এটি মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতি। সম্মানিত বিচারকরাও বৃদ্ধ বয়সের কারণে ফাঁসির পরিবর্তে আজীবন বা আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন; অথচ তারা একাধিক হত্যা ও ধর্ষণের আসামি। অথচ সে সময় তাদের আচরণ ছিল নরপশুর মতো হিংস্র। তারা নিজের সন্তান ও মা-বোনদের আড়াল করে রেখেছে বটে; কিন্তু স্বাধীনতার পক্ষের বাঙালি মা-বোনদের ইজ্জতের দিকে একটুও সম্মান দেখায়নি; বরং ওই অমানুষগুলো পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে তুলে দিয়ে বেইজ্জত করেছিল। গুলি করে গণকবরে মাটিচাপা দিয়েছিল। একই গর্তে নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমানসহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে পুঁতে রেখেছিল। তা ছাড়া নদীতে ভেসে গেছে লাখ লাখ মানুষের লাশ। শিয়াল-কুকুরের পেটে গেছে পবিত্র আত্মাবাহী শরীর। বাস্তবে এর চেয়েও অনেক অন্যায় করেছে তারা, যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের সেই লেলিহান দৃশ্য আজও মনে পড়ে। রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনীর সদস্যরা পাকিস্তানিদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে অগণিত মানুষ। সীমান্ত এলাকার হিন্দু-মুসলমান শরণার্থী ভাইবোনদের ভারতে প্রবেশের পথেও নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে। কোলের শিশু, অন্তঃসত্ত্বা মা-বোনরাও তাদের ছোবল থেকে রক্ষা পাননি। বিধবা পল্লীর বিধবা মা-বোনদের অন্তর্জ্বালা যে কত করুণ ও হৃদয়বিদারক তা কি আমরা একটুও ভেবে দেখেছি। পিতাহারা পুত্রকন্যারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অনেকে ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। এ হলো সেই সময়ের নরপশু—আজ যারা ফাঁসির আসামি। ১৯৭৫ সালে জেলখানায় প্রবেশ করে হত্যা করেছে চার নেতাকে, যাঁরা পেটে পাথর বেঁধে রাজনীতি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে হাল ধরেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময়। আজ এ বিষয়গুলো নতুন প্রজন্মকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে, ভাবতে হবে।

অন্যথায় দেশের চলমান উন্নয়নের গতি ব্যাহত হবে। দেশ আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে, সুষ্ঠু পরিবেশ পেলে আরো এগিয়ে যাবে। অসুষ্ঠু রাজনীতি তথা হরতাল-নাশকতায় ভেঙে পড়বে দেশের অর্থনীতি। চাড়া দিয়ে উঠবে জঙ্গিবাদ, জ্বলবে আগুন। জঙ্গিরা আজ ইসলামের সাইনবোর্ড লাগিয়ে একদিকে যেমন ইসলাম ধর্মের মানুষকে বিভিন্নভাবে সংশয়ের মধ্যে রাখার চেষ্টা করছে, তেমনি তারা নিজেরাও ইসলামের সঠিক পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাদের আর্থিক সহযোগিতা দিচ্ছে বিদেশি ইসলামের শত্রুপক্ষ। ইসলাম কোনো দিন জঙ্গিবাদে বিশ্বাসী নয়। এ কারণেই আজ যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির রায়ে সারা দেশের মানুষ আনন্দিত, উৎফুল্ল ও উজ্জীবিত। আজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। আইনের উর্ধ্বে কেউ নয়, এটিই স্বতঃসিদ্ধ। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এর সঠিক বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা দেওয়া সব নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব।

দেশ আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে, সুষ্ঠু পরিবেশ পেলে আরো এগিয়ে যাবে। অসুষ্ঠু রাজনীতি তথা হরতাল-নাশকতায় ভেঙে পড়বে দেশের অর্থনীতি। চাড়া দিয়ে উঠবে জঙ্গিবাদ, জ্বলবে আগুন। জঙ্গিরা আজ ইসলামের সাইনবোর্ড লাগিয়ে মানুষকে বিভিন্নভাবে সংশয়ের মধ্যে রাখার চেষ্টা করছে

লেখক : অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

ভূমি ক্ষয়ে জলাশয়ের নাব্যতা হ্রাস ও তার প্রভাব

প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হক

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, আফগানিস্থান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভূটান নিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চল গঠিত । ভূমি ক্ষয়ের কারণে এ অঞ্চলে বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা এ অঞ্চলের মোট আয়ের ২ শতাংশ বা মোট কৃষি আয়ের ৭ শতাংশ। ভূমি ক্ষয়ের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে পানি ও বাতাস। পানির মাধ্যমে ভূমি ক্ষয়ের কারণে ক্ষতির পরিমাণ ৮৮ মিলিয়ন হেক্টর জমি অথবা ২৫ শতাংশ কৃষি জমি। শুষ্ক মৌসুমে বাতাসের দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ ৫৯ মিলিয়ন হেক্টর জমি বা ৪০ শতাংশ কৃষি জমি। নেপালে ভূমি ক্ষয়ের কারণে কৃষি জমির উর্বরতা শক্তি স্থায়ীভাবে হ্রাস পায়। জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাওয়ার বিভিন্ন কারণ যেমন ভূমি ক্ষয় ও কৃত্রিম সার ব্যবহার ইত্যাদি। এ কারনে ৬৩ শতাংশ কৃষি জমি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ইরানে ৯৪ শতাংশ, বাংলাদেশে ৭৫ শতাংশ, পাকিস্তানে ৬১ শতাংশ, শ্রীলকায় ৪৪ শতাংশ, আফগানিস্থান ৩৩ শতাংশ, নেপালে ২৬ শতাংশ, ভারতে ২৫ শতাংশ, ভূটানে ১০ শতাংশ মাটির ক্ষয় প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপায়ে হয়ে থাকে।

প্রাকৃতিক উপায়ে ক্ষয়ের মাধ্যম হচ্ছে বাতাস, বৃষ্টির পানি বা নদী ভাঙ্গন বা স্রোতের মাধ্যমে। কৃত্রিম উপায়ে, যেমনঃ ইট তৈরী রাস্তাঘাট তৈরী ও মেরামতের পাহাড় কাটার মাধ্যমে ক্ষয়কৃত মাটি। গভীর নলকূপের পানি সেচ দেওয়ার কারণে পানির লেভেল নীচে নেমে যাওয়ায় জমিতে লবনাক্ততা বৃদ্ধিতে জমির উর্বর শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। পানি উত্তোলনের কারণে ভূমি ধ্বস হতে পারে। বৈচিত্র্যময় মাটি যেমন; পলি, কাদা, বালু, দো-আঁশ, পাথর সহ বিভিন্ন মাটির দ্বারা স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত হয়ে তৈরী হয়েছে ভূমন্ডল। মাটি ও পানি হতে জীব ও উদ্ভিদের সৃষ্টি। বিশেষ করে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। এ মাটির উপরেই সকল জীব বৈচিত্রের আবাসস্থল ও বেঁচে থাকার খাদ্য উৎপাদনের একমাত্র উৎস। এর বুকচিরে তৈরী হয়েছে সমুদ্র, লক্ষ লক্ষ পাহাড় পর্বত, নদনদী, খালবিল ও এর শাখা প্রশাখা। যে নদীর গভীরতা যত বেশী সেখানে জলজ প্রাণির সংখ্যাও তত বেশী। বাংলাদেশের প্রথমদিকে প্রতিটি নদীর গভীরতা ছিল অনেক বেশী ফলে মাছের প্রজননের সুযোগও ছিল বেশী। মাছের আকার তুলনামূলক বড় ছিল যেমন পদ্মা নদীর ইলিশ মাছের গড় ওজন ছিল প্রায় ১-২ কেজি।

বর্তমানে বিভিন্ন কারণে নদীর নাব্যতা, চর পড়া বা ভরাট ইত্যাদির প্রধান কারণ হচ্ছে ভূমি ক্ষয়। নদীর গভীরতা কমায় বর্ষাকালে নদীর দুই তীর প্লাবিত হয়, নদী ভাঙ্গন বৃদ্ধি পাওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে বালুর প্রলেপ পড়া জমির শস্য উৎপাদন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হ্রাস পায়। সকল সমস্যার মূলকারণ ভূমি ক্ষয় ও নদী ভাঙ্গন। ১৯৬৫ সালের দিকে পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা নদীর গভীরতা ছিল গড়ে প্রায় ৭৫ হতে ১০০ ফুট। প্রস্থ প্রায় ৫-৮ কিলোমিটার। স্রোতের গতি বেগও ঘন্টায় প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার। লঞ্চ, ষ্টীমার, নৌকা ব্যবহার হত মালামাল ও যাত্রী পরিবহনে, ফলে কম খরচ ও যানজট ছিল প্রায় শূণ্যের কোঠায়। নদী ভরাট হওয়ার সাথে সাথে নদী পথের যাতায়াতের পথ হ্রাস পাচ্ছে ফলে মালামাল পরিবহন খরচ বৃদ্ধি, মাছের প্রজনন স্থল ধ্বংস, পরিবেশের ভারসাম্য ব্যহত হওয়াসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। উল্লেখ্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ভূমি ক্ষয়ের কারণে নদনদী ও সমুদ্রগুলোর মহনায় পলি পড়ে ভরাট হয়ে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে প্রায় পতি বছরই বন্যার আগমন ঘটে। ফলে মৌসুমি ফসল, রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ীর মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। এ সময়ে নদী ভাঙ্গন বৃদ্ধি পেয়ে নতুন চরাঞ্চল তৈরী হয়। এ ক্ষেত্রে ভাঙ্গন প্রবণ নদীর তীরবর্তী বাসিন্দার বাস্তভিটা হারিয়ে নিঃস্ব হওয়ার পরোক্ষ কারণ হচ্ছে ক্রমাগত ভূমি ক্ষয়। প্রাকৃতিক সম্পদের সমন্বয়ে মাটি জীবন ফিরে পায়। সজীব হয় উদ্ভিদ, ফলমূলে ভরপুর হয় বনজঙ্গল, খাদ্যের যোগান দেয় মানুষসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণিকূলের। সভ্যতা গড়ে উঠে পাহাড় ও সমতল ভূমিতে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের প্রয়োজনীয় উপকরণের কাঁচামাল সরবরাহ হয় উর্বর জমি হতে। কোন কারণে জমি বা মাটির গুনগত মান কমলে, শস্য উৎপাদন ব্যহত হয় ফলে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। অর্থনীতিতে ভাটা পড়ার সাথে সাথে উন্নয়নের গতি হ্রাস পায়। সকল ক্ষেত্রেই ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়।

নদ-নদী ভরাটের কারণে পানির প্রাপ্যতা হ্রাস সহ মৎস্য উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছে। ভূমি ক্ষয়ের কারণে ড্রেনেজ সিস্টেম ব্যাহত হয়ে পরিবেশের ভারসম্য নষ্ট হওয়ায় মানুষসহ সকল প্রাণির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। বিজ্ঞানীদের কৃষি বিষয়ক গবেষণা ব্যাহত হবে। স্থলভাগের উচ্চতা কমে যাওয়ায় সমুদ্রের লবণাক্ত পানি জমিতে প্রবেশ করে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের উর্বরা শক্তি হ্রাস ও মৎস্য চাষ ব্যহত হচ্ছে। বিগত ৬০-৭০ বছর পূর্বে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বৃক্ষ লতা এবং কাশ বনের কারণে মাটি কম ক্ষয় হত। বর্তমানে নদনদী, খাল বিল ও পুকুর গুলো ক্ষয়কৃত মাটি দ্বারা ভরাট হয়ে যাচ্ছে রাতারাতি। নদীর নব্যতার মূল কারণ হচ্ছে পদ্মা ও যমুনার উজানে বাঁধ। তাছাড়া বৃক্ষ নিধন এজন্য দায়ী কম নয়। নদীর শেষ আধার সমুদ্র। সমুদ্রের সংযোগ স্থলে পলিমাটি জমে স্রোতের তীব্রতা তুলনামূলক হ্রাস পাওয়ায় পলিমাটি জমে নদীর তলদেশের গভীরতা কমে যাচ্ছে। ফলে বর্ষার মৌশুমে হঠাৎ পানি বৃদ্ধির কারণে বন্যায় নদীর উভয় তীরের সমতল ভূমি প্লাবিত হয়ে ফসল নষ্টসহ মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসছে প্রায় প্রতি বছরই। সমতলভূমি ক্ষয় হওয়ার কারণে সমুদ্রের পানি দ্বারা উপকূল এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। লবনাক্ত পানি মিঠা পানির সাথে মিশ্রিত হওয়াতে মিঠা পানির মাছ অগভীর পানিতে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে ফলে মাছের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস ও ব্যহত হচ্ছে। ভূমি ক্ষয়ের কারণে জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাওয়ায় কৃত্রিম সার ব্যবহারে কৃষক বাধ্য হচ্ছে। সুতরাং ক্ষয় রোধকল্পে প্রয়োজন নদনদী ও খালবিল সহ বিভিন্ন জলাশয়ের তীরে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ রোপণের উপর গুরুত্বারোপ একান্ত প্রয়োজন।

লেখক, অধ্যাপক
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর
ই-মেইলঃ fhoque.hstu@gmail.com
মোবাইল নং- ০১৭৫০০৯০৪৫৮

সোমবার ১০ অগ্রহায়ণ ১৪২১
২৪ নভেম্বর ২০১৪
দৈনিক ইত্তেফাক

আলোকপাত ■ প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হক

ছাত্র রাজনীতির হালচাল

দেশ ও দেশের মানুষকে মন থেকে ভালবেসে রাজনীতি করার মানসিকতা আজ অনেকের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া কঠিন। সমগ্র দেশব্যাপী কতিপয় ছাত্রের মারামারি, হানাহানি ও অনৈতিক কাজের জন্য ছাত্রদের অভিভাবকসহ সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ চিন্তিত ও শংকিত। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তখন বিভিন্ন সংগঠনের নামে সে দলের দিকে ঝুঁকে পড়ে একশ্রেণির স্বার্থান্বেষীমহল। দলের দোহাই দিয়ে অনৈতিক, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ইত্যাদি দ্বারা পকেট ভারি করতে থাকে।

রাজনীতিতে ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু কতিপয় ছাত্র নেতার অনৈতিক কার্যকলাপ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ছাত্র রাজনীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় ছাত্রলীগকে সতর্ক করে বলেন ক্যাম্পাসে কেউ ছাত্রলীগের নামে সন্ত্রাস করলে বিশৃংখলা করলে তাদের পুলিশের ধরিয়ে দিতে হবে। এটি একটি আশার আলোও বটে। সজীব ওয়াজেদ জয় দৃঢ়তার সাথে বলেন, যখন দল ক্ষমতায় থাকে, তখন সবাই ছাত্রলীগ আর আওয়ামী লীগের হয়ে যায়। নিজেদের দুর্নীতি ও লাভের জন্য আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। সাধারণ মানুষের বক্তব্য হলো দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত তাদের ভূমিকা ভাল ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর ছাত্রলীগ বা ছাত্রদলের ভূমিকা প্রশ্নাতীত নয়। শিবির আরও ক্ষতিকারক দল। বিশ্বের অনেক দেশেই ছাত্র রাজনীতি নেই, সেদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়া ও গবেষণার কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি নেই, তাই সেখানে সমস্যাও নেই। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি না থাকার কারণে সেখানে শিক্ষা কার্যক্রম যথারীতি চলছে। একাডেমিক নিয়ম-কানুন যথাযথ ভাবে চলছে। ছাত্র রাজনীতির নামে অন্তর্কলহ কারও জন্যই মঙ্গলজনক নয়। তিনি আরও বলেন, আমরা যদি সৎ থাকি, তবে চিন্তার কোন কারণ নেই। কেউ সঠিক শিক্ষা নিলে তার দুর্নীতি বা চাঁদাবাজি করার দরকার হয় না। আগামী ১ ডিসেম্বর হতে ৭ ডিসেম্বর সারা দেশে ক্লিন এন্ড সেইফ ক্যাম্পাস কর্মসূচি পরিচালনার নির্দেশও দেয়া হয়েছে। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য দেয়ার জন্য জয়কে ধন্যবাদ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের রাজনীতির কোন ধারণা নেই, কারণ বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ায় রাজনীতির ইতিহাস, রাজনীতিবিদদের জীবনীও তারা পড়ে না। তাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতাদের কাছ থেকে রাজনীতির ট্রেনিং নিয়ে রাজনীতি করা প্রয়োজন। কারণ ছাত্র রাজনীতি ছাত্রদের নিয়েই। কিন্তু নিজের পকেট ভারি করার জন্য দল চালানোর কথা বলে ছাত্রদের নিকট হতে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলেই বিবেচিত। তারা ছাত্র রাজনীতির দোহাই দিয়ে যখন রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করবে, তখনও দুর্নীতির মাধ্যমে দেশ ও জনগণকে হয়রানি ছাড়া আর কি করতে পারবে। বর্তমানে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ব্যক্তি স্বার্থ নিয়ে, ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে। ক্ষমতায় গিয়ে বড় রাজনীতিবিদ হবেন এ চিন্তার মানুষ খুবই কম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া ছাত্রলীগের ভূমিকা ইতিহাস হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধুর জীবনী না পড়ে রাজনীতি যারা করেন তারা সত্যিকারের দেশ প্রেমিক রাজনীতিবিদ হতে পারবেন না। সত্যের উপর টিকে থাকতে পারবেন না। বঙ্গবন্ধু মানুষকে সাহায্য করতেন। ছাত্রজীবনেই তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার বড় ভাই ফরিদপুর-৪ আসনের এমপি ছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর অনেক ঘটনাই বলতেন। গরীব মানুষকে

গোলার ধান বিলি করে দিতেন, নতুন কোন জামা পরে স্কুলে যেয়ে গরীব ছাত্রদের গায়ে পরিয়ে দিয়ে বলতেন এটি তোমাকে মানাচ্ছে ভাল, তুমি এটি ব্যবহার কর। ১৯৭২ সালে গণভবনে দেখা করতে গেলে প্রথমেই আমার নাম জিজ্ঞাসা করে বলেন, নকল করো না। দেশ গড়তে হবে। এমনি শত শত ঘটনা আছে যা থেকে একজন নবীন রাজনীতিবিদের শিক্ষার অনেক কিছুই আছে। বঙ্গবন্ধু ছাত্র রাজনীতি করতেন, শিক্ষকের সাথে ছাত্র শিক্ষকের মর্যাদাও ঠিক রাখতেন। ব্যক্তিস্বার্থে বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থে কখনও ধ্বংসাত্মক কাজে কাহাকেও উদ্বুদ্ধ করতেন না। বর্তমানের রাজনীতির ভাষা, প্রতিবাদের ভাষা, অগ্নিসংযোগ, মানুষ হত্যা। এ অবস্থান থেকে বের হতে হবে। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা তেমনই।

ছাত্র রাজনীতিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে ছাত্র হয়েও ছাত্রদের কাছ থেকে হলে সিটের ব্যবস্থার কথা বলে চাঁদা তুলে পকেট ভারি করা অন্যায়। চাঁদা না দিলেই বিপদ, হলের সিট বাতিল ও শারীরিক লাঞ্ছনা, বিল্ডিং তৈরিতে চাঁদা, কেন্দ্রীয় মসজিদের বারান্দা সম্প্রসারণ কাজে চাঁদা, যোগ্যতাবলে শিক্ষক নিয়োগের পরও চাঁদা না দিলে রাজাকার নাম বসিয়ে অসম্মান করতেও এখন দ্বিধাবোধ করছে না কেউ কেউ হাবিপ্রবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র প্রফেসরকে (যিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা) অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় তাকে গুলি করে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে। তারা কারা? এরা কি সত্যিকারের ছাত্রলীগ না অন্য কেউ? তাছাড়াও ছাত্র শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও এদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন। শিক্ষকের কাছ থেকে ছিনতাই করা হচ্ছে নগদ টাকা। এর নাম আর যাই হোক ছাত্র রাজনীতি না, হতে পারে না। ইদানিং কোন কোন ক্যাম্পাসে দেখা যাচ্ছে ভাড়াটে লোকের আনাগোনা যেটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য আরও মারাত্মক। ঐ ছাত্রনেতারা ৫ বছরের শিক্ষাজীবনকে ১২ বছরে রূপ দিয়ে কোটি টাকার সম্পদশালী হয়েছে এমন নজির ভূরি ভূরি। ছাত্র বয়সে এরা টাকা খরচ করে শিক্ষকদের বিরুদ্ধাচারণ করছে। সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীদের মিছিল মিটিং এ ধরে রাখতে প্যাকেট লাঞ্চ করানো হচ্ছে। এ কারণে অনেকে হল ত্যাগ করেছে। পরীক্ষার্থীদের ফাইনাল সেমিস্টার পরীক্ষাকে ভয় ভীতি দেখিয়ে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। শিক্ষকরা তাদের ক্লাশে ফিরিয়ে আনতে ছাত্রদের অনুরোধ জানিয়েও ব্যর্থ হচ্ছেন। নিষ্পাপ ছাত্রদের জীবনের মূল্য অনেক। একটি দিনের কারণেও অনেকের জীবন থেকে ঝরে পড়তে পারে লোভনীয় চাকরির সুযোগ। এর জন্য দায়ী ঐ সকল ছাত্রনেতা যারা ডিজিটাল সন্ত্রাস চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে অচল করে দিতে চায়। তাদের প্রতিবাদে সকলকে ও সবখানে সোচ্চার হতে হবে।

শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক মধুর। ছাত্র সন্তান সমতুল্য। তারা লেখাপড়া করে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই সকল শিক্ষকের একান্ত চাওয়া-পাওয়া। ছাত্ররা শিক্ষকদের ঋণ কোন দিন শোধ করতে পারবে না। শিক্ষকরাও চায় না কোন ছাত্র জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হোক। যখন শুনি এক ছাত্র ভাল পজিশনে আছে। গর্ব হয়। এটাই একজন শিক্ষকের মনের অনুভূতি। শিক্ষক কোন দিনই ছাত্রদের প্রতিপক্ষ নয়, বরং সন্তানতুল্য। এটি শুধু শিক্ষকরাই ভাবলে হবে না, ছাত্রদেরকেও ভাবতে হবে। এজন্য সুস্থ ছাত্র রাজনীতি চাই। এমন রাজনীতি নয় যার নামে দেশে সন্ত্রাসী তৈরি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা জানালা ভাঙা হবে, গাড়ি ভাঙা হবে বা গাড়ির চাকা পাংচার করে যাতায়াতের পথকে রুদ্ধ করা হবে। আজ সরকারও এসব ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতির উপর অবিচল। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের বক্তব্য থেকে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে, আইন সবার জন্য সমান। অন্যায়কারীকে শাস্তি পেতেই হবে।

● লেখক : শিক্ষক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

৩য় লাইভস্টক অ্যাওয়ার্ড ও সেমিনার (বক্তৃন) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সমন্বিত ডিগ্রীর পাশাপাশি সময়োপযোগী অর্গানোগ্রাম অপরিহার্য

প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হক

আজ থেকে প্রায় ৪৫ বছর পূর্বের কথা। সে সময় একটি দেশী গাভী হতে গড়ে মাত্র ২ লিটার দুধ পাওয়া যেত। মুরগীর ওজন মাত্র ১ হতে ১.৫ কেজি। বছরে ডিম মাত্র ১৩০ হতে ১৪০টি, আকারে ছোট। উন্নত জাতের ১টি মুরগী বছরে বড় আকারের প্রায় ৩৩০টি ডিম দিতে সক্ষম। বর্তমানে কৃত্রিম প্রজনন এর মাধ্যমে সেই গাভীর ভবিষ্যৎ প্রজন্মরাই আজ ১৫ লিটার হতে ৪০ লিটার দুধ দিতে সক্ষম। সে সময়ে গবাদি প্রাণির মৃত্যু হার ছিল অনেক বেশী। রিন্ডার পেষ্ট (গো-বসন্ত) একটি জীবন হননকারী ব্যাধি। এ রোগে প্রায় শতভাগ আক্রান্ত হতো এবং ৮০-৯০ শতাংশ গবাদি প্রাণির মৃত্যু হতো। বর্তমানে সে রোগ তেমনটা আর দেখা যায়না। কারন প্রাণিচিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এ দেশেই তৈরী করছে গবাদি প্রাণির প্রতিষেধক টিকা। যেমন- গো-বসন্ত, তড়কা, বাদলা, গলাফুলা, জলাতঙ্ক, টিটেনাস, পিপিআর, এফ.এম.ডি ইত্যাদি। অন্য দিকে হাঁস-মুরগীর জন্যও প্রতিষেধক টিকা উৎপাদন করছে। নিয়মিত টিকা প্রদান ও চিকিৎসার কারণেই প্রাণিসম্পদ খাত আজ আর্থ সামাজিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। তবে কিছু টেকনিক্যাল কারণে প্রাণিসম্পদ তার প্রকৃত লক্ষ অর্জনে সমস্যা হচ্ছে। এ বিষয়টি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখিও হয়েছে। এ সেক্টরের অনেক বিজ্ঞজন জেনে শুনে ও বুঝে সমস্যা গুলো সচল রাখার মধ্যে আনন্দ খুজে পান, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও খুজে পান। এ সমস্যাটির বীজ বপন করা হয়েছিল ১৯৬২ সালে। ময়মনসিংহ ভেটেরিনারি কলেজটির স্থানে যখন ইষ্ট-পাকিস্তান এগ্রিক্যালচারাল ইউনির্ভাসিটির গোড়া পত্তন হয় ৬টি অনুষদ নিয়ে। সে সময় প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য বিএসসি ভেট. সায়েন্স এন্ড এ.এইচ নামক সমন্বিত (Combined course) ডিগ্রী দেওয়া হতো, যা যুগ ও সময়োপযোগী ছিল। রোগের চিকিৎসা, রোগের দমন, প্রাণির উৎপাদন, প্রজনন, খামার ব্যবস্থাপনা, গবেষণাধর্মী সবগুলো কাজই নিয়মতান্ত্রিকভাবে চালিয়ে নিতে কোন বাধার সম্মখীন তেমনটা হতে হয়নি। তবে বর্তমানের মত এত সুযোগ সুবিধা ও অর্থ কড়ি ছিলনা। বর্তমান সরকার সমন্বিত ডিগ্রীর গ্রাজুয়েট তৈরীর লক্ষে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী ভেটেরিনারি কলেজে স্ব স্ব অনুষদ হতে সমন্বিত কোর্সের(Combined course) বিশেষজ্ঞ প্রাণি চিকিৎসক তৈরী করে যাচ্ছে। এর ফলে সকল শ্রেনীর প্রাণি পালনকারীরা একজন দক্ষ ভেটেরিনারি চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা সেবা, খামার ব্যবস্থাপনা, খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা বিধানও সম্প্রসারনের যাবতীয় বুদ্ধি পারামর্শ পেয়ে থাকেন। ভারতেও এ পদ্ধতিতেই ভেটেরিনরি গ্রাজুয়েট তৈরী করা হচ্ছে। বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকারের দাবীদার ভারতে ১৯৪৭ হতে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন মেয়াদে ও কারিকুলায় ভেটেরিনারি ডিগ্রী প্রচলিত ছিল। তবে, সরেজমিনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ায় "ভেটেরিনারি কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া" Minimum standards of Veterinary Education, Degree Course, BVSC and AH regulation 1993 (MSVE)" প্রবর্তন করেছিল। ১৯৯৫-১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ হতে ভারতে প্রায় ৪০ টির অধিক ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই নামে ও মেয়াদে (৫ বছর) (BVSC & AH) ডিগ্রী বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমানে ভারত বিশ্বের প্রথম কাতারের দুগ্ধ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করছে। আমাদের দেশে প্রতি বছর গড়ে প্রায় আটশত ভেটেরিনারি ডাক্তার পাস করে বের হলেও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে জটিলতার শিকার হচ্ছেন। অনেক মেধাবী গ্রাজুয়েট দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যাচ্ছেন এবং সেখানে সুনাম অর্জন করছেন। প্রাণিসম্পদ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত এবং জিডিপিতে এর অবদান কম নয়। মেধা সম্পন্ন জাতি তৈরিতে এর অবদান সবার উপরে। তাছাড়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এর উপর নির্ভরশীল প্রায় ৭৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১২ কোটি মানুষ। সরকার এ সেক্টরের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হলেও অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে প্রত্যাশিত সফলতা আসেনি। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে একই অধিদপ্তরে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত ভেটেরিনারি এবং এনিম্যাল হাজবেন্ড্রি গ্র্যাজুয়েটেরা একে অন্যের চির প্রতিপক্ষ, যা প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে বাধার মূল কারণ। প্রায় ৫৭ বছর ধরে কাদা ছোড়া ছুড়ি চলছে। একই দেশে একই কাজের জন্য দু ধরনের গ্র্যাজুয়েট তৈরি দ্বারা এক দিকে যেমন প্রতি বছর সরকারের শত শত কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে, অন্য দিকে কৃষক বা প্রাণি পালনকারীরা বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভেটেরিনারি সায়েন্স আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত পেশা, যাতে পশু-পাখি ও বন্য প্রাণির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও বাসস্থান, নির্বাচন, খাদ্য নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ বিষয়ে বিস্তারিত পড়ানো হয় এবং শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে প্রাণির চিকিৎসা সহ যাবতীয় কাজের অনুমতি নিয়েই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয়। প্রাণিসম্পদ

অধিদপ্তরের প্রশাসন মাঠ পর্যায়ে দু ধরনের গ্র্যাজুয়েট নিয়োগ ও কর্ম ক্ষেত্রে জটিলতার কারণে ১৯৬৯ সালে শিক্ষা সম্পর্কিত মূল্যায়ন কমিটি, ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার, ১৯৭৬ সালে পশু সম্পদ অধিদপ্তরের তৎকালীন পরিচালক ড. আলাউদ্দিন আহম্মেদের রিপোর্ট, ১৯৭৭ সালে সিএমএলএ (Chief Marshal Law Administrator), ১৯৮২ সালে ব্রিগেডিয়ার এনাম কমিটি, ১৯৯৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ ভেটেরিনারি অ্যাসোসিয়েশন সহ বিগত সব সরকারও প্রতিষ্ঠান এএইচ অনুষদটি একক ভাবে অকার্যকর বিধায় বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে চিঠির মাধ্যমে অবহিত করেন। তাছাড়া জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিসংস্থা, এডিবি, বিশ্বব্যাংক, প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রাণিসম্পদ শিক্ষায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমন্বিত ভেটেরিনারি কোর্স নামে দেশে একটি মাত্র কোর্স রেখে এনিম্যাল হাজবেন্ড্রী অনুষদ (বাকৃবি) বন্ধের সুপারিশ করেন। কিন্তু অদ্যবধিতা কার্যকর হয় নি। সমস্যা রয়েই যাচ্ছে। পার্শবর্তী রাষ্ট্র ভারতে প্রায় ৩০ টির অধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে কম্বাইন্ড ডিগ্রী চালু রয়েছে। তেমনি পাকিস্তান ভেটেরিনারি মেডিক্যাল কাউন্সিল (পিভিএমসি) ২০০৩ থেকে এনিম্যাল হাজবেন্ড্রী অনুষদ বন্ধ করে সমন্বিত কোর্সের ভেটেরিনারি সায়েন্স ডিগ্রী চালু রেখেছে। উল্লেখ্য ২০১১ সালের ২১ ডিসেম্বর আমেরিকার এক জরিপে উল্লেখ করা হয়, বিশ্বের ১১১ টি দেশের ৪৯৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্বাইন্ড ডিগ্রী চালু রয়েছে। সুতরাং সমন্বিত ডিগ্রীধারী বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ বিশেষজ্ঞদের জন্য মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এ লক্ষ্যে যুগোপযোগী অর্গানোগ্রাম তৈরীতে সরকারের উর্চ্চ পর্যায়ের আন্তরিক সহযোগীতা প্রয়োজন যাতে সমন্বিত ডিগ্রীধারী ভেটেরিনারি গ্র্যাজুয়েটরা এ পেশায় আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে নিজেকে নিয়োজিত রেখে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে ভুমিকা রাখার সুযোগ পায়। তবে, শেষ কথা হলো ১৯৬১ সালের সেই সমন্বিত বিএসসি ভেটসায়েন্স এন্ড এএইচ নামকরণ পূনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে সমস্যা বা জটিলতা নিরশন হবে। এ বিষয়টি সকল প্রাণিসম্পদ বিশেষজ্ঞদের এখনই ভাবতে হবে।

ডিন, ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্স অনুষদ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

সকালের খবর
ঢাকা : সোমবার ১৬ জানুয়ারি ২০১২

nanamot@shokalerkhabor.com

যুদ্ধাপরাধীর বিচার

মো. ফজলুল হক

বিচার

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এর মাত্র ১ ঘণ্টা পরে অর্থাৎ ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর রাত ১টা ৩০ মিনিটে ধানমণ্ডির ৩২নং রোডের বাড়ি থেকে পাক হানাদার বাহিনী গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে আটকে রাখে বঙ্গবন্ধুকে। পাকিস্তানের সৈন্যদের ভাষা উর্দু, সাঁতার কাটতে জানে না, রাস্তাঘাট চেনে না, চেহারাও ভিন্ন। তাদের নিয়ে এল ধানমণ্ডির ৩২নং সড়কের বঙ্গবন্ধুর বাসায় স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র ১ ঘণ্টার মধ্যেই। এরাই এ দেশের আলো-বাতাসে লালিত মানুষ নামের কলঙ্ক রাজাকার, আলবদর, আলশামস। এরা যুগ যুগ ধরে ধর্মের নামে মওদুদীবাদ নামক ভ্রান্ত ও অনৈসলামিক কাজে মানুষকে শুধু বিপথগামীই করেনি, '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্যদের হাত ধরে নিয়ে এসেছে ঢাকা থেকে বাংলার গ্রামগঞ্জে। সৈন্যদের বোঝানো হয়েছে যারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে বা যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায় তারা সবাই কাফের, সে যদিও মসজিদের ইমাম সাহেব হন, তবুও কাফের। এদের ধরে গুট করুন (হত্যা করুন)। দিনের বেলায় সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়েই ক্ষান্ত হয়নি তারা, লুট করেছে স্বর্ণ, ব্যাংকের টাকা, খাদ্যের জন্য গরু, ছাগল, এমনকি তারা কোমলমতি মেয়েদেরও নিয়ে গেছে—যাদের খোঁজ স্বাধীনতার ৪০ বছর পরও তার মা-বাবা জানেন না। আজও তাদের চোখের জল ঝরছে। এমনিভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তাসহ প্রায় ৩০ লাখ নিরস্ত্র নারী-পুরুষকে হত্যা করা হয়।

হত্যাকারীদের বিচার হতেই হবে। বঙ্গবন্ধু মাত্র ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছেন। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর ১৩ বছরের জেল-জুলুম ভোগ, তার সঠিক দিকনির্দেশনা, সততা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের উদাহরণ ইতিহাসেও বিরল। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শত্রুরা যদি পাকিস্তানিদের সহযোগিতা না করত তা হলে ৩০ লাখ মানুষ শহীদ হতেন না এবং মা, বোনদের ইজ্জতও হারাতে হতো না। সুতরাং যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি হতেই হবে।

দেশের মানুষ যুদ্ধাপরাধীদের ত্বরিত বিচার ও এর বাস্তবায়ন দাবি করছেন। জাতি এ কলঙ্কের দাগ মুছে কলঙ্কমুক্ত হয়ে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়। এটাই সবার প্রত্যাশা এবং সময়ের দাবি। মানুষের এই দাবি পূরণ করতে হলে সবাইকে আবারও একাত্তরের মতো ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ■

লেখক : শিক্ষক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

কালের কণ্ঠ
www.kalerkantho.com রবিবার। ২৩ মার্চ ২০১৪। ৯ চৈত্র ১৪২০

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে কিছু ভাবনা

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন বেড়ে চলেছে সড়ক দুর্ঘটনা। এভাবে স্বজনহারা পিতা-মাতা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যার অশ্রুজল ও ভারাক্রান্ত হৃদয় আর কতকাল? এটি একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায় কী? প্রয়োজনের তাগিদে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন। বিভিন্ন পেশার মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়ছে কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশে এবং শিক্ষার্থীরা যাচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি নারী-পুরুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশ ও নিজ স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। প্রায় সবাইকে কর্মক্ষেত্রে যেতে হয় বিভিন্ন পরিবহনের সাহায্যে। বাসাবাড়ি থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় টেনশন। ফিরে না আসা পর্যন্ত চিন্তাভাবনার শেষ নেই। প্রতিদিনই দেশ-বিদেশের কোথাও না কোথাও দুর্ঘটনা ঘটছেই। এটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কম হলেও দৈনিক চার-পাঁচটি সড়ক দুর্ঘটনা এবং গড়ে ৮-১০ জনের অকালমৃত্যু।

গত তিন মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে আরো শতাধিক যাত্রী। আহত হয়েছে শতাধিক, যার হিসাব কে রাখে? কলমের গতির চেয়ে দ্রুতগতিতে ঘটে যাচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনা। বিবিসির এক জরিপে দেখা যায়, ৫৫৪টি দুর্ঘটনার জন্য প্রায় ৯৯ শতাংশ দায়ী গাড়িচালক নিজেই। প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় গড়ে প্রায় ১২ হাজার জনের মৃত্যুর তথ্য থাকলেও ডা. হাসিব মোহাম্মদ আহসানের এক গবেষণায় গত ১৯৯৯ ইং থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে প্রায় ২৫ হাজার ৪৯০ জনের মৃত্যুসহ প্রায় ৩৫ হাজার ১০০ জনের হতাহতের ঘটনা ঘটে। আসানের গবেষণার এ হিসাব দেওয়া হয়েছে ওয়েবসাইটে। ওই তথ্যমতে, বিশ্বে দুর্ঘটনায় প্রতিবছর মৃতের সংখ্যা প্রায় ১.৩ মিলিয়ন বা ১৩ লাখ এবং আহতের সংখ্যা ৫০ লাখ মিলিয়ন বা পাঁচ কোটি। উন্নত বিশ্বে ২৭ শতাংশ মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে গত ১২ বছরে। বাংলাদেশেও দুর্ঘটনা হ্রাস পেয়েছে, যেমন—২০০৩ সালে চার হাজার ১১৪টি দুর্ঘটনা ঘটে এবং ২০১০ সালে দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় দুই হাজার ৪৩৭টি—অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক। তবে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে রাস্তার অবস্থা অনেক ভালো হলেও চালকের ত্রুটিই সড়ক দুর্ঘটনার মূল কারণ। তা ছাড়া নতুন নতুন গাড়ি চালানোর দায়িত্ব পেয়েছে অনভিজ্ঞ নতুন ড্রাইভার, যারা ছিল অন্য গাড়ির হেলপার।

সড়ক দুর্ঘটনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে যা প্রয়োজন তা হলো, দুর্ঘটনার কারণগুলো চিহ্নিত করে সে মোতাবেক পদক্ষেপ নেওয়া। যেমন—দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ড্রাইভার নিজেই—এটিই মূল কথা। যেমন : ১. অদক্ষ ড্রাইভার ও হেলপার দ্বারা গাড়ি চালানো, ২. মানকাসক্ত ড্রাইভার, ৩. ট্রাফিক আইন অমান্য, ৪. ওভারটেকিং, ৫. মাত্রাতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল পরিবহন, ৬. ঘন কুয়াশা, ঝড়-বৃষ্টি, রাস্তার বক্রতা, রাস্তার ওপর হাটবাজার, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়ার অবাধ চলাফেরা, ৭. পাল্লা দিয়ে গাড়ি চালানো এবং ডিভাইডারবিহীন সড়ক ইত্যাদি সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। বর্তমানে সিএনজি, মোটরচালিত রিকশা-ভ্যান অপরিকল্পিত ও যত্রতত্র গাড়ির অবস্থান ও চলাচলে দূরপাল্লার বাস-ট্রাকের জন্য বড় সমস্যা। রাস্তাসংলগ্ন বাজার, তেলের পাম্পও দুর্ঘটনার জন্য কম-বেশি দায়ী, যেমন—মিরসরাই (চট্টগ্রাম) থেকে যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত রাস্তাসংলগ্ন হাট-বাজারের সংখ্যা ২৩টি, রেলক্রসিং দুটি (ওভারব্রিজ নির্মাণাধীন) এবং পেট্রলপাম্প প্রায় ১২৭টি। তেমনি ঢাকার গাবতলী থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত ঢাকা-টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ-দিনাজপুর মহাসড়কে বাঁক রয়েছে প্রায় ১৯৩টি, যেখানে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়িগুলো

> ২০০৩ সালে চার হাজার ১১৪টি দুর্ঘটনা ঘটে এবং ২০১০ সালে দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় দুই হাজার ৪৩৭টি—অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক। তবে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে রাস্তার অবস্থা অনেক ভালো হলেও চালকের ত্রুটিই সড়ক দুর্ঘটনার মূল কারণ। তা ছাড়া নতুন নতুন গাড়ি চালানোর দায়িত্ব পেয়েছে অনভিজ্ঞ নতুন ড্রাইভার, যারা ছিল অন্য গাড়ির হেলপার

দৃষ্টিগোচর করা দুরূহ ব্যাপার। ফলে মুখোমুখি সংঘর্ষ প্রায়ই হয়।

দুর্ঘটনা রোধে জরুরি ভিত্তিতে যা যা করা প্রয়োজন : কেবল দক্ষ, অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত ড্রাইভারকে লাইসেন্স প্রদানসাপেক্ষে গাড়ি চালাতে দেওয়া। *ড্রাইভারকে ধূমপানসহ মাদক থেকে বিরত থাকা। এ ক্ষেত্রে নিয়মিত ড্রাইভারের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিধান রাখা। *দূরপাল্লার প্রতিটি গাড়িতে দুজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার রাখার বিধান থাকা। *ড্রাইভার ও হেলপারের জন্য নির্ধারিত ড্রেস ব্যবহার করার বিধান রাখা, যাতে ড্রাইভারের আসনে হেলপার বসতে না পারে। *প্রথমত, ড্রাইভারকে তার নিজের জীবন রক্ষায় সর্বক্ষেত্রেই সতর্ক থাকতে হবে। ট্রাফিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে গাড়ি চালানো। ঢাকা-চট্টগ্রাম রাস্তার মতো চার লেনবিশিষ্ট রাস্তা সারা দেশেই প্রয়োজন। সব রেলক্রসিংয়ে ওভারব্রিজ তৈরি করতে হবে।

রাস্তার মাঝখানে ডিভাইডার স্থাপন করা এবং ডিভাইডারের ভেতরে চিরসবুজ গাছ লাগানো, যাতে রাতে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির লাইট চোখে না পড়ে। *যাত্রী ওঠা-নামার জন্য রাস্তার নির্ধারিত স্থানে ডাইভারশন স্পেস রাখা। *তেলের পাম্পের ক্ষেত্রে প্রবেশ ও বের হওয়ার পথ ক্রমান্বয়ে বড় রাস্তার সঙ্গে মিলিত হওয়া। *বিশ্বরোড থেকে কমপক্ষে ১০০ গজ দূরে হাট-বাজারের অবস্থান হওয়া। *বাস বা ট্রাকে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী ও মাল বোঝাই না করা। *গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ব্যবস্থা রাখা। *বিশ্বরোডের বিভিন্ন স্থানে ট্রাকের মালের ওজন নির্ধারণী যন্ত্রের ব্যবস্থা রাখা। রিকশা ও ভ্যান অপসারণ করে চালকদের অন্য কাজের সংস্থান করা। *বিশ্বরোডে নছিমন ও যন্ত্রচালিত যাত্রীবাহী ভ্যান চালানো নিষিদ্ধকরণ। মনে রাখতে হবে, দুর্ঘটনায় শুধু যাত্রীরাই ক্ষতি হয় না, ড্রাইভার-হেলপারও আক্রান্ত হয় সর্বাগ্রে। অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন গাড়ির মালিক। অভাবের খানি টানতে হয় অন্য সদস্যদের। ড্রাইভারকে অনুধাবন করতে হবে, তার দায়িত্বে রয়েছে ৪০-৫০ জন যাত্রী—অর্থাৎ তার ভুলের কারণে দুর্ঘটনা হলে কম-বেশি সবাই শারীরিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তসহ জীবনযাপনে পঙ্গুত্বের খানি টানতে হয় আজীবন। ড্রাইভারকে তার নিজের জীবনকে মূল্য দিতে হবে এবং ভালোবাসতে হবে, যেহেতু তার জীবনের ওপর নির্ভর করছে একটি পরিবার।

লেখক : প্রফেসর, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

কালের কণ্ঠ শনিবার। ১৮ জুন ২০১৬। ৪ আষাঢ় ১৪২৩

ডা. মো. ফজলুল হক ভ

কৃষি গবেষণা ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা

৬৫ বছর আগে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল বর্তমানের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। আবাদি কৃষিজমির পরিমাণ ছিল বর্তমানের প্রায় দ্বিগুণ। অথচ সে সময়ও মানুষ দুবেলা পেট পুরে খেতে পেত না। সে সময় পুরো দেশে কৃষি গ্র্যাজুয়েট তৈরির জন্য ছিল পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, যেটি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অনুষদ আছে এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯টি। ধান, গম, ভুট্টা, ফলমূল, গবাদি প্রাণী, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ওপর গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞানীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমানে বিরি, বারি, বিএডিসিসহ বিভিন্ন গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় উন্নত জাতের খাদ্যশস্য-ফলমূল ইত্যাদি উদ্ভাবিত হচ্ছে। সরকার সরেজমিন উৎপাদনের লক্ষ্যে উৎপাদনকারী কৃষকদের প্রশিক্ষিত করে উন্নত বীজ, সার, কীটনাশকসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করে আসছে হ্রাসকৃত বা নামমাত্র মূল্যে। প্রাণীর চিকিৎসা, রোগ দমন ও উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি ও গবাদি প্রাণীর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে খামার স্থাপন দ্বারা আমিষের ঘাটতি পূরণে সচেতন সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো। অনাবাদি পুকুরে উন্নত জাতের মাছ চাষ দ্বারা কৃষকদের স্বাবলম্বী করা হচ্ছে। সরকার প্রায় সব সেক্টরেই ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭২ সালে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো মাত্র ৮৭ লাখ ৪৪ হাজার মেট্রিক টন। বর্তমানে উৎপাদন হচ্ছে প্রায় তিন কোটি ৩৪ লাখ মেট্রিক টন। দক্ষ কৃষিবিদ অফিসারদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতায় উন্নত জাতের খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে কৃষি সেক্টর তথা কৃষি, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ও কৃষি প্রকৌশল সেক্টরে রাতারাতি উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। ফলে জনসংখ্যা তিন গুণ হওয়া সত্ত্বেও দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। স্বল্প পরিসরে হলেও রপ্তানিও হচ্ছে বিদেশে।

১৯৭৩ সালের ১৯ আগস্ট ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বাবারা একটু লেখাপড়া শেখো, যতই জিন্দাবাদ আর মুর্দাবাদ করো, ঠিকমতো লেখাপড়া না শিখলে কোনো লাভ নেই, আর লেখাপড়া শিখে যে সময়টুকু থাকে পিতা-মাতাকে সাহায্য করো। প্যান্ট পরা শিখেছ বলে বাবার সাথে হাল ধরতে লজ্জা করো না। দুনিয়ার দিকে চেয়ে দেখো। কানাডায় দেখলাম, ছাত্ররা ছুটির সময় কাজ করে পয়সা উপার্জন করে।

গ্রামে গ্রামে বাড়ির পাশে বেগুনগাছ লাগিও, কয়টা মরিচগাছ লাগিও, কয়টা লাউগাছ ও কয়টা নারিকেলের চারা লাগিও। পিতা-মাতাকে একটু সাহায্য করো। কয়টা মুরগি পালো, কয়কটা হাঁস পালো। জাতীয় সম্পদ বাড়বে। তোমার খরচ তুমি বহন করতে পারবে।'

কৃষি সেক্টরের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখার নিমিত্তে 'কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ' (কেআইবি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটি কৃষিবিদদের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। কৃষি, কৃষক ও কৃষিবিদদের সার্বিক কল্যাণের কথা বিবেচনায় রেখেই জন্মলগ্ন থেকে সংগঠনটি অগ্রসরমাণ রয়েছে। এরই ফলে কৃষি সেক্টর তথা কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বর্তমানে সম্মানজনক অবস্থান করে নিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কৃষি সেক্টরের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র খামারবাড়ীতে এক একর জমি প্রতীকী মূল্যে এক হাজার এক টাকায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্তপত্র দলিলমূলে ২২ জুন ১৯৯৭ সালে হস্তান্তর করেন। পরে ২৩ অক্টোবর ২০১৩ সালে ১০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক সুবিধাসংবলিত কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) কমপ্লেক্সটি উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

উল্লেখ্য, ২২ নভেম্বর ২০১৪ সাল থেকে নবনির্মিত কেআইবি ভবনে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চালু রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানের বিধিবিধান মোতাবেক বা তদনুসারে কৃষক, কৃষিসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সবার কল্যাণ ও উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তিসহ কৃষির সব শাখায় বৈজ্ঞানিক সাফল্য, উন্নয়ন, অগ্রগতি ও তা হস্তান্তর এবং কৃষকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধন করা। দেশের কৃষিশিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও সম্প্রসারণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্য সেবা প্রদান করা। এ ছাড়া পারস্পরিক কল্যাণে দেশ-বিদেশের অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠন বা সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা ও সমঝোতা জোরদার করা। প্রকৃতিক দুর্যোগজনিত জাতীয় জরুরি পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছাসেবা প্রদান করা। সর্বোপরি কৃষি সেক্টরের উন্নয়নে সবাইকে উৎসাহিত করার নিমিত্তে কেআইবি পদকের বিধান রাখা হয়েছে। প্রতিবছর কৃষিক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী অবদান, সাহায্য-সহযোগিতার জন্য কেআইবি পদক বা সম্মাননা প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।

সব উন্নয়নের মূলে যার শতভাগ অবদান তিনিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির পদমর্যাদায় উন্নীত করেন। প্রাচীন চাষাবাদ পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক চাষাবাদব্যবস্থা 'সবুজ বিপ্লবে'র ডাক দেন। তারই ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞানের সঠিক চর্চায় বর্তমানে বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল শ্রীলঙ্কায় রপ্তানি ও নেপালের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণসাহায্য হিসেবে বিপুল পরিমাণ চাল পাঠানো হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন দেশে চাল, আলু, মাছ, মাংসসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি নিয়মিত রপ্তানি হচ্ছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। অগ্রগতির এই ধারা অব্যাহত থাক—এটাই প্রত্যাশা।

সব উন্নয়নের মূলে যার শতভাগ অবদান তিনিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির পদমর্যাদায় উন্নীত করেন। প্রাচীন চাষাবাদ পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক চাষাবাদব্যবস্থা 'সবুজ বিপ্লবে'র ডাক দেন। তারই ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞানের সঠিক চর্চায় বর্তমানে বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে

লেখক : অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, মেডিসিন, সার্জারি অ্যান্ড অবস্টেট্রিকস বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

www.kalerkantho.com

কালের কণ্ঠ ১৫

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১০, শুক্রবার

মুক্তধারা

ডা. মো. ফজলুল হক ▸

অ্যানথ্রাক্স গবাদিপশুর জন্য ক্ষতিকারক কিন্তু মানুষের জন্য নয়

এ মুহূর্তে গবাদিপশুর বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে দুজন ভেটেরিনারি ডাক্তার এবং প্রয়োজনীয় ফিল্ড স্টাফ নিয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা জনসাধারণের নাগালে আনা একান্ত প্রয়োজন

অ্যানথ্রাক্স (তড়কা) একটি জীবন হননকারী ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। এ রোগের জীবাণু ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস মাটিতে সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং অনাবৃষ্টির পর অতিবৃষ্টিতে মাটিসহ ঘাসের সঙ্গে গবাদিপশুর শরীরে প্রবেশের পর বিভাজনের মাধ্যমে লাখ লাখ ব্যাকটেরিয়া জন্মগ্রহণ করে মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়। অ্যানথ্রাক্স শুধু গরু-মহিষেই নয়; ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, শূকর, বাঘ, ভালুক, এমনকি হাতিতেও রোগের সৃষ্টি করে। এ রোগ যেহেতু প্রাণিসম্পদ থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়, সে কারণে একে জেনেটিক ডিজিজ বলা হয়। সংক্রমণের মাধ্যম তিনটি, যথা—শ্বাসনালি, খাদ্যনালি ও সরাসরি চর্মের ক্ষতের মাধ্যমে। মশা-মাছিও রোগাক্রান্ত গবাদিপশু থেকে রক্ত গ্রহণ করে মানুষের শরীরে রোগের জীবাণুর প্রবেশ ঘটায়। আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশে অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে রাখা তো দূরের কথা, প্রয়োজনে মুচি মৃত পশুর চামড়াটি সংগ্রহ করে বাকি অংশ রাস্তার ধারে, খাল বা জলাধারে ফেলে দেয়। ফলে কুকুর, শিয়াল, কাক এবং শকুন মাংসগুলো খেয়ে নেয়। কুকুর হাড়গুলো নিয়ে বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘোরাফেরা করে মারণব্যাধি অ্যানথ্রাক্সের স্পোরগুলো দুই-চার কিলোমিটারে ছড়িয়ে দেয়। উল্লেখ্য, অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু মাটিতে ২০ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। স্বাভাবিক ও সুস্থ গবাদিপশু ওই এলাকার ঘাস বা পানি খেলেই পুনরায় আক্রান্ত হতে পারে। এভাবেই বছরের পর বছর একটি মৃত প্রাণীই রোগ ছড়ানোর জন্য যথেষ্ট। এ রোগের প্রভাব বর্ষা মৌসুমেই বেশি। অ্যানথ্রাক্সে মৃত গবাদিপশুর চামড়া ছাড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে অসুস্থ পশুর মাংস তৈরিতে নিয়োজিত যেকোনো ব্যক্তির দেহে স্পোর প্রবেশ করতে পারে। শ্বাসনালির মাধ্যমে সংঘটিত অ্যানথ্রাক্সই মানুষের জন্য মারাত্মক, যাকে Wool Shorter Disease বলা হয়। চামড়ায় ক্ষত বা ঘায়ের মাধ্যমে প্রবেশ করলে সে অ্যানথ্রাক্সকে Malignant Carbuncle বলা হয়। এ অবস্থা ততটা মারাত্মক নয়, যা বর্তমানে বাংলাদেশে ঘটছে। এ রোগে গবাদিপশু হঠাৎ মারা যায়। ফলে চিকিৎসা তো দূরের কথা, মালিকও বুঝতে পারবে না কী ঘটে গেল। অ্যানথ্রাক্সের উপসর্গগুলো হচ্ছে উচ্চতাপমাত্রা (১০৭° ফারেনহাইট) কাঁপুনি, ব্লট (পেট ফাঁপা), শ্বাসকষ্ট, পেটব্যথা ও লাফালাফি করে মাবা যাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে নাক ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কালো রঙের রক্ত বের হওয়া। এ ধরনের উপসর্গই প্রমাণ করে অ্যানথ্রাক্স। সাবধান! সাবধান!! মৃত পশুর চামড়া ছাড়াবেন না, সর্বনাশ ডেকে আনবেন না। মৃত পশুটি জরুরি ভিত্তিতে ছয়-সাত ফুট মাটির গর্তে পুঁতে রাখুন। মৃত প্রাণীটি গর্তে রেখে দেহের উপরিভাগে চুন বা Calcium Oxide দ্বারা আবৃত করে মাটিচাপা দিতে হবে। অন্যান্য রক্ত, লালা, দড়িসহ সবই মাটির গর্তে পুঁতে রাখুন। তবে মানুষ হিসেবে আমাদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। নিয়মিত ও সঠিকভাবে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে অ্যানথ্রাক্স রোগ হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

উল্লেখ্য, বিগত বছরগুলোতে এ রোগ স্পোরাডিক ফর্মে ছিল, গবাদিপশু মারাও যেত; কিন্তু মানুষে ব্যাপক আকারে Transmission এ বছরই প্রথম, যা জাতিকে আতঙ্কিত করেছে। মোদ্দা কথা, আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, যেহেতু সহজ চিকিৎসায় সবাই পর্যায়ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠছে। অ্যানথ্রাক্স রোগটি মারাত্মক বটে; কিন্তু প্রতিষেধক টিকা নিয়মিত ব্যবহার করলে গবাদিপশুকে শতভাগ সুস্থ রাখা সম্ভব। তবে আমাদের ত্রুটি কোথায়? এ ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা ও এর সমাধান আলোচনায় আসতে পারে। প্রথমত, প্রাণিসম্পদ বিভাগে প্রয়োজনের তুলনায় লোকবল খুব কম। যেমন—দিনাজপুর জেলার ১৩টি উপজেলার মধ্যে চারটি উপজেলায় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পদ শূন্য। ভেটেরিনারি সার্জনের অবস্থাও অনুরূপ। ১৩টি উপজেলার মধ্যে মাত্র পাঁচটিতে ইউএলএ আছে। এমনিভাবে পঞ্চগড় জেলার পাঁচটি উপজেলার চারটিতেই ভেটেরিনারি সার্জনের পদ শূন্য। দেশের বাকি জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের কমবেশি একই চিত্র।

ভেটেরিনারি সার্জনের পদ শূন্য থাকার পরও আইনগত জটিলতার কারণে বিগত বিসিএস পরীক্ষাগুলোয় ভেটেরিনারি সার্জনের পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। অথচ কৃষি সেক্টরে এর গুরুত্ব অপরিসীম। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক টিকার পরিমাণ বৃদ্ধি ও নিয়মিত ভ্যাকসিন প্রয়োগ এবং ভ্যাকসিন কার্ড সংরক্ষণ করা দরকার। পশু ক্রয়-বিক্রয়ে ভ্যাকসিন কার্ডসহ প্রত্যয়নপত্র প্রদর্শনের বিধান রাখা সময়ের দাবি। অসুস্থ পশু হাসপাতালে এনে চিকিৎসা গ্রহণ করা অনেক সময় সম্ভব হয় না, সে ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ ভেটেরিনারি ক্লিনিকের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। তৃতীয়ত, জাতীয় পর্যায়ে সঠিক পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে। উল্লেখ্য, পশুতে এসব রোগের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার রোধকল্পে এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে পশু ও পশুজাত পণ্যের সঙ্গনিরোধ (Quarantine), আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে আইন (২০০৫ সালের ৬ নং আইন) মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি লাভ করেছে, বিধি তৈরি এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত থাকলেও অদ্যাবধি তা বাস্তবায়িত হয়েছে কি না সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। উল্লেখ্য, দুই হাজার ৫০০ কিলোমিটার বর্ডারে অনেক ছলবন্দর রয়েছে। সাধারণ নিয়মেই আন্তর্জাতিক আইনে রয়েছে যেকোনো প্রাণী আমদানি করতে হলে বিশেষজ্ঞ দল দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে প্রবেশাধিকার দেওয়া। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন সঙ্গনিরোধের ব্যবস্থা (Quarantine System), যার উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রাণীর দেহে জনসাধারণের, এমনকি পশু-পাখির স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক বা Zoometric Important রোগ, যা শরীরে সুপ্ত অবস্থায় থাকার ব্যাপারটি সঠিক নির্ণয় করে এবং সে মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; কিন্তু স্বাধীনতার ৪০ বছর পরও এগুলো বাস্তবায়িত হয়নি। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ছলবন্দর রয়েছে ১০টিরও অধিক, যেমন—হিলি, সোনামসজিদ, বুড়িমারী, নাকসাম, টেংনাফ, বেনাপোল ইত্যাদি। প্রতিটি চেকপোস্টেই প্রয়োজন আধুনিক Quarantine Shed, Disease Diagnostic Lab এবং প্রয়োজনীয়সংখ্যক ভেটেরিনারি সার্জন ও লোকবল, যেখানে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে প্রবেশাধিকার দেওয়ার বিধান থাকবে। বর্তমানে সীমান্ত এলাকায় শুধু কাস্টম চেকপোস্ট এবং বর্ডার পুলিশ ও বিডিআরের নন-টেকনিক্যাল নজর রয়েছে। যেখানে প্রতিটি গরুর অ্যান্টি ফি ৫০০ টাকা ধার্য করে বর্ডার পাস দেওয়া হয়ে থাকে। আমরা এ ক্ষেত্রে কী দেখছি? শুধু পশু আমদানিই নয়, মারাত্মক ধরনের রোগ যেমন অ্যানথ্রাক্স, খুরারোগ, ক্লসেলোসিস, হিমোরেজিক স্পেটিসেমিয়া, যক্ষ্মা, গো-বসন্ত, জলাতঙ্ক, পিপিআর, বার্ডফ্লুসহ বিভিন্ন মারাত্মক রোগ নিয়ে এ দেশে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি নির্দ্বিধায় প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে মানবসম্পদসহ প্রাণিসম্পদ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এ মুহূর্তে কী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন? পশুরোগের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার রোধে এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার স্বার্থে এ প্রয়োজন Quarantine ২০০৫ সালের ৬ নম্বর আইনের সঠিক বাস্তবায়ন। সুতরাং এ মুহূর্তে গবাদিপশুর বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে দুজন ভেটেরিনারি ডাক্তার এবং প্রয়োজনীয় ফিল্ড স্টাফ নিয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা জনসাধারণের নাগালে আনা একান্ত প্রয়োজন। কারণ রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের অভাবে গ্রামগঞ্জে অদক্ষ কোয়াকের (গরুর হাতুড়ে চিকিৎসক) ভুল ও প্রতারণামূলক ওষুধ প্রয়োগে দিন দিন অ্যানথ্রাক্সসহ বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত জীবাণুর ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রতিটি সিটি করপোরেশনে স্বাস্থ্যসম্মত মাংস সরবরাহের জন্য প্রয়োজন মডার্ন Slaughter House, যেখানে থাকবে Mini Diagnostic Lab এবং Quarantine Space এবং আবাসিক ব্যবস্থা। বর্তমানে ঢাকা সিটি করপোরেশনে দক্ষ ও সৎ ভেটেরিনারি অফিসারের প্রয়োজন। যার অধীন সাতটি Slaughter House-এ ১৪ জন Veterinary Surgeon এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সঠিক পথে থেকে স্বাস্থ্যসম্মত মাংস নগরবাসীকে সরবরাহে ভূমিকা রাখতে পারবেন, অর্থাৎ অ্যানথ্রাক্সই নয়, এর চেয়েও মরণব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। পাখির অ্যানথ্রাক্স রোগ হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। তবে রাস্তাঘাটে পশু জবাইয়ের রক্ত, মাটিতে বিদ্যমান রোগ-জীবাণুর কন্টামিনেশনে বা অন্য যেকোনো রোগে বা বিষ প্রয়োগে আক্রান্ত হয়ে পাখি মারা যেতে পারে।

সবশেষে আমি মনে করি, নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগে গবাদিপশু অ্যানথ্রাক্স (তড়কা) থেকে রক্ষা পাবে এবং এ মুহূর্তে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান, মেডিসিন, সার্জারি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্স অনুষদ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

দৈনিক
করতোয়া

শুক্রবার ১৫ মাঘ ১৪১৭ : ২৮ জানুয়ারি ২০১১

ইভটিজিং বখাটেদের কাজ

ডা. মো. ফজলুল হক

প্রবাদ আছে, পাগল নৌকা ডুবাইও না। পাগল বলে, ভাল কথা মনে করেছ, তেমনি দশা। ইভটিজিং বর্তমানে নতুন ঘটনা মনে হলেও এটি আসলে নতুন নয়। আবহমান কাল হতেই তা চলে আসছে। কিন্তু মাত্রা অনেক কম ছিল। ১৯৭৮ সনের কথা। আমি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি.ভি.এম. তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। ভেটেরিনারি অনুষদে মেয়েদের প্রথম ভর্তি করা হয়। ক্লাশে শিক্ষক প্রবেশের অপেক্ষায়। আমার সামনের বেঞ্চের পরবর্তী সারিতে ছাত্রীরা বসে ছিল। আমার এক ক্লাসমেট বন্ধু এক বান্ধবীকে কিছু একটা বললেন। আমি তাকে বললাম তুই এ ধরনের কথা বলতে পারিস? বলা মাত্রই আমার কপালে জুটলো একটা ঘুসি। তাও হেভিওয়েট বক্সিং-এর মতই। আমি বোকা বনে গেলাম, ও কি করল? আমিও ছাড়বার পাত্র নই। পিছন থেকে চেয়ার ছুড়ে মারলাম ঐ বন্ধুকে। তাতে তার হাতের একটি আঙ্গুল ভেঙ্গে আজও বাকা হয়ে আছে। সে বলে, তোকে ঘুষি মারতে যেয়ে আমার আঙ্গুল ভেঙ্গেছি। আমি বলি চেয়ার ছুড়ে তোর হাতের আঙ্গুল ভেঙ্গে দিয়েছি। বর্তমানে সেও একজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা, মাঝে মধ্যেই এ ব্যাপারে রসিকতাও করি। যা হোক এটাই যে ছোট খাট ইভ টিজিং তা বুঝতে পারলাম ৩২ বছর পর। তবে, আমি একজন সাহসী প্রতিবাদী, যেহেতু প্রতিবাদ করেছিলাম। দিন যত যাচ্ছে, ইভটিজিং এর সংখ্যা দিনদিন বাড়ছেই। বখাটে ইভটিজারদের হাতে আহত ও নিহত হয়েছেন অনেক প্রতিবাদী ব্যক্তি। এরা পর্যায়ক্রমে মেয়েদের পিতা-মাতা, দাদা-নানা, ভাই-বোনসহ শিক্ষক, শিক্ষিকাকে বিভিন্ন সময়ে আহত ও হত্যা করছে। সত্যিকার অর্থে, এদের মনুষত্ববোধ দিনদিনই হ্রাস পাচ্ছে।

৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী রোজীনা খাতুন রুমা, বখাটে রিপন ও মোস্তফার দ্বারা ইভটিজিং এর শিকার হন। প্রতিবাদ জানানোর কারণে জীবন দিতে হলো ঐ মেয়ের নানা আবদুস সোবহান (৭৫) কে। তার বাড়ী নলেয়া গ্রাম, ফুলবাড়ী উপজেলা, কুড়িগ্রাম জেলায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই সাধারণ নিয়ম। সে অভিভাবকের "নিরব" অভিযোগ করেছিলেন, বিচার চেয়েছিলেন। এখানে আমরা কি দেখছি, অভিভাবক তার বখাটে ছেলের বিচারের পরিবর্তে ছেলের পক্ষনিয়ে মারামারিতে অংশ নিয়ে পিটিয়ে বাড়ীর উঠানেই হত্যা করে ঐ বৃদ্ধকে। এ ধরনের পরিবারের ছেলে-মেয়েরা চরিত্র গঠনে অভিভাবক হতে পারিবারিক, ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা নেয়ার সুযোগ পাবে কী ভাবে? যেহেতু অভিভাবকের আচরণ ও তার বখাটে ছেলের অবিকল। অনেকে বলেন, মেয়ের সাথে তার ভাব ছিল, হতেও পারে, তবে এটি মিথ্যে, কারণ ৯/১০ বছরের মেয়েদের সাথে যে কোন ছেলেদেরই ভাবের আদান প্রদান অযৌক্তিক।

একই কারণে প্রতিবাদ করায় বিগত ১২-১০-২০১০ ইং তারিখে শিক্ষক মিজানুর রহমানকে হত্যা করা হয় নির্মমভাবে। এর ২ দিন পরেই একই ধরনের ঘটনায় ফরিদপুরের মধুখালীতে বৃদ্ধা মাতা চাপারাণীকে হত্যা করে মাদক ব্যবসায়ীর বখাটে ছেলে দেবাশীষ সাহা একই পদ্ধতিতে। কারণ, মেয়ের ইভটিজিংকারীর বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন মা হয়ে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইভটিজিং প্রতিরোধ কমিটি গঠনের কথাও জানান। এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী।

মধুখালীর রসবাহিনী নামক বখাটে দল যাদের কাজই বখাটেপনা, চাঁদাবাজী ও ছিনতাই ইত্যাদি, এমন এক দলের সদস্য বখাটে সন্ত্রাসী সৈয়েদ মোল্লা বিগত ০২-০৯-২০১০ ইং তারিখে অপহরণ করে অজিত কর্মকারের বিবাহিত কন্যা বন্নাকে। আইন শৃংঙ্খলা বাহিনীর প্রতি জন-সাধারণ কতটা নির্ভরশীল হতে পারে? এ প্রশ্ন সবারই। এক্ষেত্রে পত্রপত্রিকার ভাষ্য মতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার প্রতিও অবহেলিত মানুষের মনে অবহেলার অভিযোগ থাকাটাই স্বাভাবিক। প্রতিবাদ করায় কুমিল-ায় এক শিক্ষকের পা ভেঙ্গে দিয়েছে বখাটেরা। অন্যদিকে, মেয়ের বাবা-মাকে আহত করেছে এক ইভটিজার। বিয়ের প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় এক ছাত্রীর হাত-পা ভেঙ্গে দিয়েছে এক বখাটে। ইতিমধ্যেই কয়েক ডজন অভিভাবককে আহত করেছে বখাটেরা। কারণ হিসেবে বলা যায়, বখাটেরা নিঃসন্দেহে অনৈতিকতায় আকণ্ঠ নিমিজ্জিত। এরা সমাজের কলঙ্ক। সমাজ ও দেশের উন্নয়নে বাধার কারণ। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী চলতি বছরের ১২ ডিসেম্বর/২০১০ ইং পর্যন্ত প্রতিবাদ করতে যেয়ে ১৯জন নিহত হয়েছেন। এবং অপবাদ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন ৩১জন।

ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা দুর্বল চিত্তের ও অভিমানী। এদের অনেকেরই আত্মসম্মান বোধ কাজ করে, যার ফলে অনেক ছোট অপমানে জীবনকে তুচ্ছ ভেবে আত্মহত্যা করে। মেয়েদেরও প্রতিবাদী হতে হবে। ইভটিজিং শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই হয় এমন নয়। অফিস, শিল্পকারখানা, পরিবহন, সিনেমা হল, দোকানপাট এবং মার্কেটও ঘটে। বখাটে এবং বেকার যুবকদের মধ্যেই এর প্রবণতা বেশী। অন্যদিকে উভয়ের মধ্যে মনের ভাব, বিয়ের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ বা বিয়ের প্রস্তাবে নারাজী থাকা ইত্যাদিও ইভটিজিং এর কারণ হতে পারে।

বর্তমানে ভ্রাম্যমান আদালত বিশেষভাবে তৎপর, দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েক ডজন ইভটিজারদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। আশা করা যায়, আইনের সঠিক বাস্তবায়নেই একমাত্র ভরসা এ ধরনের ক্যানসার হতে জাতিকে রক্ষা করা। আইনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সমাজ বা দেশের জনগণকে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে পরিচালিত করা। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, ইভটিজার হল এক শ্রেণীর বখাটে। এদের অনেকে রাজনৈতিক দলের নাম ভাঙিয়ে সমাজের সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতির মাধ্যমে ইভটিজিং এর চেয়েও জঘন্য অপরাধ করে। প্রকৃত অর্থে এরা দেশ ও দলের শত্রু। চরিত্র গঠনের প্রথম ধাপই হল শিশুকাল। উন্নয়নে ব্যাঘাৎ ঘটাতে এবং যুদ্ধাপরাধীর বিচারের বাধাগ্রস্ত করতে কিছু অপশক্তির ইন্ধন আছে কিনা তাও ভাববার বিষয়। কয়েকদিন পূর্বে আগ্নেয়াস্ত্র আতঙ্কের মাধ্যমে গোষ্ঠী সিন্ডিকেট তৈরী করে প্রাণিসম্পদে এস নামানোর উদাহরণও রয়েছে এ দেশে। ইভটিজিং ভিন্নধর্মী হলেও দেশের উন্নয়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধাগ্রস্ত করছে কোন কোন মহল। প্রতিরোধে দিনদিন জনগণ শক্তি সঞ্চার করছে। যেমন ২৫-১০-২০১০ ইং বগুড়ার ধনুট উপজেলা, মর্জিনা খাতুন সাহসের সাথে একই লম্পট ইভটিজারকে বটিহাতে প্রতিহত করেন। ফলে তাকে পুরস্কৃত করা হয়। এমনিভাবে জনগনই একদিন এদের উৎখাত করবে সমাজ থেকে। অনেক পিতা ইতিমধ্যেই তার ইভটিজার সন্তানকে থানায় সৌপর্দও করছেন। এরাই সত্যিকার অর্থে অভিভাবক, তাদের আন্তরিকতার সাথে অভিনন্দন জানাই।

ইভটিজিং এর মূল উৎস্য যেমন, সন্তানের ব্যাপারে পিতামাতাও, অভিভাবকের উদাসীনতা এবং খারাপ সহপাঠীদের সাথে সঙ্গ দেওয়া।

ছোটবেলা হতেই পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ও নৈতিক শিক্ষা হতে বঞ্চিত হওয়া।

মাদকাসক্ত বা মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত পরিবারের সন্তান।

যত্রতত্র অশ-ীল চলচিত্র প্রদর্শন, টিভিতে আপত্তিকর অনুষ্ঠান প্রচার এবং এর সিডির সহজ লভ্যতা।

মোবাইল ফোনের অপব্যবহার।

অশ-ীল সাইবার সন্ত্রাস, ইত্যাদি ইভটিজিং এর মূল উৎস।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নায়িকা বা নর্তকীদের আপত্তিকর পোষাক পরিধান করা।

ইভটিজিং হতে প্রতিকারের উপায় :

অপরাধের শাস্তির মেয়াদ বৃদ্ধি, অপরাধী ধরা ছোয়ার বাইরে থাকলে মালামাল ক্রোকের বিধান রাখা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশেষ স্থান গুলোতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারী বৃদ্ধি করা।

দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী ও পেশার সবাইকে যে কোন অপরাধের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সর্বতভাবে সহযোগিতা করা।

ইভটিজিং নামক ক্যান্সার হতে সমাজ তথা জাতিকে কলুস মুক্ত রাখতে হলে প্রথমেই পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান প্রত্যেকটি পিতামাতার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব মনে করা।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক শিক্ষা দান করা।

সবাই এই প্রতিজ্ঞা করি, এ ধরণের গর্হিত কাজ করে কলঙ্কের ঘানি আজীবন নিজেও টানবো না, মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনকে গ্লানিতে ফেলব না। মনে রাখতে হবে আজ যে ব্যক্তি অন্যের মেয়েকে ইভটিজিং করছে ভবিষ্যতে তার মেয়েও এ থেকে পরিত্রাণ পাবে না এটাই স্বাভাবিক। যেহেতু এটা সামাজিক ব্যাধি ক্যান্সার সমতুল্য। ইভটিজিং করে বখাটে ও লম্পট হিসেবে নিজেকে সমাজে আত্মপ্রকাশ করানো যায়। কিন্তু জোর করে ভাল মানুষ সেজে ভালবাসা আদায় করা যায় না। একটি কথা মনে রাখতে হবে, আমরা সবাই এদেশের নাগরিক এবং ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্থান দখল করে নেয়। বিশ্বের দরবারে দেশের মানমর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে দলমত নির্বিশেষে এক যোগে কাজ করতে হবে। এটাই হবে সবার জন্য মহান কাজ। এর ব্যতিক্রম হলে আমরা সবাই, নিজের এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের ধ্বংসের জন্যই যথেষ্ট।

হত্যার পরিবর্তে হত্যার বিধান রয়েছে। বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা জঘন্যতম অপরাধ (আল-কোরান সূরা আল বাকারা আয়াত নং-১৭৮ ও ২১৭)।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান মেডিসিন, সার্জারী এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দিনাজপুর।
মোবাইল : ০১৭৫০০৯০৪৫৮

বিশ্বের দরবারে দেশের মানমর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে দলমত নির্বিশেষে এক যোগে কাজ করতে হবে। এটাই হবে সবার জন্য মহান কাজ। এর ব্যতিক্রম হলে আমরা সবাই, নিজের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ধ্বংসের জন্যই যথেষ্ট।

www.kalerkantho.com

১৪

কালের কণ্ঠ

রবিবার। ৩০ নভেম্বর ২০১৪। ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২১

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

ছাত্ররাজনীতি কার স্বার্থে?

নিজের ঘরের কথা যে বলে, সে যে বোকা এটাই স্বাভাবিক, তবে মাদকাসক্ত ছেলেকে মা-বাবা কখন থানায় পাঠায়, যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়। বর্তমানে ছাত্রসংগঠক নামধারী কিছু নেতার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অবস্থানও সেইরূপ। ডিজিটাল পদ্ধতিতে নকল দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে। এ ধরনের কাজ যারা করছে, তারা ডিজিটাল সন্ত্রাসী

বর্তমান প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হচ্ছে, রাজনীতিতে ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু কিছু ছাত্রনেতার অনৈতিক কার্যকলাপ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ছাত্ররাজনীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। তাদের এই অনৈতিক কার্যকলাপ অভিভাবক, সুধীজন, রাজনীতিবিদসহ সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা চিন্তিত ও শঙ্কিত।

যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে, তখন বিভিন্ন সংগঠনের নামে সেই দলের দিকে ঝুঁকে পড়ে এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী। দলের দোহাই দিয়ে অনৈতিক কার্যক্রম চালায়, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজি দ্বারা পকেট ভারী করতে থাকে। মনে হয়, জীবনে এটিই শেষ সুযোগ। তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার দ্বারা মানুষ যেমন উপকৃত হয়, তেমনি অপব্যবহার বা অনৈতিক কাজ বা ব্যবহার দ্বারা দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উল্লেখ্য, ৪ নভেম্বর ২০১৫ শিক্ষাবর্ষের বিকেল ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত 'এ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা চলাকালীন হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি) দিনাজপুরে বিশেষ ইলেকট্রনিকস ডিভাইসযুক্ত ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে নকলরত অবস্থায় ধৃত পরীক্ষার্থীর (রোল নম্বর ১০৮৯৪১) জবানবন্দিতে ও উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনে তিনজন ছাত্রনেতার পরাসরি জড়িত থাকার প্রমাণ মেলে।

নিজের ঘরের কথা যে বলে, সে যে বোকা এটাই স্বাভাবিক, তবে মাদকাসক্ত ছেলেকে মা-বাবা কখন থানায় পাঠায়, যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়। বর্তমানে ছাত্রসংগঠক নামধারী কিছু নেতার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অবস্থানও সেইরূপ। ডিজিটাল পদ্ধতিতে নকল দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে। এ ধরনের কাজ যারা করছে, তারা ডিজিটাল সন্ত্রাসী। এদের দমন করা প্রয়োজন। দিন দিন ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভর্তির সুযোগ পাওয়া যেন সোনার হরিণ পাওয়া। প্রায় প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে মা-বাবা সন্তানকে নিয়ে হোস্টেল ভাড়া করে ভর্তির সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন। প্রতিটি আসনের বিপরীতে ৩০ থেকে ৪০ জন ছাত্রকে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হয়। ১৯৯৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে হাবিপ্রবি যাত্রা শুরু হয়। ২০১২ সালে নিয়োগ দেন মাননীয় উপাচার্য মো. রুহুল আমিনকে। তিনি প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের সভাপতি এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের সম্মানিত সভাপতি। ২০০৯ পর্যন্ত প্রায় দুই বছর এই পদে (ভিসি) সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর সৎ ও দক্ষ নেতৃত্বে একাডেমিক (লেখাপড়া) ও অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটেছে রাতারাতি। তিনি প্রায়ই শিক্ষক, কর্মকর্তা, ছাত্রছাত্রী ও কর্মচারীদের উদ্দেশে বলেন, বিনির্মাণ করতে হবে। ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। যার যার অবস্থান থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহযোগিতায় উন্নয়নে অংশ নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত চিন্তার জায়গা। মুক্ত চিন্তার মানুষ, মুক্ত চিন্তার গবেষক তৈরি হবে এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। অনেক চিন্তাভাবনা মাথায় নিয়ে কত কম খরচে বেশি কিছু করা যায়, এ উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে পরিত্যক্ত গাড়ির গ্যারাজ রিমডেলিং করে, রং মেখে কয়েকটি প্লাস্টিক চেয়ার সাজিয়ে তৈরি করেছেন ছাত্রীহলের ক্যান্টিন, ফেলে দেওয়া বার্বেড ওয়্যার দিয়ে তৈরি করেছেন লেডিজ হোস্টেলের কাঁটাতারের বেড়া। পুরনো দেয়ালের অতিরিক্ত অংশ ভেঙে করেছেন হাজারো ছাত্রের বসার স্থান, টিএসসি (নির্মাণাধীন), ড. ওয়াজেদ ভবন পঞ্চমতলা শেষ পর্যায়ে (নির্মাণাধীন), মসজিদ, লাইব্রেরি, ঘাট বাঁধানো পুকুর, ব্যাচেলর কোয়ার্টার, লেডিস হোস্টেল, শিক্ষক কোয়ার্টারসহ (নির্মাণাধীন) বিভিন্ন কাজেই তাঁর ছোঁয়া। এককথায় বর্তমান উপাচার্যের সততা, অদম্য ইচ্ছা, সাহসিকতা, আন্তরিকতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্রুতগতিতে উন্নয়নের ছাপ পড়ছে। তবে দুঃখের বিষয়, সেই চাঁদাবাজ, ডিজিটাল জালিয়াতির নায়ক যে আমাদের কোনো প্রিয় ছাত্র, যে ছাত্ররাজনীতিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে নানা ধরনের অন্যায় করছে, ছাত্রদের কাছ থেকে হলে সিটের কথা বলে চাঁদা তুলে পকেট ভারী করছে। চাঁদা না দিলেই বিপদ, হলের সিট বাতিল ও দৈহিক লাঞ্ছনা। বিল্ডিং তৈরিতে চাঁদা, কেন্দ্রীয় মসজিদের বারান্দা সম্প্রারণকাজে চাঁদা—এমনকি যোগ্যতাবলে শিক্ষক নিয়োগের পরও চাঁদা না দিলে রাজাকার নাম বসিয়ে অসম্মান করতে এরা একটুও দ্বিধা বোধ করে না। এমনিভাবে মাত্র ১৫-২০ জনের একটি দল দাবড়ে বেড়াচ্ছে হাবিপ্রবিতে। এরা কারা? এরা কি সত্যিকারের ছাত্রলীগ, না অন্য কারো পক্ষের লোক? তা ছাড়া ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও তার তৈরি দলের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। মাননীয় ভিসি মহোদয়ের কাছ থেকে অনৈতিক সুযোগ না পাওয়ায় একজন সৎ ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে তারা উঠেপড়ে লেগেছে।

অন্যায় আচরণের জন্য প্রাপ্ত বহিষ্কারাদেশ তুলে নেওয়ার জন্য তারা সাধারণ ছাত্রদের হল থেকে বের করে রাত ১টা পর্যন্ত আন্দোলনের নামে অসভ্যতা করেছে। অশ্লীল ভাষায় স্লোগান দেওয়া, বিভ্রান্তিকর তথ্যসংবলিত দেয়ালিকা প্রদর্শন, কুশপুতলিকা দাহসহ আরো কত কী! ওই ছাত্রনেতা নামধারীরাই বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। এরা পাঁচ বছরের শিক্ষাজীবনকে ১২ বছরে রূপ দিয়ে কোটি টাকার সম্পদের মালিক হয়েছে বলে জানা যায়।

শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক মধুর। সন্তান সমতুল্য। তারা লেখাপড়া করে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হোক—এটাই সব শিক্ষকের চাওয়া-পাওয়া। ছাত্ররা শিক্ষকদের ঋণ কোনো দিন শোধ করতে পারবে না। শিক্ষকরাও চান না কোনো ছাত্র কর্মজীবনে গিয়ে এক কাপ চা পান করাক। তার পরও যখন শুনি, কোনো একজন ছাত্র ভালো পজিশনে আছে, গর্ব হয়। আমরা সুস্থ ছাত্ররাজনীতি চাই, রাজনীতির নামে দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চাই না। আজ সরকারও এসব ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে। বাস্তবে আমরা তার প্রমাণ দেখতে আগ্রহী।

লেখক : অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

৪৭

কালের কণ্ঠ
২৪ জুলাই ২০১৩, বুধবার

মো. ফজলুল হক ▶

কল-কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

অগ্নিকাণ্ড বা অগ্নিসংযোগের ঘটনা আদিকাল থেকেই ঘটে আসছে। কুপি, মাটির চুল্লি, মোমবাতি, মশার কয়েল, ছাইয়ের স্তূপ বা বিড়ি-সিগারেটের আগুন থেকেই ছন ও বাঁশের কুঁড়েঘর বা টিনের ঘরে আগুন ধরে থাকে। মুহূর্তেই নিঃশেষ হয়ে যায় ঘরে সংরক্ষিত ধান, চাল, পেঁয়াজ, রসুন থেকে শুরু করে গরু-ছাগলসহ সব কিছু। আগুন নেভানোর জন্য ব্যবহার হতো পুকুর, নদী, খাল ও বিলের পানি। আন্তরিকতার সঙ্গে আগুন নেভাতে ঝাঁপিয়ে পড়ত এলাকাবাসী। যথাসম্ভব চেষ্টা করত জানমাল রক্ষায়। এলাকাবাসী নিঃস্ব ব্যক্তিকে সাহায্য করত বাঁশ, ছন বা টিন, কাপড় ও রান্না করা খাবার দিয়ে। এমনকি ধান-পাটের বীজ দিয়ে সাহায্য করা হতো প্রয়োজনের সময়। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যত ধরনের আন্তরিকতা থাকা দরকার তার কোনো অভাব ছিল না সেই অতীত যুগে। বর্তমানে গ্রামগঞ্জে অগ্নিকাণ্ড ও অগ্নিসংযোগ হ্রাস পাওয়ার কারণ হচ্ছে ঘরবাড়ি সব কিছুই এখন পাকা, আধাপাকা ও টিনের। এ ছাড়া মানুষও সচেতন। বর্তমানে আগুন লাগার কারণ বা উৎস ভিন্নতর। গ্যাস, চুল্লি ও বিদ্যুৎ লাইনে শর্টসার্কিটই প্রধান। গ্যাসের চুল্লি জ্বালিয়ে রাখা, চুলক্রমে নেভানো চুল্লির সুইচ চালু রাখা, গ্যাস সিলিন্ডার ও গ্যাস লাইন বিস্ফোরণ ইত্যাদি। সবচেয়ে বিপজ্জনক কারণের অন্যতম হলো বিদ্যুৎ লাইন থেকে অগ্নিকাণ্ড। যখন শর্টসার্কিট হয় তখন দুটি পজিটিভ ও নেগেটিভ তার একত্র হয়। এ পর্যন্ত যত বড় ধরনের ঘটনা ঘটেছে তা হলো বিদ্যুৎ লাইনের শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড। বিগত কয়েক বছরে অগ্নিকাণ্ড ও অগ্নিসংযোগের কারণে জান ও মালের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। যেমন ২০১১ সালে বসুন্ধরা সিটিতে অগ্নিকাণ্ড, ২০১২ সালে স্টিল মিল করপোরেশন অফিসে অগ্নিকাণ্ড, তাজরীন গার্মেন্টে অগ্নিকাণ্ডে (১২০ জনের প্রাণহানি ও কয়েক শ আহত), মিরপুর ১ নম্বর সেকশনের গার্মেন্টে অগ্নিকাণ্ডে (মালিকের মৃত্যু), মোহাম্মদপুরে স্মার্ট এক্সপোর্ট ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকাণ্ডে (৭ শ্রমিকের মৃত্যু), রাজধানীর তল্লাবাগে অগ্নিকাণ্ডে (নিউ মডেল স্কুলের ছাত্রের মৃত্যু), নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে অগ্নিকাণ্ড, আগারগাঁও বস্তিতে (কয়েকটি শিশুর মৃত্যু) অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি। প্রাণনাশের পাশাপাশি আহত হয়েছে বেশ কয়েক শ। সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ শত শত কোটি টাকা। এ ছাড়া বিশ্বের অনেক দেশে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, গভীর বনে দাবানল ইত্যাদি। অগ্নিকাণ্ডের মূল কারণ হচ্ছে, অদক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান দ্বারা বাসাবাড়ি ও ইন্ডাস্ট্রিতে বিদ্যুৎ লাইন বসানো; তারের বাইরের আবরণ Insulated wire-এর ক্ষেত্রে দুর্বল হওয়া; তারের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত লোড ব্যবহার করা; বিদ্যুৎ Connection-এর প্রয়োজনীয় সকেট, সুইচ ইত্যাদিতে সমস্যা; বেআইনিভাবে চোরা লাইন ব্যবহার করা; হিটার ব্যবহার যা তারের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে অগ্নিকাণ্ড হতে পারে। এ ছাড়া রয়েছে পিপীলিকা, তেলাপোকা, ইঁদুর, টিকটিকিসহ বিভিন্ন প্রাণীর কর্মকাণ্ড। এ ক্ষেত্রে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো পিপীলিকা তারের বহিরাবরণ অর্থাৎ তারের প্লাস্টিক ত্বক বা আবরণ এমনভাবে খায় যে, তারকে উন্মুক্ত করে ফেলে। এ ক্ষেত্রে পজিটিভ ও নেগেটিভ তারদ্বয় একত্র হয়ে বাসাবাড়িতে আগুন লাগার একটি বড় কারণ বলে মনে হয়। শর্টসার্কিট হলে প্রথমেই তারের প্লাস্টিক আবরণটিতে আগুন ধরে। জ্বলন্ত আগুনসহ নিচে ঝরে পড়তে থাকে ফলে ওই স্থানে রাখা জিনিসপত্রে আগুন ছেগে সমগ্র ঘরে ছড়িয়ে পড়ে লেলিহান শিখায়। এভাবেই বিদ্যুৎ থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ ক্ষেত্রে গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি, পাটকল ও সুতার মিলগুলো বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এখন আমাদের করণীয় কী? বিগত ৫০-৬০ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, অগ্নিসংযোগ বা অগ্নিকাণ্ডের কারণ যাই হোক না কেন সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে পানি, বালু বা ভিজা কম্বল দ্বারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করা। সম্ভব না হলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে পড়ুন। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিস অফিসে খবর দিন। এ ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে সে জন্য কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন যেমন, বাসাবাড়িতে ভালো কম্পানির ব্র্যান্ডের তার ব্যবহার করতে হবে; অভিজ্ঞ ইলেকট্রিশিয়ান দ্বারা বিদ্যুৎ লাইনের কাজ করাতে হবে; কাজের তদারকির দায়িত্ব থাকবে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারদের ওপর; গ্রিডলাইন থেকে সার্ভিস তারটি হতে হবে যথাযথ ও মানসম্পন্ন, যা প্রকৌশলীদের দ্বারা পরীক্ষিত। বাসা ও মিল-কারখানা পিপীলিকা, তেলাপোকা, ইঁদুর, এমনকি সাপ থেকে মুক্ত রাখুন। সাপ ট্রান্সফর্মারের বড় শত্রু। সাপের কারণে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ট্রান্সফরমার এরই মধ্যে শর্টসার্কিটের মাধ্যমে বিকল হয়েছে। বাসা, মিল, কল-কারখানা ও ছাত্রাবাসে হিটার ব্যবহার থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। বাসাবাড়ির বিদ্যুৎ বক্সে ছোটখাটো পয়েন্ট বরাবর নিচে আসবাবপত্র, কাপড়চোপড় বা দাহ্য পদার্থ রাখা নিরাপদ নয়। ফায়ার সার্ভিস, বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার একাধিক মোবাইল বা টেলিফোন নম্বর ঘরের দরজায় লটকে রাখুন। বাসাবাড়িতে প্রবেশপথটি এমন হতে হবে যাতে ফায়ার সার্ভিস ও অ্যাম্বুলান্স প্রবেশ করতে পারে; প্রতিটি বাসাবাড়িতে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র (ফায়ার স্টিংগুইশার) ঝুলিয়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে পরিবারের সব সদস্যকে ব্যবহারবিধি জানিয়ে বা শিখিয়ে দেওয়া; বাসা ত্যাগ করার আগে ফ্যান, লাইটসহ সব কিছু বন্ধ রাখা; গ্যাস চুল্লির সুইস বন্ধ রাখার বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। অধিক সময়ের জন্য বাসাবাড়ি ত্যাগ করলে মেইন সুইচ অফ রাখা নিরাপদ। বাসার মধ্যে কাউকে রেখে তালাবন্ধ করা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ, যা বিগত কয়েক দিন আগে ঘটে গেল। সর্বোপরি প্রবেশ বহির্গমন পথ প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাল্টিস্টোরিড সুউচ্চ ভবনের ছাদে হেলিপ্যাডের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

অগ্নিসংযোগ একটি দুর্ঘটনা, যা যেকোনো সময়, যেকোনো স্থানে, যেকোনো ব্যক্তির জীবনেই আসতে পারে। ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টি মোকাবিলা করতে হবে। সমাধানে সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে। ক্ষতির পরিমাণ বছরে কোটি কোটি টাকা, মানুষ ও গৃহপালিত প্রাণীর জীবনও অকালে ঝরে যায়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং বাসাবাড়িতে বসবাসকারী সবাইকে অগ্নিসংযোগের বিভিন্ন কারণ, আত্মরক্ষার কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সচেতনতা হতে পারে একটি ছোট উদ্যোগ, যা বড় একটি দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে সম্পদ ও মূল্যবান জীবন।

লেখক : অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর
fhoque.hstu@gmail.com

অগ্নিসংযোগ একটি দুর্ঘটনা, যা যেকোনো সময়, যেকোনো স্থানে, যেকোনো ব্যক্তির জীবনেই আসতে পারে। ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টি মোকাবিলা করতে হবে। সমাধানে সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে

www.kalerkantho.com
কালের কণ্ঠ
১৪
২২ জুন ২০১৩, শনিবার
সম্পাদকীয়

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

সিটি নির্বাচন ও কাঙ্ক্ষিত নিরপেক্ষতা

১৯৮৩ সালে সরকারি চাকরিতে (ক্যাডার সার্ভিস) যোগদানের পর ২০০৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৫ বছরে পাঁচটি সংসদ নির্বাচন, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছি। সেখানে ভোট চুরি, ভোট বাক্স ছিনতাই, ব্যালট পেপার হাতাহাতি, মারামারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখার ও প্রতিরোধ করার সুযোগ হয়েছে। হাঁ/না ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনও হয়েছে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আমার কেন্দ্রটির ভোটগ্রহণ শতভাগ সঠিক হয়েছিল। তবে বিশেষভাবে আলোকপাত করার বিষয়টি হচ্ছে ১৫ জুন ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত চারটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন বিগত সব নির্বাচনের ওপর ছাপ করে নিয়েছে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ করে দিয়েছে সরকার। কয়েকটি ছোটখাটো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও ভোটগ্রহণ ও প্রয়োগে বাধার সৃষ্টি হয়নি। এ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার প্রমাণ করেছে, নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়াই নিরপেক্ষ থেকে জাতীয় নির্বাচন করা সম্ভব। আরো অবাক করার বিষয় হচ্ছে, সরকারি দলের মেয়র পদপ্রার্থীরা পরাজয়কে মেনে নিয়ে জয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করে শুভেচ্ছা বিনিময় ও মিষ্টিমুখ করেছেন, ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। বিগত সময়ের কালচার ছিল হেরে গেলেই ভোট কারচুপি হয়েছে, জিতলে সঠিক হয়েছে। তার পরও অবাক করেছে কয়েকটি মন্তব্য। সেখানে ১৮ দলের মন্তব্য হলো– পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছে ইসি ও সরকার, ফল পাল্টে দিতেই সেনা মোতায়েন করা হচ্ছে না, কামরানকে জেতাতে মরিয়া আওয়ামী লীগ ইত্যাদি। লিফলেটের মাধ্যমে আপত্তিকর বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে বলেও জানা যায়। শত বাধা ও আপত্তির মুখে এ ধরনের একটি নির্বাচন উপহার দেওয়ায় দেশবাসীর পক্ষ থেকে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সব সদস্যই ধন্যবাদ পাওয়ার দাবি রাখেন। এ নির্বাচনে বিশ্ববাসী জানতে পেরেছে বাংলাদেশ একটি ন্যূনতম প্রধান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, বিরোধী দল হেরে গেলে হরতাল, অবরোধসহ সহিংস ঘটনা ঘটবেই। এ সংশয় ও সন্দেহ ছিল প্রায় সবার মধ্যে।

বিগত সাড়ে চার বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে চার হাজার ৬৪৯টি বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে। এ সরকার সিটি করপোরেশন নির্বাচনের মাধ্যমে আবারও প্রমাণ করল তাদের অধীনে তত্ত্বাবধায়ক, নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া জাতীয় নির্বাচন হওয়া সম্ভব। জনগণও বুঝতে পেরেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুটি অত্যন্ত দুর্বল ও অযৌক্তিক। অধ্যাপক আবদুল মান্নান, সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এক টক শোতে মন্তব্য করেন বর্তমান সরকারের আমলে যে উন্নয়ন ঘটেছে তা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু

> সিংহভাগ ভোটারই নিরপেক্ষ থেকে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেন। তাঁদের ভোটেই পালাবদল হয়। তাঁদের হিসাব-নিকাশই আসল। নির্বাচনের এক ঘণ্টা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন অনেকে

জনগণকে তা সঠিকভাবে বোঝাতে পারছেন না আওয়ামী লীগ। নেতা-কর্মী ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে। আমাদের অর্থনীতির সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান একই ধরনের মন্তব্য করেছেন টক শোতে। এ বিষয়ে আমিও একমত পোষণ করছি, বর্তমান সরকারের সময়ে যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটলেও তা জনসমক্ষে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে না। দেশের উন্নয়নের বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে, অন্যথায় আওয়ামী লীগ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার চেয়েও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এ দেশের উন্নয়নের গতি। উন্নয়নের এ চাকা থেমে যাবে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে। গত নির্বাচনে ১৮ দলের পক্ষে বড় বিজয়কে সাধুবাদ জানাই। তবে যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর চিন্তায় মগ্ন হলে হিতে বিপরীতও হতে পারে। সিংহভাগ ভোটারই নিরপেক্ষ থেকে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেন। তাঁদের ভোটেই পালাবদল হয়। তাঁদের হিসাব-নিকাশই আসল। নির্বাচনের এক ঘণ্টা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন অনেকে। অনেক সময় নির্বাচনের ফলাফল হতে পারে ক্রিকেট খেলার মতোই। সুতরাং নিরাশ হওয়ার কিছু নেই কোনো পক্ষের। অনেক সময় শোনা যায়, ভোট টাকা দিয়েও কেনা যায়। ভোট কেনা যায় এমন বাস্তব উদাহরণও রয়েছে। আওয়ামী লীগ প্রচারে দুর্বল, গণসংযোগও সঠিক হচ্ছে না—এমন মন্তব্যও করেছে বিশেষজ্ঞ মহল। ১৮ দলের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জামায়াতে ইসলামী, যাদের কর্মীরা জীবন বাজি রেখে কাজ করে। ইসলামের কথা বলে তারা ভোট চায়। হক্কানি আলেমদের ভাষ্যমতে জামায়াতে ইসলামী প্রকৃত অর্থে কোনো ইসলামিক দল নয়, কিন্তু ইসলামিক নামকরণের কারণে সাধারণ মানুষ ধর্মীয় অনুভূতিতে আকৃষ্ট হয়ে তাদের ভোট দেয়। তা ছাড়া জামায়াতে ইসলামীর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। যাঁর রয়েছে হাজার হাজার ভক্ত। যাঁরা তাঁকে চাঁদের দেশের মানুষ মনে করেন। সাঈদী সাহেব একজন বড় মাপের আলেম, মওদূদী মতাদর্শে বিশ্বাসী একজন যুদ্ধাপরাধী। অথচ এই মওদূদী সাহেব ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে ক্ষতি করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। সাহাবিদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' নামক বই লিখে বিধর্মীদের বাহবা পেয়েছেন। উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলেম মাওলানা শামছুল হক (সদর সাহেব) তাঁর ভুল সংশোধন বইটিতে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। হেফাজতে ইসলামের নেতারাও বক্তব্যের মাঝে এ বিষয়ে কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুতরাং সিটি করপোরেশনের মতো অনুরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক—এটিই জনগণ আশা করে। তাহলে দলমত নির্বিশেষে দেশ ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে গণতন্ত্র সঠিকভাবে পরিচালিত হবে—এ প্রত্যাশা সবার।

লেখক : অধ্যাপক হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
fhoque.hstu@gmail.com

সম্পাদকীয়

www.ittefaq.com.bd

শুক্রবার ৩০ পৌষ ১৪১৮ ■ ১৩ জানুয়ারি ২০১২ | দৈনিক ইত্তেফাক | পৃষ্ঠা ৮

৩০তম বিসিএস-এ ভেটেরিনারি সার্জন নিয়োগ সম্পর্কে

৩০তম বিসিএস-এ ভেটেরিনারি সার্জন পদে চিকিৎসকদের পরিবর্তে অ্যানিমাল হাজবেন্ড্রি (এএইচ) গ্রাজুয়েট নিয়োগের ভুল সুপারিশ করেছেন পিএসসি। বিসিএস প্রাণিসম্পদ ক্যাডারের অধীনে দুই ধরনের গ্রাজুয়েটদের নিয়োগ দেয়া হয়। ভেটেরিনারি গ্রাজুয়েটগণ প্রাণির চিকিৎসা, রোগের দমন ও প্রতিরোধ, চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা, প্রাণির উৎপাদন এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে সক্ষম এবং এজন্য তাদেরকে পাঁচ বছর মেয়াদি ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম) ডিগ্রি অর্জন করে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে চিকিৎসা পেশায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। অন্যদিকে সাড়ে চার বছর মেয়াদি অ্যানিমাল হাজবেন্ড্রি (এএইচ) গ্রাজুয়েটগণ শুধুমাত্র প্রাণি পালন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং এজন্য তাদেরকে অ্যানিমাল হাজবেন্ড্রি (এএইচ) ডিগ্রি অর্জন করতে হয় এবং কোনো প্রকারের রেজিস্ট্রেশন নিতে হয় না। সঙ্গত কারণেই প্রাণির চিকিৎসা বিষয়ে ন্যূনতম ধারণা না থাকায় ৩০তম বিসিএস-এ ডক্টর অব ভেটেরিনারি ডিগ্রিধারীদের জন্য ভেটেরিনারি সার্জন/ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/ প্রভাষক পদে ২১৮ জন এবং অ্যানিমাল হাজবেন্ড্রি ডিগ্রিধারীদের জন্য পিভিও/ এপিও/ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/ প্রভাষক পদে ৫৯ জন লোক চেয়ে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। ২১৮টি পদ ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন ডিগ্রিধারীদের দ্বারা এবং ৫৯টি পদ অ্যানিমাল হাজবেন্ড্রি ডিগ্রিধারীদের দ্বারা পূরণ হওয়ার কথা কিন্তু ৩০তম বিসিএস-এর চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায় অ্যানিমাল হাজবেন্ড্রি ডিগ্রিধারীদের রোল ভেটেরিনারি সার্জন/ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/ প্রভাষক পদের বিপরীতে প্রকাশ করা হয় যা সরকারি নিয়োগবিধির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই ধরনের একটি সমস্যা গত ৯ম বিসিএস-এ সংঘটিত হওয়ায় আদালতের মাধ্যমে সেই নিয়োগকে বেআইনি ঘোষণা করে নিষিদ্ধ করা হয়। বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন থাকা অবস্থায় ১৮তম বিসিএস পর্যন্ত এই ক্যাডারে কোনো লোক নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি যার ফলে এই সেক্টরটি চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। বর্তমান সময়ে যখন সেক্টরটি এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে শুরু করছে ঠিক তখন নতুন করে ঐ বিষয়টি এই সেক্টরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে। তাই অবিলম্বে ৩০তম বিসিএস-এর প্রাণিসম্পদ ক্যাডারের ফলাফল সংশোধনসহ পুনঃপ্রকাশ করে এই সমস্যা সমাধানের জন্য পিএসসিসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা চেয়েছেন ভাইভা উত্তীর্ণ ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন ডিগ্রিধারীরা। একইভাবে ৩১তম বিসিএস-এর বিজ্ঞপ্তিতে অ্যানিমাল হাজবেন্ড্রি ডিগ্রিধারীদের জন্য পিভিও/ এপিও/ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/ প্রভাষক পদে কোনো শূন্যপদ উল্লেখ না থাকলেও অ্যানিমাল হাজবেন্ড্রি ডিগ্রিধারীদের পেশাগত বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। তাই এখানেও ৩০তম বিসিএস-এর মতো ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন ও অ্যানিমাল হাজবেন্ড্রিকে গুলিয়ে ফেলার আশঙ্কায় ভুগছেন পরীক্ষার্থীরা। তাই এই বিষয়ে অতিশীঘ্রই সুষ্ঠু সমাধান হওয়া আবশ্যক। এ ধরনের জটিলতার পুনরাবৃত্তির অর্থই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা পিএসসিতে দক্ষ জনবলের অভাব। অন্যদিকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কতিপয় ব্যক্তি ও বিশেষ গ্রুপ ব্যক্তিস্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য ভুল তথ্য দিয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে (পিএসসি) বার বার বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া একান্ত প্রয়োজন।

সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো প্রয়োজন, অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি ডিগ্রিটিতে প্রাণিসম্পদ বিষয়ের মোট কোর্স কারিকুলামের মাত্র ২৩-২৫% পড়ানো হয় যা কনভেন্সকোর্সের সমমানের। অন্যদিকে ভেটেরিনারি সাইন্সের গ্রাজুয়েটরা ১০০% (উৎপাদন+চিকিৎসা) বিষয়ে লেখাপড়া করে থাকেন। বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভেটেরিনারি সায়েন্সে আন্তর্জাতিক মানের পূর্ণাঙ্গ ডিভিএম ডিগ্রি দেয়া হচ্ছে। এ সেক্টরে শূন্য পদ থাকা সত্ত্বেও নিয়োগে জটিলতার কারণে বর্তমানে প্রায় দুই হাজার ভেটেরিনারি গ্রাজুয়েট বেকার।

অতএব, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সার্বিক হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় অ্যানথ্রাক্স, ব্রুসেলোসিস, জলাতংক, বার্ডফ্লুসহ বিভিন্ন মারাত্মক জোনোটিক রোগ দ্বারা প্রাণিসম্পদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব পিএসসি সঠিক পদক্ষেপ নিবে— এটিই সবার প্রত্যাশা।

ডা. মো. ফজলুল হক,
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান, মেডিসিন, সার্জারি এ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

ডাঃ মোঃ ফজলুল হক

১৪ | দৈনিক ইত্তেফাক
ঢাকা : রবিবার ৯ কার্তিক ১৪১৭
SUNDAY 24 OCTOBER 2010

জলাতঙ্ক: ক্ষতির শিকার প্রাণিসম্পদ

জলাতঙ্ক রোগের প্রধান বাহক কুকুর। এছাড়াও শেয়াল, বেড়াল, বেজী, বানরের কামড়, আঁচড় বা লালায় এ ভাইরাস মানুষসহ যেকোনো সুস্থ প্রাণীর দেহে ছড়ায়। বছরে কত গবাদিপশু জলাতঙ্কে মারা যায় এর কোনো পরিসংখ্যান না থাকলেও প্রতি বছর ৫০ হাজার টিকা উৎপাদন এবং লক্ষাধিক গবাদিপশু জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্তের ফলে সহজে অনুমান করা যায় প্রতি বছর ৫০ হাজার গবাদিপশু মারা যায়।

কামড় দেওয়ার সাথে সাথে ক্ষতস্থানটি সাবান-পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। সাবান না থাকলে শুধু পানি দিয়ে ধুয়ে ভেটেরিনারি সার্জন (গবাদি প্রাণীর ক্ষেত্রে) অথবা মেডিক্যাল অফিসারের সাথে পরামর্শক্রমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে টিকা দিতে হবে। সঠিক সময় জলাতঙ্কের টিকা দিলে ১০০ ভাগ সুস্থ হওয়া সম্ভব, তেমনি টিকা না দিলে ১০০ ভাগ প্রাণীর মৃত্যু অবধারিত। পাগলা কুকুরের লালার মাধ্যমে ক্ষত স্থান দিয়ে জলাতঙ্ক ভাইরাস শরীরে প্রবেশের পর এ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ওই স্থানের স্নায়ুতন্ত্রের শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রবেশ করে। সেখান থেকে লালাগ্রন্থিও নাকের কোষকে আক্রমণ করে, ফলে খাওয়া বন্ধ, মুখ দিয়ে লালা নির্গত হওয়া, পাগলামী করা, শিং দিয়ে মারতে আসা, গলার স্বর বসে যাওয়া, ডাকাডাকি, অল্প অল্প প্রস্রাব করা, কান খাড়া করে সতর্কতাভাব দেখানো, চক্ষু লাল ইত্যাদিসহ আক্রান্ত পশু খাওয়া বন্ধ, শান্ত ও কিমুনি হয়ে ৮/১০ দিনের মধ্যে মারা যাবে।

পাগলা কুকুর বেশির ভাগ সময়ে গবাদিপশুর মুখে কামড় দেয়। কামড়ানোর পর ১৫ থেকে ১৮০ দিনের মধ্যেই রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। উল্লেখ্য, মাথা হতে কামড়ের স্থান যত দূরে হবে সে অনুযায়ী রোগের উপসর্গ প্রকাশ দেরিতে ঘটবে। মাথা বা নাকে, মুখে কামড়ালে ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যেই রোগের উপসর্গ দেখা দেবে। এভাবে পেছনের পায়ে বা লেজের মাথায় কামড়ালে ১৬০ থেকে ১৮০ দিনের মধ্যেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবে।

ডাঃ মোঃ ফজলুল হক
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

www.kalerkantho.com

কালের কণ্ঠ

১৪

২৬ অক্টোবর ২০১৩, শনিবার

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন

এর আগে দেখেছি, সমাজে যাঁরা বিত্তবান, সৎ তাঁরাই বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনে সদস্য নির্বাচিত হতেন। প্রয়োজনে জমি বিক্রি করে জনসেবা করতেন। সারা বছরই ভালো ব্যবহার দ্বারা নিজের পক্ষে ভোটের অঙ্ক ভারী করতেন। সে কারণে নির্বাচনের সময় তাঁদের জয়ী হতে কোনো সমস্যাই হতো না, এমনকি অর্থ খরচও করতে হতো না। বর্তমানে নির্বাচিত হওয়ার পর অনেক সদস্যই ভোটারদের খোঁজখবর রাখেন না। ফলে নির্বাচনের সময় ভোটারদের ভোট পেতে এতটাই নিচে নামতে হয়, যেন শেষ সম্মানটুকু রক্ষা করা দায়।

প্রকৃতপক্ষে ভোট দেওয়া হতো সৎ ও যোগ্য প্রার্থী দেখেই। কারণ ভোট একটি পবিত্র আমানত, যদি পড়ে যোগ্য পাত্রে। একজন ভোটার যে কেউই হোন না কেন, পেশা যাই হোক—নারী বা পুরুষ, তাঁর ভোটের মূল্য সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্ব বহন করে। তাঁর ভোটেই দেশ ও জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। যোগ্য প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিলেই নাগরিক হিসেবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা হলো বলেই বিবেচিত হবে। বেশির ভাগ ভোটার ভোট দেন যোগ্য প্রার্থী দেখেই। অনেক ভোটার ভোট দেন অনেকের অনুরোধে, অনেকে টাকার বিনিময়ে, অনেকে নিজের দলের লোককে, অনেকে ভয়ভীতি প্রদর্শনের কারণে। অনেকে মনে করেন, এ দল পাঁচ বছর শাসন করেছে। তাই অন্য দলকেও পাঁচ বছর শাসনের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। এ কারণেই গত ৪২ বছরের নির্বাচনে কোনো দলই পরপর দুবার ক্ষমতায় আসতে পারেনি। ফলে দেশের উন্নয়ন যতটা হওয়া দরকার ছিল তা না হয়ে দুর্নীতির মাত্রা বেড়েই চলেছে। মূল কথা হলো, ভোটটি যেন পড়ে তেমন একজন ভালো প্রার্থীর অনুকূলে, যিনি আপাগোড়াই সৎ, ন্যায় বিচারক, সদালাপী, দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা রক্ষায় একজন প্রহরীর মতো ব্যক্তিত্ব।

তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, এ ধরনের যোগ্য লোক আজ সমাজে কজনইবা আছেন। প্রতিটি রাজনৈতিক দলে বিভিন্ন অনুপাতে ভালো-মন্দ লোকবল রয়েছে। গত পাঁচটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে, এ ব্যাপারটি কতিপয় রাজনীতিবিদ ছাড়া সবাই স্বীকার করবেন। কিন্তু বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত ওই নির্বাচনে যাঁরা প্রতিযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে এমন প্রার্থীর সংখ্যা খুবই কম যাঁরা বিভিন্ন কারণে থানাহাজত বা জেলের প্রকোষ্ঠ হতে কমপক্ষে একবার ঘুরে আসেননি। সমাজে অনেক গুণীজন রয়েছেন, যাঁরা এতটাই সৎ ও যোগ্য যে সরকারের বড় দায়িত্বে থেকেও সততার যথেষ্ট প্রমাণ রেখেছেন। এ ধরনের সৎ লোকের স্থান রাজনীতিতে খুবই কম। আমাদের মূল সমস্যা হচ্ছে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। লাখ লাখ টাকা খরচ করে জনসভা করা হয়, হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়, সেখানে দলীয় নেতা-কর্মী ছাড়াও নির্দলীয় নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, ছাত্রছাত্রীসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণ বক্তব্য শুনতে সভাস্থলে আসেন। তাঁরা ভালো ও সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে চান। কিন্তু বক্তারা সব সময় বিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য গঠনমূলক কথা না বলে অনেক সময় মিথ্যা ও ভুল তথ্য উপস্থাপন করেন। রাজনীতিবিদরা যে দলেরই হোন না কেন, সত্য তথ্যাদি ছাড়া বর্তমান শিক্ষিত ভোটারদের মন জয় করা সম্ভব নয়।

এ ধরনের মানসিকতা আজ হোক, কাল হোক পরিবর্তন করতেই হবে। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, বিশ্বের অনেক দেশেই বিদায়ী সরকার পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও হতে পারে, কোনো বাধা থাকার কথা নয়। তবে মূল কথা হচ্ছে আস্থাবিশ্বাসের অভাব। বর্তমানে স্বচ্ছ ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে যেসব যন্ত্রপাতির সহযোগিতা নেওয়া হয় তা অত্যন্ত নিখুঁত। তা ছাড়াও রয়েছে সব রাজনৈতিক দলের পোলিং এজেন্ট, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দক্ষ জনবল, সিআইডির নজরদারি। সর্বোপরি রয়েছে ভোটগ্রহণের জন্য দক্ষ ইলেকশন কমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত পোলিং, প্রিসাইডিং অফিসার। এ ছাড়া সাধারণ ভোটাররাও সব বিষয়ে তৎপর। তবে বিক্ষিপ্ত সাংঘর্ষিক ঘটনা যা আগেও ঘটেছে, ভবিষ্যতে যে ঘটবে না তার গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না। তবে সে জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও তৎপর থেকে কাজ করবে, এতে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। নিরপেক্ষতা ও সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দেওয়ার স্বার্থে বিদেশি পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি চিন্তা করা যেতে পারে।

বর্তমানে ইসলামের অপব্যাখ্যা দ্বারা, ইসলামী শাসন কায়েমের নামে পাকিস্তান, আফগানিস্তানে চলছে গ্রেনেড ও বোমা হামলার মাধ্যমে মুসলমান হয়ে মুসলমানকে হত্যার বিভিন্ন ষড়যন্ত্র। মসজিদ, মাদ্রাসা, দোকানপাটে চলছে অগ্নিসংযোগ, জনসভায় ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন মারণাস্ত্র। এ বাতাস কমবেশি আমাদের দেশেও বইছে। বর্তমান সরকারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অত্যন্ত দূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়ে নতুন নতুন ইসলামী নামধারী জঙ্গিবাদী দলের সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ আটক করেছে। বিভিন্ন নামে চলছে অপতৎপরতা, যা পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের শামিল। স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি আজ তৎপর। তারা আগামী নির্বাচনের ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছে। দেশ আজ এক সংকটের সন্ধিক্ষণে অপেক্ষমাণ। দেশের শান্তি ও উন্নতির কথা চিন্তা করেই ভোটারদের ভোট দিতে হবে। অনেকে এরই মধ্যে বলছেন, এ দেশের শাসনভার যদি মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের পক্ষের শক্তির কাছে যায় তাহলে দেশে কত বাড়ি ও কল-কারখানায় আগুন জ্বলবে সেটাই বড় চিন্তার বিষয়। বর্তমানে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন ভোটার সংখ্যাও বেড়েছে নতুন প্রজন্মের কারণে।

সুতরাং আগামী সংসদ নির্বাচনে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকেই বেছে নিতে আমরা যেন ভুল না করি। দলের চেয়ে দেশ ও জনস্বার্থের বিষয়টি সবার ঊর্ধ্বে প্রাধান্য পেতে হবে অবশ্যই। কারণ মানুষ কোনো দিনই ধ্বংসাত্মক কাজকে পছন্দ করে না বা মেনে নিতে পারে না, এটা স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। অসৎ, ঘুষখোর ও চাঁদাবাজ, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি কোনো দিন জনগণের বন্ধু হতে পারে না। সরকার ও বিরোধী দলকে নিজেদের স্বার্থেই বিষয়টি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। ভোটারদের লক্ষ রাখা প্রয়োজন যাঁরা দুর্নীতিগ্রস্ত, শূন্য থেকে সিংহাসনে বসেছেন, তাঁদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা। তা ছাড়া নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে যাঁরা টাকার লেনদেন করবেন, তাঁদের ওই টাকার জন্য ভবিষ্যতে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হবে। সুতরাং সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক প্রার্থীকে নির্বাচিত করাই এ দেশের জন্য মঙ্গল। বিশ্বের অনেক গণতান্ত্রিক দেশ একই দলকে পরপর একাধিকবার নির্বাচিত করে দেশের উন্নয়নের স্বার্থে। আমাদের দেশে যদি এ বিষয়টি বিবেচনা করে নির্বাচনে ভোট প্রয়োগ করা হয় তাহলে রাজনীতিবিদদের মধ্যে ভালো কাজ করার আগ্রহ বাড়বে। গণতন্ত্রের ভিত মজবুত এবং অর্থবহ হবে। দেশের উন্নয়নের গতি আরো ত্বরান্বিত হবে।

লেখক: অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর
fhoque.hstu@gmail.co

> আগামী সংসদ নির্বাচনে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকেই বেছে নিতে আমরা যেন ভুল না করি। দলের চেয়ে দেশ ও জনস্বার্থের বিষয়টি সবার ঊর্ধ্বে প্রাধান্য পেতে হবে অবশ্যই

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

কোরবানির পশু ক্রয়-বিক্রয়ে সাবধানতা

শত শত কিলোমিটার দূর থেকে বাজারজাতকৃত প্রাণী, বিশেষ করে গরু ও মহিষের হঠাৎ স্থান ও আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পায়। ফলে খুরারোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কোরবানির জন্য ক্রয়কৃত প্রাণীটি বাসায় অবস্থিত সুস্থ প্রাণী থেকে দূরে রাখা প্রয়োজন। চামড়া সংগ্রহের সময় সতর্ক থাকতে হবে, যাতে চামড়ায় কোনো ক্ষতের কারণে গুণগত মান নষ্ট না হয়

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই কোনো সরকার গবাদি প্রাণীর ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধকল্পে সঙ্গনিরোধ (Quarantine act) বাস্তবায়িত না করায় গবাদি প্রাণী বিভিন্ন রোগব্যালাই নিয়ে প্রবেশ করছে নির্দ্বিধায়। সামনে ঈদুল আজহা (কোরবানির ঈদ)। ইতিমধ্যেই হাজার হাজার পশু বাজারে আসতে শুরু করছে। শত শত কিলোমিটার দূর থেকে বাজারজাতকৃত প্রাণী, বিশেষ করে গরু ও মহিষের হঠাৎ স্থান ও আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পায়। ফলে খুরারোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কোরবানির জন্য ক্রয়কৃত প্রাণীটি বাসায় অবস্থিত সুস্থ প্রাণী থেকে দূরে রাখা প্রয়োজন। চামড়া সংগ্রহের সময় সতর্ক থাকতে হবে, যাতে চামড়ায় কোনো ক্ষতের কারণে গুণগত মান নষ্ট না হয়। তাই বিক্রেতা, ক্রেতা ও ভোক্তা সবার প্রতি জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নরূপ।

বিক্রেতার করণীয় : (১) সুস্থ পশু বাজারজাত করুন। (২) বাজারের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে পশুকে অর্ধপেট খাবার দিন। কারণ পেটভর্তি খাবারের কারণে যাত্রাপথে পেট ফুলে পশু ক্ষতিগ্রস্ত, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। বাজারে পৌঁছানোর পর পরিমিত খাবার দিন। (৩) পশুকে ভাত, চালের জাউ, ভাতের মাড়, পাউরুটি, মিষ্টি আলু, গোল আলু, কুমড়া, টমেটো ইত্যাদি খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন। এতে বিষক্রিয়া হয়ে পশুর মৃত্যু হতে পারে (৪) তরলজাতীয় খাবার বাঁশের চোঙা বা বোতলের সাহায্যে জোরপূর্বক খাওয়াবেন না। কারণ অনেক সময় খাদ্যদ্রব্য শ্বাসনালিতে প্রবেশের মাধ্যমে পশুর মৃত্যুও হতে পারে (৫) অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা গরম খাদ্য খাওয়ানো ভালো নয়। পশুকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা উত্তম (৬) নাক-মুখ শুকনো থাকলে ও খাওয়া ছেড়ে দিলে ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শ নিন। অসুস্থ পশু বিক্রি থেকে বিরত থাকুন। (৭) গাভির গর্ভ পরীক্ষা সনদপত্র সরকারি ভেটেরিনারি ডাক্তারের কাছ থেকে সংগ্রহ করে তারপর বিক্রি করুন।

ক্রেতার করণীয় : (১) সুস্থ পশু কিনুন। গাভির ক্ষেত্রে গর্ভ পরীক্ষা সার্টিফিকেট ছাড়া ক্রয় করা অনুচিত। (২) অসুস্থ পশুর লক্ষণ যেমন—খাওয়া ছেড়ে দেওয়া, পেট ফাঁপা, জাবর না কাটা, নাক-মুখ শুকনো থাকা, নাক-মুখ দিয়ে লালা বা শ্লেষ্মা পড়া, খুঁড়িয়ে হাঁটা, পাতলা পায়খানা করা, পায়ে-মুখে ঘা, প্রস্রাব বন্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শ নিন। (৩) শিং ভাঙা বা কাটা, লেজ ভাঙা, কান কাটাসহ ত্রুটিপূর্ণ যেকোনো পশু ক্রয় থেকে বিরত থাকুন। (৪) পশু কেনার পর ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে বাসায় নিন। কোনো অবস্থায়ই দৌড়ানো ভালো নয়। কারণ নতুন স্থানে পশুটি উত্তেজিত হয়ে পা ভাঙা, পেট ফাঁপা ও পেটের ব্যথায় অসুস্থ হতে পারে। (৫) কোরবানির জন্য ক্রয়কৃত পশুটি অন্যান্য পালিত গাভি বা গরু থেকে অনেক দূরে রাখুন। কারণ খুরারোগসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগে আপনার খামারের পশু আক্রান্ত হতে পারে। (৬) অনেক সময় বুড়িয়ে যাওয়া পশুকে বিক্রির জন্য দাঁত উঠিয়ে বিক্রি করা হয়।

পশু জবাইয়ের আগে ও পরে সবার করণীয় : (১) পশুটিকে ১০-১২ ঘণ্টা আগে থেকে পানি ছাড়া সব ধরনের খাবার দেওয়া বন্ধ করে দিন। (২) জবাইয়ের আগে পশুটিকে সাবান-পানি দিয়ে গোসল করান। (৩) ধারালো চাকু দ্বারা জবাই করুন। এ ক্ষেত্রে জবাই করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে শরীর থেকে সম্পূর্ণ রক্ত বের করা। জবাইয়ের সময় চাকুর মাথা দিয়ে ঘাড়ের মেরুদণ্ডের স্পাইনাল কর্ড কাটবেন না। এতে পশুটি তাড়াতাড়ি নিস্তেজ হবে। ফলে রক্তক্ষরণ সঠিকভাবে সম্পূর্ণ হবে না। জবাই করার ১০-১৫ মিনিট পর পায়ের রগ কাটুন এবং চামড়া ছাড়াতে শুরু করুন। (৪) চামড়া ছাড়ানোর সময় প্রথমে মুখের দুই চোয়ালের মাঝ বরাবর কাটার স্থান থেকে নাভি, অণ্ডকোষ বা ওলানের মধ্য বরাবর লাইন করে চামড়া কেটে ছাড়ানো শুরু করুন। অতিরিক্ত মাংস ও চর্বিজাতীয় কোষ চামড়া থেকে ছাড়ানো ভালো। (৫) জবাই শেষে রক্ত, হাঁড়ের টুকরো, পায়খানা ইত্যাদি যথাস্থানে রাখুন (শহর বা সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে) এবং গ্রামগঞ্জের ক্ষেত্রে মাটিতে পুঁতে রাখুন। কারণ এ থেকে পরিবেশদূষণ ও রোগ ছড়াতে পারে। (৬) জবাইসহ মাংস তৈরির স্থান ধুয়ে ফেলুন এবং ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিন। এলাকার পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত রাখুন। নিজে সুস্থ থাকুন, অন্যকে সুস্থ থাকতে সহযোগিতা করুন। গোশত ও চর্বির কারণে শিল্প-কারখানার পরিবেশ নষ্ট হয়।

সঠিক পথে ও আইনের আওতায় পশু আমদানি এবং সঙ্গনিরোধ আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন আমাদের সবার প্রত্যাশা। অন্যথায় লাভবান না হয়ে দেশকে লোকসানের ঘানি টানতে হবে, যা কারো কাম্য নয়।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
fhoque.hstu@gmail.com

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার ৩০ ভাদ্র ১৪১৯
১৪ সেপ্টেম্বর ২০১২

শ্রেষ্ঠ আদালত মানুষের বিবেক

ডা. মো. ফজলুল হক

সব অপবাদই মুছে ফেলা যায়, চুরি ও দুর্নীতির অপবাদ ছাড়া। ধর্মীয় আঙ্গিকে চিন্তা করলে এর চেয়ে নিকৃষ্টতম কাজ আর নেই। ছোটবেলায় তাবৎতাম যারা চুরি ও ডাকাতি করে তারা অত্যন্ত গরিব ও অশিক্ষিত। সেকালে চুরির ধরন ছিল সিঁদকাটা বা বাঁশের বেড়া কেটে বা ঘরের ঝাপ সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করে ধান, চাল, পাট, ডাল, আটা ইত্যাদি নিয়ে পালিয়ে যাওয়া। অনেক সময় মালিকের হাতে ধৃত চোরকে দেখলে মনে হত সে অত্যন্ত গরিব। মারতে গেলেও মায়া হত অনেকের। সে যুগে চোরের কোন চাকরি ছিল না। তারা অত্যন্ত অনাহারি এবং গরিব। আজকাল চোর আছে, তবে ঐ ধরনের চোর নেই। ডিজিটাল যুগে চুরির ধরন পাল্টে গেছে। বর্তমানের চোরগুলোও উন্নতমানের। কলমের মারপ্যাঁচে চুরি করে কোটি কোটি টাকা এবং চুরি পেশাটির নামও পরিবর্তিত হয়েছে। সেটি দুর্নীতি নামে সিভিল সমাজের কাছে পরিচিত।

ঘুষখোর কর্মস্থলের টেবিলে বসে মানুষের কাছ থেকে ফাইল আটকিয়ে কলাকৌশলে ঘুষ নিয়ে থাকে, যেমন- এ কাজটি আজ হবে না, ৭ দিন পর আসুন, ফাইল পাওয়া যাচ্ছে না, স্যার ব্যস্ত, এ সমস্যা সে সমস্যা ইত্যাদি দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে ঘুষ দিতে বাধ্য করে। অনেক সময় ঘুষ না দিলে ফাইল গায়েবসহ বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। ধর্মীয়ভাবে এটি যে কত জঘন্য কাজ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। টিআইবি এর তথ্যানুসারে কয়েকটি এয়ারমার্ক অফিস, যেমন- পুলিশ বিভাগ, ভূমি অফিস, পাসপোর্ট অফিস, ইনকাম ট্যাক্স, সিটি কর্পোরেশন, বিদ্যুৎ, টেলিফোন বিভাগ ইত্যাদি উল্লেখ করার মত। তাছাড়াও ঘুষ ও দুর্নীতি নেই এমন অফিসের তালিকা প্রায় শূন্যের কোঠায়। মানুষ সৃষ্টির সেরাজীব এতে কোন সন্দেহ নেই কারণ মানুষের রয়েছে ভালমন্দ বোঝার জ্ঞান ও দক্ষতা। আল্লাহপাক মানুষকে ভাল কাজের মর্যাদা দিয়ে থাকেন দুনিয়া ও আখেরাতে। তেমনি মন্দ কাজের জন্য আল্লাহর কাছে তো বটেই সমাজের সাধারণ মানুষের কাছেও সে ঘৃণিত ব্যক্তিরূপে ব্যবহার পেয়ে থাকেন। পরকাল তো পরেই হবে। সেখান থেকে কেউ রেহাই পাবে না। যে ব্যক্তি ঘুষ-দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে সে ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে পিতা-মাতার নিকট কুসন্তান ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বিষয়ে হাদিসেও উল্লেখ্য আছে।

১৯৬৯/৭০ এর গণআন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া আমাদের এলাকার ৪/৫ জন ছাত্র অন্যান্য স্কুল কলেজের ছাত্র ও সাধারণ মানুষ নিয়ে 'ঐ চোর-ডাকাতদের ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় এবং হত্যা করে প্রায় ১৮ জন ডাকাত। তারপর থেকে ঐ গ্রামের মানুষ চুরি ও ডাকাতি ছেড়ে ভাল হলেও চোর—ডাকাতের গ্রাম নামেই পরিচিত। সমাজ তাদেরকে ভিন্ন চোখে দেখে, আন্ডারএস্টিমেট করে। এমনকি আত্মীয়তাও করতে চায় না। এটিই যদি হয় পেটের দায়ে চুরি করার জন্য তাহলে শিক্ষিত মানুষের দুর্নীতি সাধারণ সমাজ কিভাবে দেখবেন? আজ দুর্নীতিবাজ ও ঘুষখোরের কারণে খাদ্যদ্রব্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অভাবনীয় উর্ধ্বগতির দিকে। এমনকি বিদ্যুৎ ও গ্যাসের লোকসানের অংশটুকুও চেপে বসছে সাধারণ গ্রহকদের ঘাড়ে। সরকারও এ শ্রেণীর লোকের কারণে হিমশিম খাচ্ছে সবকিছু সহনীয় পর্যায়ে রাখতে। সব সরকারই চান তার আমলে দেশ ভালভাবে চলুক কিন্তু সম্ভব হয় না ঐ সব দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের কারণে। বাংলাদেশ কয়েকবারই দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যার মূলকারণ কতিপয়ের ঘুষ-দুর্নীতি। সমাজে সাধারণ মানুষ অবশ্যই অবগত আছেন অফিস আদালতে কে কিভাবে চলছেন। অফিসে সৎ লোকের সংখ্যাও কম নয়, তারাই এদের কৃতকর্মের সাক্ষী। এরা যতই গাড়ি বাড়ি ও ক্ষমতার দাপটই দেখান না কেন মানুষ দূর থেকে তাদের ঘৃণার চোখে দেখেন। মানুষের আদালতে পার পেলেও পরকালের আদালত বড়ই কঠিন। তিলে তিলে হিসাব দিতেই হবে। সেদিন আর কত দূর? শেষ নিশ্বাস যতদূর। আমাদের সকলকে স্ব স্ব স্থান হতে দেশ, সমাজ ও নিজের স্বার্থে সৎ ও আদর্শবান হতে হবে। অসৎ পয়সা কার জন্য? ঘুষ-দুর্নীতি কার স্বার্থে? এতে ব্যক্তিগত লাভ কি? টাকা, গাড়ি বাড়ি আর কতটুকু ব্যবহার করা যায়? কিন্তু লোকে চোর ও ঘুষখোর বললে তখন আপনার অবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? ছেলে-মেয়েকে যখন ঘুষখোরের ছেলে-মেয়ে বলে মানুষ অবজ্ঞা করবে তখন ছেলে-মেয়েই ধিক্কার দিবে, তখন কেমন লাগবে নিজের? হাইকোর্ট ও জর্জকোর্টের রায়ে জয়ী হলেও শেষ বিচারের পার পাওয়া যাবে না। ঘুষের টাকার কারণে ও গরমে নিজ সন্তানাদি যদি মাদকাসক্ত হয় তখন আমাদের যন্ত্রণাই বাড়বে।

তাই সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলুন। ঘুষ-দুর্নীতি ছেড়ে দিন। অবৈধ অর্থের বাড়ি-গাড়িতে শান্তি নেই। অবৈধ উপার্জন থেকে বিরত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। একজন সৎ লোকের গাড়ি, বাড়ি, অর্থ কম থাকলেও আত্মার শান্তির দিক থেকে সে অনেক বড়। এ বিষয়টি গভীরভাবে একবার চিন্তা করা আমাদের সবার জন্যই মঙ্গল বয়ে আনবে। আমরা সবাই ঘুষ, দুর্নীতি ও লুটপাটের মত ঘৃণিত কাজকে মন থেকে ঘৃণা করি। এদেশের ঘামঝরা শ্রমজীবী মানুষের অর্থেও রাষ্ট্র চলে, এ অর্থ অনেক কষ্টের। এ অর্থ যেন দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থেই ব্যয় হয় সেদিকে নজর রাখতেই হবে। তাই দেশ, জাতি, সমাজ ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কল্যাণার্থে বিগত দিনের কলঙ্কগুলো মুছে ফেলতে চাই সৎ ও দক্ষতার সাথে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আদালত হচ্ছে মানুষের বিবেক। এই মর্মকথাটির উপলব্ধি যেন হয় দেশ ও জাতি গঠনের প্রধান হাতিয়ার।

● লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান মেডিসিন, সার্জারি এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

মুক্তধারা

ডা. মো. ফজলুল হক

মাদকের ভয়াবহতা রোধে জনসচেতনতা প্রয়োজন

মাদক যে একটি আত্মঘাতী সমস্যা এবং ক্যান্সার সমতুল্য, তা সবাইকে স্ব-স্ব স্থান থেকে অনুধাবন করতে হবে। প্রবাদ সংযোজন করা যায়, যেমন হত্যাকারীর চেয়ে হত্যার আদেশদাতা বড় অপরাধী, তেমনি মাদকসেবীর চেয়ে মাদক প্রস্তুতকারক, বিক্রেতা ও সরবরাহকারী অধিক অপরাধী। এ অপরাধের শেষ কোথায়? আমাদের সবাইকে দলমত-নির্বিশেষে এগিয়ে আসতে হবে মাদকের বিরুদ্ধে। ইয়াবা এতই ভয়াবহ যে সমাজ রক্ষার জন্য থাইল্যান্ড সরকার তিন হাজারেরও বেশি ইয়াবা বিক্রেতা ও সেবীকে ক্রসফায়ার দেয়। মালয়েশিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. মাহাথির মোহাম্মদের শাসনামলে মাদক ব্যবসায়ীদের সরাসরি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বর্তমান বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ লোক মারা যায় ধূমপানজনিত ক্যান্সারে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক 'ড্রাগস ইনফরমেশন'-এর ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, ইয়াবা হেরোইনের চেয়ে ভয়াবহ এবং আত্মঘাতী। চিকিৎসকদের মতে, ইয়াবা সেবনের পর যেকোনো সময় মস্তিষ্কের রক্তনালি ছিঁড়ে যেতে পারে। যার ফলে স্ট্রোক ও রক্তক্ষরণ হতে পারে এবং হৃৎপিণ্ডের গতি ও রক্তচাপ বাড়বে, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের আগমন-নির্গমন হওয়ার কারণে ফুসফুস কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলবে। আর এর ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে মৃত্যু অবধারিত। মাদকাসক্তির প্রাথমিক উপসর্গগুলো হচ্ছে বেলা করে ঘুম থেকে ওঠা, চড়া মেজাজ, টাকা চেয়ে না পেয়ে আসবাবপত্র ভাঙচুর করা, অধিক রাত জাগা এবং ক্ষুধামান্দ ইত্যাদি। পরবর্তী সময়ে কিডনি, লিভার ও ফুসফুস বিকল হয়ে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। সম্প্রতি মাদকদ্রব্যের ওপর শুল্ক বাড়িয়ে দিয়েছে সরকার। ফলে মাদকদ্রব্যের দাম বাড়বে এবং মাদকের ব্যবহার কমবে। এটি বলা যাবে না, তবে মাদকের টাকা সংগ্রহের জন্য চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই এবং খুনের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। শুধু এটিই যথেষ্ট নয় মাদক নিয়ন্ত্রণের জন্য। জনসচেতনতার পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে এর উৎপাদন, সরবরাহ ও এর অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং কঠিন শাস্তি, যেমন—মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের মতো শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যেহেতু মাদক আন্তর্জাতিক সমস্যা। মাদকের অপব্যবহার তরুণদের মেধা ও মননকে শেষ করে দেয়, বিনষ্ট করে সুপ্ত প্রতিভা ও সৃষ্ট চিন্তা। মাদক গ্রহণের ফলে শরীরের স্নায়বিক ভারসাম্য ভেঙে পড়ে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মস্তিষ্ক। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে ১৮ বছরের ওপরে ০.৬৩ শতাংশ মানুষ মাদকাসক্ত। মাদকাসক্তের মধ্যে ৮৫ শতাংশের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। ২০০৬ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জরিপে মাদকাসক্তের সংখ্যা ৪৬ লাখের বেশি। অন্য সূত্রমতে, এই সংখ্যা ৭০ লাখের কাছাকাছি। এদের মধ্যে প্রায় ৯১ শতাংশ কিশোর ও যুবক এবং নারীর সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ। প্রতিবছর মাদকের পেছনে অপচয় হয় প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা। অন্যদিকে বাংলাদেশের মোট জিডিপির ১ শতাংশ খরচ হয় ধূমপানের পেছনে। তা ছাড়া মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত। মিয়ানমার থেকে ইয়াবা আনার প্রধান রুট নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান), উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার নাফ নদী-তীরবর্তী অঞ্চল। রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে মাদক ব্যবসায়ীদের একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট রয়েছে, যারা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত ও মিয়ানমার থেকে অবাধে মাদকদ্রব্য নিয়ে আসে এ দেশে। বিভিন্ন কৌশলে বিক্রি করে বোকা লোকদের কাছে, যারা নিজের জীবন সম্পর্কে উদাসীন। এরা সমাজে বখাটে নামে পরিচিত। এ ছাড়া নগরীর শতাধিক বস্তি অপরাধের উৎপত্তিস্থল, যেখানে ফেনসিডিল, গাঁজা, মদ, ইয়াবা বিক্রি হয় নির্বিঘ্নে, এমনকি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্যদের আশপাশেও। ইয়াবা ছোট আকারের হওয়ায় চুলের খোঁপায়, ভ্যানিটি ব্যাগ ও ছায়ার পকেটে করে সরবরাহ করা সহজ ব্যাপার, যা কয়েকটি পত্রিকায় ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। সীমান্তবর্তী ট্রেন মাদকদ্রব্য পাচারের প্রধান বাহন। ১৯৯০ সালে আমাদের দেশে 'মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন' করা হলেও এখন পর্যন্ত তা পুরোপুরি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। আইনে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের কথা বলা হলেও তা বাস্তবে রূপ নেয়নি। পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হলেও এ আইনের পুরোপুরি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তবে শিক্ষিত সমাজ অনেকাংশে ধূমপান থেকে বিরত রয়েছে। সাধারণত মাদক দিবসকে কেন্দ্র করে মাদক নিয়ে আমাদের দেশে সভা-সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এটিই যথেষ্ট নয়। এ জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও জনসচেতনতা তৈরিতে ধর্মীয় জ্ঞানদান। এ শিক্ষাটি গ্রহণ করার মোক্ষম সময় শিশুকাল, যা পরিবার ও প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে গ্রহণ করা সম্ভব। গোয়েন্দা সূত্র মতে, বাংলাদেশ বর্তমানে আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মাফিয়ারা দীর্ঘদিন ধরে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর এবং শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে মাদক পাচারের নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহার করছে। তা ছাড়া কুমিল্লা-চান্দিনা রুট, আখাউড়া রেলওয়ে জংশন, বেনাপোল স্থলবন্দর, শেরপুর সীমান্তপথ, সাতক্ষীরা, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার সীমান্তপথ, বুড়িমারী-বাংলাবান্ধা-হিলি বন্দর, দিনাজপুর সীমান্তপথ, টেকনাফ, উখিয়া ও কক্সবাজার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজধানীকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশের মাদক ব্যবসায়ীদের একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট রয়েছে, যারা সীমান্তবর্তী ফেনসিডিল উৎপাদন কারখানা থেকে সংগ্রহ করে। সেখান থেকে উচ্চ দেশের কিছু অসৎ সীমান্তরক্ষী সদস্যের সহায়তায় বাংলাদেশের বিভিন্ন গোপন আস্তানায় মজুদ করে। সেখান থেকে ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করে থাকে মাদক ব্যবসায়ীরা। বিগত দিনগুলোতে পার্বত্য এলাকায় গভীর জঙ্গলে মাদকসহ অস্ত্র আটকের ঘটনায় সাধারণ মানুষ অনেকটা আশার আলো দেখলেও নিয়মিত ঘটনাবলির কারণে নিরাশ হতে বাধ্য। তবে র‍্যাব সদস্যদের প্রতি রয়েছে মানুষের আস্থা ও গভীর ভালোবাসা। তাদের সাঁড়াশি অভিযান ও তৎপরতা বাড়ানোর পক্ষে রয়েছে সাধারণ মানুষের আত্মবিশ্বাস। গোয়েন্দা সংস্থার এক প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, নগরীর ১১০টি বস্তি মাদক বিক্রেতা, সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের অভয়ারণ্য। এরাই নগরীর বিভিন্ন অপকর্ম ও বেআইনি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। বাংলাদেশের বস্তিগুলোতেই এর ব্যবসা চলে বেশি। প্রায়ই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। এ ঘটনা অহরহই ঘটছে। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? উল্লেখ্য, মৃত প্রাণীর গন্ধ থেকে পরিত্রাণের ক্ষেত্রে নাক বন্ধের চেয়ে মৃত প্রাণীর সৎকার যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি মাদকদ্রব্য বিস্তার রোধকল্পে উৎস, আমদানিকারক ও বিক্রেতাদের চিহ্নিত করে শক্ত হাতে তা দমন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নকারীদের সৎ ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে হাতের লাঠিও এ থেকে রেহাই পাবে না। আগে মাদকাসক্তের কারণগুলো চিহ্নিত করে তা থেকে বিরত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকে। তবে এ ব্যাপারে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে এবং মনে করতে হবে, এ বিষ সবার ঘরেই প্রবেশ করতে পারে, যদি সবাই এ ব্যাপারে তৎপর না হই। মাত্র গুটিকয়েক মাদকসেবী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও ঘুষখোরকে শক্ত হাতে দমনের জন্য সবাইকে আন্তরিকতার সঙ্গে সোচ্চার হতে হবে। মাদকাসক্তের মূল কারণগুলো হচ্ছে—ধূমপান করা, মাদকাসক্তদের সঙ্গে সঙ্গ দেওয়া, ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব, বেকারত্ব ও হতাশা, মাদকদ্রব্যের সহজপ্রাপ্যতা, অবৈধ উপার্জন (ঘুষ, দুর্নীতি), অল্প বয়সে বেশি টাকা খরচের সুযোগ পাওয়া ইত্যাদি। অনেক সময় মা-বাবা বাধ্য হয়ে প্রিয় সন্তানটিকে মাদকাসক্ত হওয়ার কারণে থানা হাজতে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়। সবাইকে বুঝতে হবে, এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষের জন্য একবারই। সুতরাং মাদক ব্যবহার করে এ সুন্দর জীবনটাকে কেন ধ্বংস করছি? ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করুন, স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখুন, সুস্থভাবে নিজে বাঁচুন, অন্যকে বাঁচতে সাহায্য করুন, মাদককে 'না' বলুন—এটাই হোক সবার প্রত্যাশা।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান, মেডিসিন, সার্জারি অ্যান্ড অবসট্রেট্রিক্স বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর
fhoquchstu@gmail.com

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

রেলওয়েতে লোকসান ও আশার আলো

সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানাকে সচলের মাধ্যমে বছরে প্রায় ১৪২টি যাত্রীবাহী কোচ ও চার হাজার ৫০০ ওয়াগন তৈরি বা মেরামত করার ব্যবস্থা করা, দেশেই রেলওয়ে ইঞ্জিন তৈরির ব্যবস্থা করা, সর্বোপরি বিদেশ থেকে যন্ত্রাংশ আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে অর্থের অপচয় রোধ করা। সব ক্ষেত্রেই সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও জনসচেতনতার অভাবে তা বাস্তবায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায়। যে কারণে বিভিন্ন সেক্টরে লোকসানের ঘানি টানছে সরকার। পাহাড় পরিমাণ সমস্যা নিয়েই বাংলাদেশের জন্ম। তবে সততা, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে পরিকল্পিতভাবে কাজ করলেই সব সমস্যা দূর হতে বাধ্য

পরিবেশদূষণ রোধ ও যানজট নিরসনের প্রধান যোগাযোগব্যবস্থাটি হচ্ছে রেলওয়ে। বাস, লঞ্চ ও স্টিমার কোথাও লাভ ছাড়া কথা নেই। রেলের একটি ইঞ্জিনের ঘাড়ে চড়ে লাখ লাখ যাত্রী যাতায়াত করছে, এর পরও লোকসান হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। যেমন—২০০৫-০৬ অর্থবছরে ব্যয় ৮৮৩ কোটি ১৯ লাখ টাকা, আয় মাত্র ৪৪৪ কোটি ২৭ লাখ টাকা, নিট ক্ষতি বা লোকসান ৪৩৮ কোটি ৯২ লাখ টাকা। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে নিট ক্ষতি ৫৬২ কোটি ৯৪ লাখ টাকা, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ক্ষতি ৬১৩ কোটি ৬১ লাখ টাকা এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরে লোকসানের পরিমাণ ৬৩৪ কোটি ১৩ লাখ টাকা। ২০০৯-১০ অর্থবছরে লোকসান প্রায় ৬৮১ কোটি টাকা। তা ছাড়া প্রতিবছর প্রায় ১১ লাখ টাকা ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছে সরকার। সুতরাং এ ক্ষতি থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে যেকোনো মূল্যেই। বিশ্বের অন্যান্য দেশে রেলওয়ে একটি নিরাপদ ও আরামদায়ক চলাচলের মাধ্যম এবং লাভও হচ্ছে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার। আমরা কী পারব না এ লাভের অংশীদার হতে? অবশ্যই পারব। তবে প্রয়োজন সঠিক সিদ্ধান্ত, সততা, আন্তরিকতা ও দেশপ্রেম। এর ব্যত্যয় ঘটলে যা হচ্ছে তাই হবে যুগের পর যুগ ধরে। রেলওয়েতে লোকসান হয়ে আসছে গত প্রায় চার যুগ ধরে। বর্তমানে আশার আলো যাচ্ছে কয়েকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপের কারণে। তা হচ্ছে ডাবল লেন তৈরির উদ্যোগ, রেললাইন পুনঃস্থাপন ইত্যাদি। রেলওয়ে অতীত ও বর্তমানের সব সমস্যাকে মুছে ফেলবে, দূর হবে দুর্নীতি, লুটপাট, লোকসানের গ্লানি, যাত্রী দুর্ভোগ এবং যানজট। যদি স্বচ্ছতা থাকে চিন্তা-চেতনায়, উপকৃত হবে কোটি কোটি মানুষ, দেশ যাবে আরো এক ধাপ এগিয়ে। এবারই প্রথম রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের জন্ম হলো, যা আশার আলোর নির্দেশক বলেই ভাবছেন বিজমহল। রেলওয়ে সেক্টরে গতিশীলতা আনতে অনেক ব্যয়ের বোঝা বহন করতে হবে সরকারকে। যে ক্যান্সার প্রবেশ করেছে তা রাতারাতি দূর করা সম্ভব নয়। তবে এটিও ঠিক, স্বচ্ছতা নিয়ে কাজ করলে অনেক কিছুই সম্ভব, যার উদাহরণ অনেক ক্ষেত্রেই রয়েছে। রেলওয়ে শুধু যাত্রীই বহন করে না, মাদক চোরাচালানির নির্ভরযোগ্য বাহনও এটি। এদিকে সঠিক নজর পড়লে মাদক পাচারও বন্ধ হবে নিঃসন্দেহে।

উল্লেখ্য, স্বচোখে দেখে এলাম রাজবাড়ী থেকে ফরিদপুর হয়ে পুকুরিয়া এবং রাজবাড়ী থেকে ভাটিয়াপাড়া পর্যন্ত প্রায় ১০০ কিলোমিটার উত্তোলনকৃত রেললাইনটি পুনঃ স্থাপনের কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে দুই বছরের মধ্যে রেলওয়ের সফলতা আসতে বাধ্য। উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে পঞ্চগড় থেকে ডাবল লেন তৈরির কাজ দ্রুতগতিতে চলছে, এটি আমাদের জন্য আশার আলোও বটে। তবে এক সরকারের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ নতুন সরকার করতে চায় না—এটাই আমাদের দেশে রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এ কালচার থেকে আমাদের বের হতে হবে। ১৮৬২ সালে ব্রিটিশ শাসনামলে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রেলপথ স্থাপিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমানে প্রায় ২৮৫৫ কিলোমিটার রেলপথে ৪৮টি মালবাহী এবং ২৩৫টি যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করছে। দ্রুতগামী ইন্টারসিটি ট্রেনেও যাত্রী দুর্ভোগ কমেনি কারণ স্বীমাহীন লেট। এর মূল কারণ ডাবল লেন না থাকা। ফলে রাস্তায় সাইড দিতে গিয়ে কোনো কোনো সময় কয়েক ঘণ্টা সময় চলে যায়। লক্ষ করা যায় ট্রেনে বসা তো দূরের কথা, দাঁড়ানোরও একটু জায়গা থাকে না, তার পরও লোকসানের ঘানি টানতে হচ্ছে কোটি কোটি টাকার।

বিশ্বস্ত সূত্রমতে, ১৯৮৬ সালে ২৭টি ইঞ্জিন আমদানি করা হয় কানাডা থেকে এবং ১৯৯৬ সালে ভারত থেকে ১১টি ইঞ্জিন আমদানি করে কোনোভাবে চলছে এ গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরটি। লোকবলের অভাবে ঠিকমতো চেকিং করা সম্ভব নয়, তাই অনেক সময়ে ৩০ টাকার লোকাল ভাড়া ১০-২০ টাকা চেকিং মাস্টারের পকেটে ঢুকিয়ে চলে যাচ্ছেন অনেক যাত্রী। এ ধরনের ঘটনা আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছি। এ ধরনের চিত্র কমবেশি সমগ্র বাংলাদেশে। উল্লেখ্য, নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন স্টেশন মাস্টার দুঃখ করে বলেন, আশির দশকে শক্তিশালী রেলওয়ে বোর্ডটি ভেঙে দুটি অঞ্চল ইস্ট ও ওয়েস্ট নামে বিভক্ত করাই রেলওয়ের পতনের মূল কারণ। অর্থাৎ ওই সময় থেকেই লোকসানের পাল্লা ভারী হতে থাকে, যার ধারাবাহিকতা অদ্যাবধি। এর আগে সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা থেকে উন্নতমানের ট্রেনের বগি ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ তৈরি হতো। ফলে এ সেক্টরটি থেকে লাভ হতো প্রচুর। উল্লেখ্য, সৈয়দপুরে একটি বগি তৈরিতে যেখানে খরচ মাত্র ৮০ লাখ টাকা, সেই একই বগি বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় চার-পাঁচ গুণ অর্থ ব্যয়ে। ফলে অধিক লোকসান হয়ে আসছে তিন যুগ ধরে। সুতরাং অতীতের অবস্থা থেকে উত্তোলনের জন্য প্রয়োজন—সৎ ও দক্ষ জনবল নিয়োগ দেওয়া, ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো, স্টেশনের চতুর্দিকে ফেনসিংয়ের ব্যবস্থা করা, ডাবল লেন তৈরি করা, যা এরই মধ্যে আরম্ভ হয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে, উন্নতমানের বগি তৈরি এবং বগির সংখ্যা বৃদ্ধি করা, সব সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি ভাড়া বৃদ্ধিকরণ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটসহ জনবহুল শহরে মেট্রো ট্রেন ও সাবওয়ের ব্যবস্থা করা, সমগ্র দেশে মিটারগেজ অথবা ব্রডগেজ যেকোনো একধরনের ট্রেন চালু থাকা, বেদখলকৃত রেলওয়ের জমি দখলমুক্ত করে লিজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা, পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত পর্যন্ত রেল যোগাযোগ বৃদ্ধি করা, প্রত্যেক কামরায় সার্কিট ক্যামেরার ব্যবস্থা রাখা, ভ্রাম্যমাণ আদালতের নজরদারি বৃদ্ধিকরণ, আগের মতো সৈয়দপুর ও চট্টগ্রাম রেলওয়ে কারখানা থেকে চাহিদা মোতাবেক মালবাহী এবং যাত্রীবাহী বগিসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে দেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। উল্লেখ্য, আগের মতো সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানাকে সচলের মাধ্যমে বছরে প্রায় ১৪২টি যাত্রীবাহী কোচ ও চার হাজার ৫০০টি ওয়াগন তৈরি বা মেরামত করার ব্যবস্থা করা, দেশেই রেলওয়ে ইঞ্জিন তৈরির ব্যবস্থা করা, সর্বোপরি বিদেশ থেকে যন্ত্রাংশ আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে অর্থের অপচয় রোধ করা। সব ক্ষেত্রেই সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও জনসচেতনতার অভাবে তা বাস্তবায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায়। যে কারণে বিভিন্ন সেক্টরে লোকসানের ঘানি টানছে সরকার। পাহাড় পরিমাণ সমস্যা নিয়েই বাংলাদেশের জন্ম। তবে সততা, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে পরিকল্পিতভাবে কাজ করলেই সব সমস্যাই দূর হতে বাধ্য।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান, মেডিসিন, সার্জারি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

যুগান্তর বুধবার ৩ আগস্ট ২০১১ ৫ পৃ

ডা. মোঃ ফজলুল হক

সড়ক দুর্ঘটনায় আর কত মৃত্যু?

বর্তমানে অন্যমের গতির চেয়ে বেশি গতিতে জন্ম নিচ্ছে বিভিন্ন ঘটনাবলী, যার মধ্যে দুর্ঘটনা অন্যতম। এ লেখা তৈরির পরও ঘটে গেছে আরও কয়েকটি দুর্ঘটনা। মিরসরাইয়ে ট্রাক দুর্ঘটনায় ৪৪ জন কিশোর শিক্ষার্থীর অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে দেশব্যাপী নেমে আসে শোকের ছায়া। ওই সব শিক্ষার্থী একদিন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পিতা-মাতা ও দেশ সেবার সুযোগ পেত। মাতা-পিতা হতেন গর্বিত। বর্তমান দেশ তাদের সেবা থেকে চিরতরে বঞ্চিত। আমরা তাদের অকাল মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত।

মিরসরাইয়ের পর এ পর্যন্ত আরও প্রায় অর্ধ শতাধিক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে প্রায় ৯৫ জন এবং আহত হয়েছে প্রায় দুই শতাধিক। এর মধ্যে ২৮ জুলাই পর পর তিনটি দুর্ঘটনায় ২৮ জন নিহত ও প্রায় ৭০ জন আহত হয়েছেন। গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ছয়টি। এমনিভাবে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ নিহত ও আহত হয়ে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছে মূলত চালকের ভুল ও খামখেয়ালির কারণে। এ ধরনের ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে। প্রতিদিনই পত্রিকার পাতায় দেখা যাচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনার চিত্র। ফেব্রুয়ারি, ২০১০ টাঙ্গাইলে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মারা যান খাই ডেপুটি অ্যাম্বাসেডর পত্নী লিকনা জুলি, যা অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জাজনক। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা প্রকৃত সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ২০০৯ সালের বিবিসি'র তথ্যানুযায়ী সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান প্রায় ১২ হাজার জন এবং প্রতি বছর গড়ে ৫ হাজার জন। এক জরিপে জানা যায়, ৫৫৪টি দুর্ঘটনার জন্য প্রায় ৯৯ ভাগ দায়ী চালক নিজেই।

২১ জুলাই নরসিংদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া একই পরিবারের ৫ জন রেখে গেছেন সুফিয়ান নামক ২ বছরের অবুঝ শিশুকে। একজনের মৃত্যু মানেই ওই পরিবারের সবার আজীবন মৃত্যুযন্ত্রণা বহন করা। একজন মানুষের মৃত্যু এমনও হতে পারে, একমাত্র সন্তানের মৃত্যু। এ ধরনের শোকের ভার পিতা-মাতা সইবেন কিভাবে? বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে ওই দেশে অকেজো বলে বিবেচিত গাড়ি। রঙ করে চালানো হচ্ছে বছরের পর বছর। প্রত্যেক বছরই আমদানির সংখ্যা বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে যানজট। তেমনি বাড়ছে ড্রাইভারের চাহিদা। ফলে কেউ চালকের সিটে বসলেই হয়ে যায় 'ড্রাইভার সাহেব'।

এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন আর না ঘটে। শক্ত আইন ও এর সঠিক বাস্তবায়ন সময়ের দাবি। দুর্ঘটনার মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে হেলপার দ্বারা গাড়ি চালানো, ড্রাইভারের অদক্ষতা ও অসাবধানতা, চলন্ত অবস্থায় মোবাইল ফোন ব্যবহার করা, চালকের সঙ্গে সাইডটক করা এবং মাদকাসক্ত ড্রাইভার দ্বারা গাড়ি চালানো। ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত মাল বোঝাইয়ের কারণেও দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে অপ্রশস্ত রাস্তা ও কালভার্ট, ট্রাফিক আইন মেনে না চলা, ওভারব্রিজ ও জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার না করা, গরু-ছাগল-ভেড়া-কুকুরের রাস্তা পারাপার ইত্যাদি। কালভার্টগুলোর অধিকাংশই রাস্তার চেয়েও চাপা, যেখানে দুটি গাড়ি পাশাপাশি অবস্থান করলে জায়গা থাকে না। চার লেন বিশিষ্ট রাস্তা হলে দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে যাবে। নছিমন ধরনের শ্যালো ইঞ্জিনচালিত বাহনকে সাইড দেয়ার সময় ঘটে অনেক দুর্ঘটনা। কারণ এর চালকরা হয়ে থাকে কখনও ড্রাইভার, কখনও হেলপার আবার কখনও চায়ের দোকানের কর্মচারী ইত্যাদি। এ পর্যন্ত শত শত দুর্ঘটনার হোতা নছিমন ও ট্রাক।

প্রতিদিন গড়ে ২-৩টি দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রতি বছর এক থেকে দেড় হাজার গাড়ি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ থেকে নিস্তারের উপায় কী? প্রথমত, রাস্তায় গাড়ি বের করার আগে যান্ত্রিক ত্রুটি আছে কিনা তা সুচারুরূপে খতিয়ে দেখতে হবে। কেবল দক্ষ, অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত ড্রাইভারকে লাইসেন্স প্রদান সাপেক্ষে গাড়ি চালাতে দেয়া যেতে পারে। চালককে ধূমপানসহ মাদক থেকে বিরত থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। দূরপাল্লার প্রতিটি গাড়িতে দু'জন অভিজ্ঞ ড্রাইভার থাকা একান্ত প্রয়োজন। ড্রাইভার ও হেলপারের জন্য নির্ধারিত ড্রেস ব্যবহার করার বিধান রাখা যেতে পারে, যাতে ড্রাইভারের আসনে হেলপার বসতে না পারে।

দ্বিতীয়ত, চার লেন বিশিষ্ট রাস্তার মাঝখানে ডিভাইডার স্থাপন করা এবং ডিভাইডারের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগানো প্রয়োজন, যাতে রাতে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির লাইট চোখে না লাগে। রাস্তার বাঁক বা মোড়ের পার্শ্ববর্তী গাছ কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে, যাতে মোড় ঘোরার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়িগুলো সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। মোড় ঘোরার সময় গাড়ির গতি কমিয়ে আনতে হবে। যাত্রী ওঠা-নামার জন্য রাস্তার নির্ধারিত স্থানে ডাইভারশন স্পেস রাখতে হবে। তেলের পাম্পের প্রবেশ ও বহির্গমন পথ ক্রমান্বয়ে বড় রাস্তার সঙ্গে মিলিত হতে হবে। মহাসড়ক থেকে কমপক্ষে ১০০ গজ দূরে হাট-বাজারের অবস্থান থাকতে হবে। বাস বা ট্রাকে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী ও মাল বোঝাই করা যাবে না। গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ব্যবস্থা রাখতে হবে। মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে ট্রাকের মালের ওজন নির্ধারণী যন্ত্রের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, রিকশা ও ভ্যান অপসারণ করে চালকদের অন্য কাজের সংস্থান করতে হবে। মহাসড়কে নছিমন ও যন্ত্রচালিত যাত্রীবাহী ভ্যান চালানো বন্ধ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, দুর্ঘটনায় শুধু যাত্রীরই ক্ষতি হয় না— ড্রাইভার, হেলপার, সুপারভাইজারেরও ক্ষতি হয়। আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মালিক। অভাবের ঘানি টানতে হয় অন্য সদস্যদের।

চতুর্থত, সবাইকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। ড্রাইভারকে অনুধাবন করতে হবে, তার দায়িত্বে রয়েছে ৪০-৫০ জন যাত্রী অর্থাৎ ভুলের কারণে দুর্ঘটনা হলে কম-বেশি সবাই শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এমনকি কারও জীবনহানিও ঘটতে পারে। চালককে তার নিজের জীবনকেও ভালোবাসতে হবে যেহেতু এর ওপর নির্ভর করছে একটি পরিবার।

সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছেন অনেক চাকরিজীবী, সাংবাদিক, রাজনীতিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ। এ ধরনের অকাল মৃত্যু দেশ ও পরিবারের জন্য অভাবনীয় ক্ষতি। দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তি নিজের ও পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্য পীড়াদায়ক ও বোঝা হয়ে ওঠেন। তাই সুস্থ মন ও ধৈর্যের সঙ্গে গাড়ি চালাতে হবে। তবেই দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।

ডা. মোঃ ফজলুল হক : *সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান, মেডিসিন, সার্জারি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়*

www.kalerkantho.com

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

সড়ক কেন মৃত্যুফাঁদ?

প্রায় ৩০ বছর আগে এক পাকিস্তানি ট্রাক ড্রাইভার, যিনি ৪০ বছর গাড়ি চালানোর জীবনে একটিও দুর্ঘটনার কবলে পড়েননি। এমন একজন দক্ষ ড্রাইভারকে কোনো এক পত্রিকার পাতায় প্রশ্ন করা হয়েছিল—সড়ক দুর্ঘটনা এড়ানোর ক্ষেত্রে আপনার মতামত কী? উত্তরে বলেন, 'বিপরীত দিক থেকে আসা প্রতিটি গাড়ির ড্রাইভারকে ভাবতে হবে আমি ছাড়া সব ড্রাইভার অনভিজ্ঞ ও পাগল। সুতরাং ওই বোকা ড্রাইভারদের হাত থেকে আমাকে সতর্ক থেকে গাড়ি চালাতে হবে। তবেই দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে। এ থেকে সবাইকে শিক্ষা নিতে হবে। বর্তমানে আকস্মিক আশ্চর্যজনক ঘটনাবলির মধ্যে উল্লেখ করার মতো হচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনা। অপ্রত্যাশিতভাবে বিদায় নিতে হয়েছে অনেক ব্যক্তিত্বকে, যাদের স্থান পূরণ করার বিকল্প অনেক ক্ষেত্রেই নেই। এ মাসে উল্লেখযোগ্য হলো, গত ১৩ আগস্টের মানিকগঞ্জের সড়ক দুর্ঘটনা। এতে আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদ এবং এটিএন নিউজের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) সাংবাদিক আশফাক মুনীর মিন্তুকসহ পাঁচজন নিহত হন। সম্প্রতি মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার জোকা বাসস্ট্যান্ডের কাছে চুয়াডাঙ্গাগামী ডিলাক্স এবং ঢাকামুখী মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। অস্বাভাবিক মৃত্যু যা কারো কাম্য নয় এবং সহ্য করার মতো কোনো ব্যাপারও নয়। এ মৃত্যু পুরো জাতিকে ব্যথিত করেছে, বিশেষভাবে মর্মাহত হয়েছেন টিভি দর্শকরা। বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা একটি নিয়মিত ব্যাপার। যেসব রাস্তায় দুর্ঘটনা বেশি হয়, তার মধ্যে রয়েছে ঢাকা-টাঙ্গাইল ও ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক। ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত রাস্তায় মোড় রয়েছে ১০০টির বেশি, কালভার্ট ও বাজার রয়েছে আরো বেশি। আঁকাবাঁকা মোড়বিশিষ্ট রাস্তার কারণেই সড়ক দুর্ঘটনা হয় বেশি।

মিরসরাইয়ে ট্রাক দুর্ঘটনায় ৪৪ কিশোর শিক্ষার্থীর অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর রেশ না কাটতেই আরো অনেক সড়ক দুর্ঘটনাসহ ঘটে গেল এ যাবৎকালের উল্লেখযোগ্য ১৩ আগস্টের ঘটনাটি। এ দুর্ঘটনাটি মর্মস্পর্শী ও বেদনাদায়ক। এ ব্যাপারে আমরা সবাই মর্মাহত। এমনিভাবে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ অকালে ঝরে যাচ্ছে শুধু ড্রাইভারের ভুল ও ঘামঘেয়ালির কারণে। এ ধরনের ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে। ২০১০ সালে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে কয়েকটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় থাই ডেপুটি এম্বাসাডর মিস পন্নি লিকানা জুলিসহ প্রায় ১০০ জনের অকাল মৃত্যু ঘটে এবং আহত হন দুই শতাধিক। গত ২০০৯ সালের বিবিসির তথ্যানুযায়ী সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান প্রায় ১২ হাজার এবং প্রতিবছর গড়ে পাঁচ হাজার জন। এক জরিপে জানা যায়, দুর্ঘটনার জন্য প্রায় ৯৯ ভাগ দায়ী চালক নিজেই। এ ক্ষেত্রে জাল ড্রাইভিং লাইসেন্সের সহজপ্রাপ্যতাও একটি কারণ। আমার ধারণা মতে, জাল ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী চালক অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রধারী সন্ত্রাসীর চেয়ে কোনো অংশেই কম মারাত্মক ও ঝুঁকিপূর্ণ নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশিও বটে। প্রতিবছরই আমদানিতে গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে, সঙ্গে বাড়ছে যানজট। তেমনি বাড়ছে ড্রাইভারের চাহিদা। ফলে অদক্ষ ড্রাইভার দিয়ে গাড়ি চালানো ছাড়া অন্য কোনো উপায় আছে কি? নেই। কঠোর আইন ও এর সঠিক বাস্তবায়ন সময়ের দাবি। দুর্ঘটনার মূল কারণের মধ্যে রয়েছে হেলপার দিয়ে গাড়ি চালানো, ড্রাইভারের অদক্ষতা ও অসাবধানতা, চলন্ত অবস্থায় মোবাইল ব্যবহার করা। চালকের সঙ্গে সাইড টক করা এবং মাদকাসক্ত ড্রাইভার দিয়ে গাড়ি চালানো, ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত মাল বোঝাই ইত্যাদি দুর্ঘটনার মূল কারণ। অন্যদিকে অপ্রশস্ত রাস্তা ও কালভার্ট, ট্রাফিক আইন মেনে না চলা। জনসাধারণের ওভারব্রিজ ও জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার না করা। কালভার্টগুলোর বেশির ভাগই রাস্তার চেয়েও চাপা, যেখানে দুটি গাড়ি পাশাপাশি অবস্থান করলে একটুও জায়গা থাকে না চলাচলের জন্য। বর্তমানে চার লেনবিশিষ্ট রাস্তা হলে দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে যাবে। প্রতিদিন গড়ে দুই-তিনটি দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রতিবছর প্রায় ১০০০ থেকে ১৫০০ গাড়ি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে নিহত হচ্ছে বছরে গড়ে পাঁচ-ছয় হাজার, আহত হচ্ছে প্রায় চার-পাঁচ গুণ। এ থেকে নিস্তারের উপায় কী?

চার লেনবিশিষ্ট রাস্তার ব্যবস্থা করা সময়ের দাবি। দক্ষ, অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত ড্রাইভারকে লাইসেন্স প্রদান সাপেক্ষে গাড়ি চালাতে দেওয়া। ড্রাইভারকে ধূমপানসহ মাদক থেকে বিরত থাকা। এ ক্ষেত্রে নিয়মিত ড্রাইভারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা। দূরপাল্লার প্রতিটি গাড়িতে দুই জন অভিজ্ঞ ড্রাইভার রাখার বিধান থাকা। ড্রাইভার ও হেলপারের জন্য নির্ধারিত ড্রেস ব্যবহার করার বিধান রাখা, যাতে ড্রাইভারের আসনে হেলপার বসতে না পারে। রাস্তার মাঝখানে ডিভাইডার স্থাপন করা এবং ডিভাইডারের মধ্যে গাছ লাগানো, যাতে রাতে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির লাইট চোখে না লাগে। যাত্রী ওঠানামার জন্য রাস্তার নির্ধারিত স্থানে ডাইভারশন স্পেস রাখা। তেলের পাম্পের ক্ষেত্রে প্রবেশ ও বহির্গমন পথ ক্রমান্বয়ে বড় রাস্তার সঙ্গে মিলিত হওয়া। বিশ্বরোড থেকে কমপক্ষে ১০০ গজ দূরে হাট-বাজারের অবস্থান হওয়া। বাস বা ট্রাকে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী ও মাল বোঝাই না করা। গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ব্যবস্থা রাখা। বিশ্বরোডের বিভিন্ন স্থানে ট্রাকের মালের ওজন নির্ধারণী যন্ত্রের ব্যবস্থা রাখা। রিকশা, ভ্যান অপসারণ করে চালকদের অন্য কাজের সংস্থান করা। বিশ্বরোডে নছিমন ও যন্ত্রচালিত যাত্রীবাহী ভ্যান চালানো নিষিদ্ধকরণ (এ রোডের বেশির ভাগ ড্রাইভারই রাতে হেডলাইট ব্যবহার করেন না)। মনে রাখতে হবে, দুর্ঘটনায় শুধু যাত্রীই ক্ষতি হয় না—ড্রাইভার, হেলপার, সুপারভাইজারেরও ক্ষতি হয়। অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মালিক। অভাবের ঘানি টানতে হয় অন্য সদস্যদের।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান, মেডিসিন, সার্জারি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৩।
ঢাকা : রবিবার ১৪ ভাদ্র ১৪১৭
SUNDAY 29 AUGUST 2010

মাটি ও মানুষের কৃষি

শাইখ সিরাজ সম্পাদিত সাপ্তাহিক পূর্ণাঙ্গ কৃষিপাতা

কমপ্লিকেটেড হাইড্রোসেফালাসের সফল অস্ত্রপচার

মানুষের মত পশুপাখির রোগ-বালাই বিচিত্র যা সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময় সম্ভব। সম্প্রতি ১৭ দিন বয়সের একটি বাছুর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্স অনুষদের অন্তর্ভুক্ত ভেটেরিনারি টিচিং হাসপাতালে নিয়ে এলে দেখা যায়- বাছুরটি জন্মগতভাবেই কমপ্লিকেটেড হাইড্রোসেফালাস রোগে আক্রান্ত। মস্তিষ্কটির অবস্থান ঠিক থাকলেও এর উপরের অংশে মাথার খুলি ৩ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট ছিদ্র, যা মাংসযুক্ত থলের মধ্যে বর্ধিত আকারে জমা ছিল। শুধু তাই নয়, অস্ত্রপচার শুরুতে দেখা যায়, বাছুরটির দু'টি নাকের ছিদ্র পথে দু'টি বড় আকারের লোমযুক্ত মাংসে পিণ্ডের মত গোলাকার সিষ্ট, যার কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসেও বাছুরটির সমস্যা ছিল। তাই মূল অপারেশন শুরুর আগে Dermoid cyst অপারেশনের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিক করা হয়। এর পরেই সম্পন্ন করা হয় মূল অপারেশন।

বিকলাঙ্গ বাছুরটির সফল অস্ত্রপচার সম্পন্ন করেন মেডিসিন, সার্জারি এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ডাঃ মোঃ ফজলুল হক। এ সময় তার সহযোগী হিসেবে ছিলেন একই বিভাগের সহকারি অধ্যাপক ডাঃ বেগম ফাতেমা জোহরা, ডাঃ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও ডাঃ উম্মে কুলসুম রীমা। অপারেশনটি সম্পন্ন করতে সময় লাগে প্রায় ৩ ঘণ্টা। অপারেশনের স্থানে চামড়া অকেজো হওয়ায় ওই স্থানে বাছুরের তলপেট থেকে চামড়া নিয়ে অর্থাৎ প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে অপারেশন সম্পন্ন করা হয়।

ডাঃ মোঃ ফজলুল হক জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধা অত্যন্ত সীমিত হওয়ার পরও প্রতি সপ্তাহে এ ধরনের বিভিন্ন জটিল রোগের শল্য চিকিৎসা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই করা হয়। এক্ষেত্রে হাসপাতালটিতে সার্বক্ষণিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভাগীয় শিক্ষক, ডাঃ মোঃ শামীম আহসান, ডাঃ মোঃ ফারুক ইসলাম ও ডাঃ মোঃ তহিদার রহমান অত্যন্ত অগ্রণী ভূমিকা পালন কা[illegible]িকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হলে একদিকে ভে[illegible]টেরিনারি অনুষদের ছাত্র-ছাত্রীদের শল্য চিকিৎসায় বাস্তবজ্ঞান বাড়বে, অন্য[illegible]কে উত্তরবঙ্গের জনসাধারণ গবাদিপশুর সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে উপকৃত হবে এবং গবাদি পশুপাখি পালনে উৎসাহিত হবে।

ডাঃ মোঃ ফজলুল হক আরো বলেন, হাসপাতালটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে আরো ৪/৫ জন প্রভাষক দরকার। পাশাপাশি দরকার একটি আধুনিক অপারেশন থিয়েটার।

মাটি ও মানুষের কৃষি ডেস্ক

রবিবার ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮ ■ ২২ মে ২০১১ | দৈনিক ইত্তেফাক ১৩ পৃষ্ঠা

গবাদি পশুর প্রস্রাবের থলিতে পাথর

সচেতনতাই একমাত্র সমাধান

গবাদি পশুর প্রস্রাবের থলিতে পাথর হওয়া একটি মারাত্মক রোগ। পাথর হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে বাচ্চা বয়সে দুধের পাশাপাশি শুকনো গমের ভূষি, চাল, গম, ধানের কুড়া ইত্যাদি অধিক পরিমাণে এবং পানি ও ঘাস কম খাওয়ানো। দুধের উপর নির্ভরশীল কোনো গবাদি পশুর বাচ্চাকে কোনোভাবেই শুকনো গমের ভূষি, চাল, গম বা ভুট্টা খাওয়ানো যাবে না। এ ক্ষেত্রে রক্তে প্রয়োজনীয় পানির অংশ কম থাকায় প্রস্রাব কম হয়, ফলে প্রস্রাবের অধিক ঘনত্বের কারণে থলির মধ্যে ধীরে ধীরে তলানীর মত পাথর জমে প্রস্রাবের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। এ রোগে প্রায় ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ আক্রান্ত গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটে। প্রথমদিকে ছোট আকারের পাথরগুলো সাদা চালের গুঁড়োর মত প্রস্রাবের সাথে বের হলেও পরে বড় আকারের পাথরগুলো একসাথে জমা হয়। চিকিৎসা অনেক কঠিন হওয়ায় পাথরগুলো অপারেশন ছাড়া বের করা যায় না। এ অপারেশন অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ। প্রস্রাবের থলির প্রবেশ দ্বার বন্ধ হয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে থলিটি ফেটে যায় এবং প্রস্রাব তলপেটসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে জমা হয়। এ রোগের চিকিৎসার চেয়ে যাতে এ রোগ না হয় সেদিকে সবার নজর দিতে হবে। গবাদি পশুর পুরুষ বাচ্চাকে ২ মাস পর্যন্ত মায়ের দুধ ও পানি খাওয়াতে হবে। ৩ থেকে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধের পাশাপাশি ঘাস ও সামান্য পরিমাণে পানি মিশ্রিত গমের ভূষি ও ভাতের মাড় খাওয়াতে হবে। ৬ মাসের উপরে গেলে সবুজ ঘাস, খড়ের পাশাপাশি তরল গমের ভূষি, ধানের কুড়া, জাউ, খৈল ইত্যাদি খাওয়ানো যেতে পারে। শুকনো খাবার শুধু প্রস্রাবের থলি বা মূত্রনালীতে পাথর তৈরিই করে না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিমাণে শুকনো খাবার খাওয়ালে ৬ থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে পেট ফেঁপে গবাদি পশুর মৃত্যুও ঘটতে পারে। এ রোগ নির্ণয়ের জন্য আলট্রাসোনোগ্রাফি অথবা এক্সরে করে পাথরের উপস্থিতি ও অবস্থান নির্ধারণ করা যায়। একটানা ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা পুরুষ বাচ্চা প্রস্রাব না করলে বুঝতে হবে প্রস্রাবের থলিতে পাথর হতে পারে। আর এ ক্ষেত্রে দেরী না করে জরুরিভিত্তিতে ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। অনেক সময় থলে ফেটে গিয়ে গবাদি পশুর রক্ত, মাংস ও চামড়ার নিচে বিশেষ করে তলপেটে প্রস্রাব জমা হতে থাকে। এ ধরনের উপসর্গ গবাদি পশুর শতভাগ মৃত্যু নিশ্চিত করে। এ রোগে যেমনি শতভাগ মৃত্যু ঝুঁকি রয়েছে তেমনি নিয়ম মেনে চললে প্রায় শতভাগ গবাদি পশুকে নিরাপদ রাখা সম্ভব।

ডা. মো. ফজলুল হক
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান
মেডিসিন, সার্জারি এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১ মাঘ ১৪১৭
Dhaka : Friday 14 January 2011

বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি অনুষদের তত্ত্বাবধানে ৩৯টি শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়ে ৮টি প্রোগ্রামে স্নাতক ও ২২টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা চলছে। এখানকার সেমিস্টারভিত্তিক কোর্স ক্রেডিট সিস্টেমে মনোরম পরিবেশে লেখাপড়া দেশের সব শিক্ষানুরাগীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে

উত্তরবঙ্গের কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অগ্রগতি ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিকল্পিত প্রয়োগ অপরিহার্য। প্রকৃতির অপার রহস্যের অন্তর্নিহিত তথ্য আহরণ ও উদঘাটন করে তা মানব কল্যাণে প্রয়োগ করার কৌশলই হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। কৃষিসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি উৎকর্ষতার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের উত্তর জনপদ দিনাজপুরের প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠেছে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। কৃষকদের স্বার্থে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হাজী মোহাম্মদ দানেশের নামে নামকরণ করা হয় এ বিশ্ববিদ্যালয়টির। ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সুযোগ্য কন্যা ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উত্তরবঙ্গে প্রথম হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির কার্যক্রম শুরু হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞানচর্চা, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পঠন, পাঠন ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ করা এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভৌগলিক দিক থেকে হাবিপ্রবির অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনোরম পরিবেশের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতার ১১ বছর পর গত ৯ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রফেসর ড. এম আফজাল হোসেন।

এ বিশ্ববিদ্যালয়টি দিনাজপুর শহর হতে প্রায় ১০ কিলোমিটার উত্তরে ৮৫ একর সমতল ভূমির ওপর দিনাজপুর, রংপুর, ঢাকা বা দিনাজপুর পঞ্চগড় মহাসড়ক সংলগ্ন পশ্চিম পাশে বহুতল ভবন ছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির মনমুগ্ধকর সবুজ ফলজ বৃক্ষরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত দৃষ্টি নন্দন ক্যাম্পাসটি।

হাবিপ্রবি চলছে ৭টি অনুষদীয় চাকার উপর ভর করে। অনুষদগুলো হচ্ছে (১) এগ্রিকালচার (২) ফিসারিজ (৩) ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্স (৪) বিজনেস স্টাডিজ (৫) এগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ফুডপ্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং (৬) কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (৭) পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ। ওই ৭টি অনুষদ হতে ১০ প্রকারের ডিগ্রি প্রদান করা হয়ে থাকে যেমন, (১) বিএসসি, এজি (অনার্স), (২) ডিভিএম (ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন) (৩) বিএসসি ফিশারিজ (অনার্স) (৪) বিবিএ (৫) বিএসসি সিএসই (৬) বিএসসি ফুড এন্ড প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং (৭) বিএসসি টেলিকম এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (৮) বিএসসি এগ্রিল এন্ড বায়োরিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং (৯) এমএস/এমবিএ এবং (১০) পিএইচডি ডিগ্রিগুলো প্রদান করা হয়ে থাকে। ৭টি অনুষদের অধীনে রয়েছে মোট ৩৯টি বিভাগ, ১৫৯ জন শিক্ষক, ৯৭ জন কর্মকর্তা, ৩৫৬ জন কর্মচারী এবং ২ হাজার ১৮ জন ছাত্রছাত্রী। ডরমেটরি ৬টি (ছাত্রদের ৪টি, ছাত্রীদের ২টি) যা প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেক। এছাড়াও ২০ হাজারের অধিক দেশি-বিদেশি পুস্তক এবং সাময়িকী মোট শিরোনাম ৫০টি। ই-মেইল ও ওয়েবসাইটসহ আরও কিছু সুযোগ সুবিধা রয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ বিশ্ববিদ্যালয়টি কৃষিসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করে আসছে।

গবেষণা কার্যক্রম দুটি প্রধান ধারায় পরিচালিত হয়ে থাকে। একটি ডিগ্রি গবেষণা ও অন্যটি প্রকল্প গবেষণা। এমএস ও পিএইচডি শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি চাহিদার অংশ হিসেবে ডিগ্রি গবেষণা শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কোন বহিঃস্থ সংস্থার অর্থানুকূলে প্রকল্প গবেষণার কাজ পরিচালিত হয়। গবেষণা প্রকল্পগুলো সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বিগত ২০০৪ সালে আইআরটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ পর্যন্ত আইআরটি-এর তত্ত্বাবধানে ২৭টি গবেষণা প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে চলমান প্রকল্পের সংখ্যা ৩৩টি। একাডেমিক পড়াশুনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মননশীলতার বিকাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। শারীরিক শিক্ষা বিভাগের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে বিভিন্ন আন্তঃহল টুর্নামেন্ট, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ধারা অব্যাহত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্ক সাংস্কৃতিক জোট, সৈঁজুতি নাট্যচক্র, রোটার‍্যাক্ট ক্লাব, ডিবেটিং সোসাইটি, দি ডেইলি স্টার রিডারস ক্লাব নামে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক সংগঠন রয়েছে। হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে প্রশাসনিক ভবন ১টি, একাডেমিক ভবন, ৬টি আবাসিক হল ও ১০০ আসন বিশিষ্ট ১টি ভি আই পি কনফারেন্স রুম। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সৌহার্দ ও সহযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রয়েছে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র যেখানে রয়েছে ক্যাফেটেরিয়া ও ছাত্র সংসদ ভবনসহ সংস্কৃতি চর্চার সুব্যবস্থা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠার প্রত্যয়ে দেশবাসীর বিশাল প্রত্যাশা ও অমিত সম্ভাবনা নিয়ে আজ থেকে ১১ বছর আগে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল। লক্ষ্য পূরণে এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকসহ সবাই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমাদের যেতে হবে আরও অনেক দূরে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি অনুষদের তত্ত্বাবধানে ৩৯টি শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়ে ৮টি প্রোগ্রামে স্নাতক ও ২২টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা চলছে। এখানকার সেমিস্টার ভিত্তিক কোর্স ক্রেডিট সিস্টেমে মনোরম পরিবেশে লেখাপড়া দেশের সব শিক্ষানুরাগীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা দুই হাজারের অধিক। চলতি ২০১১ ইং শিক্ষাবর্ষে স্নাতক পর্যায়ে প্রায় ৬৫০জন দেশি-বিদেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যকে সমুন্নত রেখে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটিয়ে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের নিমিত্তে এ অঞ্চলে একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ হিসেবে হাবিপ্রবির গুরুত্ব অপরিসীম নিঃসন্দেহে। গত এক দশকের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে ছাত্র-শিক্ষকের নিরলস প্রচেষ্টা ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সর্বশেষ উদ্ভাবিত জ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্যভাণ্ডার ব্যাপকভাবে আত্মীকরণ, চর্চা ও প্রয়োগের মাধ্যমে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করবে। একবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি জাতি গঠনে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। সেই সঙ্গে বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

ডা. মো. ফজলুল হক
সহযোগী অধ্যাপক
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

খাদ্য ও ফলমূলে বিষঃ রোধ করতে হবে এখনই

প্রফেসর ডাঃ মোঃ ফজলুল হক

কতিপয় ব্যবসায়ীদের নিকট মুনাফার বিষয়টি সব কিছুকেই হার মানায়। তাদের নিকট ক্রেতা বা ভোক্তার জীবন তুচ্ছ, টাকাই মুখ্য। অথচ প্রতিটি মানুষের নিকট তার জীবনের চেয়ে আপন আর কিছুই নেই। জীবনে সুস্থ থাকাও অনেক বড় নিয়ামত ও সম্পদ। এদেশের হাতেগোনা কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীর হাতে গোটা দেশের মানুষ জিম্মি। টাকা খরচ করে বিষ খাচ্ছি, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, এক কথায় সবাই। প্রতিবছর হাজার হাজার শিশু হতে বৃদ্ধ সবাই ডাক্তারের শরনাপন্ন হচ্ছি শুধুমাত্র ভেজাল মিশ্রিত ফলমূল, মাছ, শাক-সবজি ও তৈরী খাবার খেয়ে। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরিক্ষান্তে দেখা যায় কিডনী, লিভার পাকস্থলীসহ অনেক অঙ্গই জটিল রোগে আক্রান্ত। পরিসংখ্যানে দেখা যায় ফল-মূল, মাছ, মাংস ও তৈরী খাবার সবকিছুতেই কম বেশী ভেজাল, যা কেমিক্যাল নামের বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ। যেমন ফল পাকাতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড (বিষ), মাছ, মাংস, দুধে ফরমালিন (যা মৃত মানুষসহ সংরক্ষণে ব্যবহার হয়ে থাকে) সালফিউরিক এসিড গুড়াদুধে, ডিডিটি পাউডার শুটকি মাছে, কলা ও পেপে পাকানোর জন্য ইথাইলিন অক্সাইড, ইউরিয়া (সার) চাউলের সৌন্দর্য বাড়াতে, আলকাতরা মিষ্টি ও কাপড়ের রঙে, ইটের গুড়া শুকনা মরিচ ও হলুদের সাথে, কাঠের গুড়া খোলা চায়ের সাথে, ডালডা ঘিতে ভেজাল করা হয়। এমনকি গুড়, মুড়ি চকলেট, মিষ্টি, আইসক্রীম ও সরবতের জুস, প্যাকেটজাত ফলের রস ইত্যাদি বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত করে আকর্ষনীয় করে বিক্রি করার মাধ্যমে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের অজান্তেই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। বিষাক্ত ফলমূলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ভক্ষণ করে ঔষধের দোকান ও হাসপাতালে ভিড় জমাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। মাত্রাতিরিক্ত ঔষধ সেবনেও ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ছে স্বাস্থ্যের উপর। আমাদের দেশী ফলের মধ্যে আম, লিচু ও পেপে এবং বিদেশ হতে আমদানীকৃত ফল, যেমন: আপেল, নাশপাতী, আঙ্গুর এবং খেজুর ইত্যাদিতে ফরমালিন ব্যবহার করে মাসের পর মাস পচন রোধ করে থাকে অধিক মুনাফা লোভী একশ্রেনীর ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়িরা লিচুর আকার বৃদ্ধি ও আর্কষনীয় রং করার জন্য বিষের সাথে ভিটামিন ও হরমোন স্প্রে করছে।

রাজশাহী, চাপাইনবাগঞ্জ ও দিনাজপুরের বিভিন্ন আম ও লিচুর বাগানে মুকুল আসার পর ৫-৬ বার বিষাক্ত কেমিক্যাল স্প্রে করা হয়। এতে তেমন সমস্যা নেই। তবে বিষ প্রয়োগের পরপর সেগুলি বাজারজাত করা মারাত্মক। আকার্ষনীয় রং যার যত বেশী সেখানে বিষাক্তের পরিমাণও বেশী। মানব দেহের জন্যও ক্ষতিকারক একই সঙ্গে আম পাকার পর পঁচন রোধ কল্পে নিয়মিত ফর্মালিন স্প্রে করে অসাধু ব্যবসায়ীরা। ক্যালসিয়াম কার্বাইড মানুষের চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি, কিডনী ক্যান্সার, মস্তিস্কেও ক্ষতিসাধন এবং গর্ভবতী মায়ের সন্তান হতে পারে বিকলাঙ্গ। কতিপয় ব্যবসায়ী রমজান মাসের ইফতারীতেও বিষাক্ত বিভিন্ন রংগের কেমিক্যাল মিশ্রিত করে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য। ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে মহাখালী ইনস্টিটিউট অব ফুড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি পৃথকভাবে দেশী বিদেশী বিভিন্ন কোম্পানীর জুসের নমুনা পরীক্ষা করে দেখতে পায় যে ফলের জুসে সামান্যই ফল থাকে যা অত্যন্ত নিম্নমানের। এ সকল জুসের কৃত্রিম রং ও ঘ্রাণ বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয়। বিভিন্ন তথ্যে জানা যায় কাঁচা আম পাকাতে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম কার্বাইড ব্যবহার করে। টমেটো পাকাতে ইরাপ্রোসিন, ফর্মালিন ও মেটালিন ইয়োলো মিশানো হয়। সকলের জন্য বিশেষ করে বাচ্চাদের অতি প্রিয় জুসের সাথে নিষিদ্ধ সোডিয়াম সাইক্লোমেট, কাপড়ের রং, সাইট্রিক এসিড ও প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করা হয়। অম্লতা বাড়াতে ফসফরিক এসিড এবং ঠান্ডা রাখতে ইথাইলিন গ্লাইকল মিশ্রিত করে জুস বাজার জাত করা হচ্ছে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বড়ই পরিতাপের বিষয় গত বছর (২০১২) কনজুমার এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সূত্রমতে ৮টি কোম্পানীর ১২টি ব্রান্ডের জুস বিএসটিআই এর ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষান্তে দেখা যায় ঐ

জুসে ফলের কোন অস্তিত্বই নেই। বিএলআরআই এক প্রতিবেদনে প্রকাশ গবাদি প্রাণির খাদ্যে স্বল্পমাত্রায় এন্টিবায়োটিক, হরমোন ও কীটনাশক মেশানো হয়। যা পরোক্ষভাবে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক।

দীর্ঘদিন খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যাবে, শিশুরা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীতে আক্রান্ত হয়। দেশের বিশিষ্ট শিশু কিডনী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. মোয়াজ্জেম হোসেন ও কিডনী রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদের তথ্যমতে ১০ বছর আগে দেশে কিডনী রোগীর সংখ্যা ছিল ৮০ লাখ। এখন এ সংখ্যা দুই কোটির অনেক বেশি এবং তাদের অর্ধেকই শিশু। এছাড়া দেশে বছরে ৮৪ হাজার মানুষ নতুনভাবে ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে ভেজাল খাদ্য খেয়ে। উল্লেখ্য গত ২০১২ সালে দিনাজপুরে ৪ জন শিশু মারা যায় বিষ মিশ্রিত লিচু খেয়ে। বাগানের মালিকের শিশুও মারা যায় ঐ ফল খেয়ে। এক প্রতিবেদনে প্রকাশ বিষাক্ত খাবারের কারণে বাংলাদেশে প্রায় ৬ শতাংশ দম্পতি বন্ধ্যা এবং ১০ শতাংশ মানুষ প্রতিবন্ধীর শিকার। খাদ্য ও ফলমূলে ব্যবহারকৃত বিষের প্রভাবে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, কিডনী রোগ, লিভার সিরোসিস ও হৃদরোগ প্রভৃতি মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অকালে ঝরে যাচ্ছে অনেক মূল্যবান জীবন যা সাধারণ মানুষ বুঝতেও পারছেন না। শুধু তাই নয় বন্ধ্যাত্ব ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মহার বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এদেশের ধনী শ্রেনী, কারণ হিসেবে বলা যায় বিদেশী ফল ও ফাষ্টফুডে এ শ্রেণীই বেশী অভ্যস্ত।

গবেষকরা বলেছেন মানুষের শরীরে ০.২ মাইক্রোগ্রাম বিষ সহনীয় হলেও বিভিন্ন শ্রেনী ও পেশার মানুষের রক্তে পাওয়া গেছে সর্বনিম্ন ১.৬ মাইক্রোগ্রাম এবং সর্বোচ্চ ৯.৭ মাইক্রোগ্রাম যার ৯০ শতাংশ শরীরের চর্বিতে মিশে আছে যা ২০ বছরেও নষ্ট হয় না। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (বিএসটিআই) এর তথ্যে জানা যায় ভ্রাম্যমান আদালত প্রতিবছর প্রায় ১৮২২ টি ক্রিমিন্যাল কেস থেকে প্রায় ৪ কোটি টাকা আদায় করে থাকেন। ২০০৪ সালের এক রিপোর্টে প্রকাশ ৭৬ শতাংশ খাদ্যের মধ্যেই ভেজাল রয়েছে। আইসিডিডিআরবি এর তথ্যানুযায়ী পঞ্চাশ শতাংশ তৈরী খাদ্য সামগ্রীর মধ্যেই কাপড়ের রং পাওয়া যায়, যা মানব দেহের পাকস্থলীতে ক্ষতের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন তথ্য থেকে প্রতিয়মান হচ্ছে খাদ্যদ্রব্য ফলমূলের বিষাক্ত অভিশাপ হতে বাঁচতে হলে প্রয়োজন জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সঠিক আইন ও এর বাস্তবায়ন। ইতিপূর্বে খাদ্যে ফরমাণি ব্যবহারের অপরাধে তেমন কোন আইন ছিল না। তবে ১৯৫৯ সালের জাতীয় ভোক্তা অধিকার আইন ও পিউর ফুড অর্ডিনেন্স আইন এবং ১৯৭৪ সালের Special Power Act নামে আইন বিদ্যমান আছে। এ আইনে ফরমালিন অপব্যবহারকারীর শাস্তি ৩ বছর জেল ও ২ লক্ষ টাকা অর্থ দন্ডের বিধান রয়েছে। এ বছর বর্তমান সরকার ফরমালিন অপব্যবহারকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি ১৫ বছর ও এক লক্ষ টাকা জরিমানার বিধান করে নতুন আইন তৈরী করেছেন, যা যুগোপযোগী। তবে সঠিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এ বছর হতে এককভাবে ফরমালিন আমদানীর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ইতি মধ্যেই এর আমদানী হ্রাস পেয়েছে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য ইতি পূর্বে সঠিক আইন না থাকায় বছরে প্রায় ৫০০ মেট্রিকটন, ফরমালিন আমদানী হত। চলতি অর্থ বছরের অর্ধেক সময়ে আমদানীর পরিমান হ্রাস পেয়ে দাড়িয়েছে মাত্র ৮৭ মেট্রিকটন। বর্তমান আইনে ফরমালিন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের বানিজ্য মন্ত্রণালয় হতে লাইসেন্স সংগ্রহ করা বাধ্যতামুলক। নতুন আইনের সঠিক প্রয়োগ ও এর বাস্তবায়নের ফলে বিগত দিনের ন্যায় যত্রতত্র এর প্রাপ্ততা হ্রাস পাবে। ভবিষ্যতে ফল মূল, টমেটো, মাছ, মাংসসহ বিভিন্ন খাদ্যে ফরমালিনের যথেচ্ছ ব্যবহার হ্রাস পাবে। ফরমালিন একটি কেমিক্যাল যা মেডিক্যাল ও ভেটেরিনারি চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের নিমিত্তে মৃত মানুষ ও গবাদি প্রাণির অঙ্গ প্রতঙ্গ সংরক্ষণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত পক্ষে গবেষণার জন্য প্রয়োজন মাত্র ১০০ মেট্রিকটন। অর্থাৎ বাকী ৪০০ মেট্রিকটন ফরমালিন মানব দেহে বিভিন্ন খাদ্যের মাধ্যমে প্রবেশ করে ক্ষতিসাধন করে (তথ্যঃ Institute of public Health)। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বিশেষ করে ভ্রাম্যমান আদালত ও র‍্যাব প্রতিবছরই শতশত মন বিষাক্ত আম, মাছসহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী জব্দ ও ধ্বংস করে থাকেন। এর পরও অসাধুব্যবসায়ীরা তাদের অপতৎপরতা চালিয়েই যাচ্ছে। বিষাক্ত ফলমূল ও খাদ্যের অভিশাপ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ফলমূল, টমেটো, কাচামরিচ, শষা ও বেগুন ব্যবহারের পূর্বে পানিতে ডুবিয়ে রাখুন কমপক্ষে ১ঘন্টা। দোকানে তৈরীকৃত ফাস্টফুড ও জুস ছেড়ে দিওয়াই উত্তম উপায়। তবে কিছুটা আশার আলো হচ্ছে ঢাকাসহ কয়েকটি শপিং সেন্টারে ফরমালিনমুক্ত ফলমূল, শাকসবজি মাছ মাংসসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রির যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা কতটুকু বাস্তবায়িত হবে সেটিই প্রশ্ন। ব্যবসায়ীদের মধ্যেও ভাল মানুষ আছে, বিবেকবান মানুষের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। এমুহুর্তেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ্য রাখার জন্য বিষের অভিশাপ মুক্ত হতে হবে। সে জন্য এখনই খাদ্যে ও ফলমূলে বিষ দেওয়া রোধ করার কার্যকরপদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আইনের যথাযথ প্রয়োগ সকলকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও নিজের বিবেকের কাছে সৎ ও নিষ্ঠাবান হতে হবে। তবেই সকল সমস্যা দূরীভূত হবে।

লেখক

চেয়ারম্যান মেডিসিন, সার্জারী এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

ই-মেইলঃ

fhoque.hstu@gmail.com

মোবাইল নং- ০১৭৫০০৯০৪৫৮

সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা-৪

১৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ২০১৮ইং

১৫ আগস্টের সেই কালো রাত

॥ প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হক (বীর মুক্তিযোদ্ধা) ॥

১৫ আগষ্ট বাঙালি জাতির জন্য এক কলঙ্কময় অধ্যায়। প্রতিবছরই পালাক্রমে আগস্ট ফিরে আসে। কিন্তু শহীদ হয়েছেন যারা তারা আর কোন দিন ফিরে আসবে না। বঙ্গবন্ধুর অবুঝ শিশু শেখ রাসেল কি অপরাধ করেছিল? অন্তঃসত্ত্বা আরজু মনির কি অপরাধ ছিল? ঘাতকদের মূল লক্ষ্যই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের সকলকে হত্যা করে দেশকে পূর্ব পাকিস্তান বানানো। আল্লাহর বিচার দুনিয়াতেও কিছু হয় তার প্রমান জেল-ফাঁসি শুধু নয়, আরও অনেক বিষয় আছে। পবিত্র কোরআন শরীফের সুরা বাকারার আয়াত নং ১৭৮-এ উল্লেখ আছে যারা কোন মানুষকে অন্যায় ভাবে হত্যা করল বিনিময়ে তাদের শাস্তি হত্যা (ফাঁসি) যাকে ইসলামিক পরিভাষায় বলা হয় কেসাস এবং এই হত্যার ষড়যন্ত্রকারী বা আদেশ দাতার শাস্তি আরও কঠিন। সুরা বাকারার আয়াত নং ২১৭-তে উল্লেখ রয়েছে **"ওয়াল ফেতনাতু আকবারু মিনাল কাতলি"** যার অর্থ দাড়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা জঘন্যতম। এ ক্ষেত্রে ঐ ঘাতকদের বিচারের রায় অন্তত হওয়া উচিৎ। বঙ্গবন্ধু তিনটি জিনিসকে ভয় পেতেন, তা হলো- বিষধর সাপ, কুমীর এবং মোনাফেক। মোনাফেকদের মূল চরিত্র হলো, তাদের অন্তরে এক বাইরে ভিন্ন চিন্তা। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার বেলায়ও হত্যাকারীরা মোনাফেকের ভূমিকা রেখেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের সাথে চলেছে, খেয়েছে, ভালোভালো কথা বলেছে, হাসিতামাশা করেছে, চাকুরির ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা নিয়েছে অর্থাৎ সব ধরনের স্বার্থ আদায় করেছে কিন্তু মনের মধ্যে ছিল হিংস্র স্বভাব। সর্বদা সুযোগ খুঁজেছে কীভাবে, কখন-কোথায় বঙ্গবন্ধুকে শুধু নয় তাঁর ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজনসহ হত্যা করা যায়। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে এদেশের আলো-বাতাসে লালিত সেই মোনাফেকরা যারা বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে। ১৫ আগস্ট ভোর রাতে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২নং বাড়ীতে অতর্কিত হামলা চালিয়ে সেদিন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন্নেছা, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ কামাল, মেজ পুত্র লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি ও মন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, আরিফ সেরনিয়াবাত, দৌহিত্র সুকান্ত আব্দুল্লাহ বাবু, ভ্রাতুষ্পুত্র শহীদ সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা ও সাংবাদিক শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা অফিসার কর্ণেল জামিল আহমেদ এবং ১৪ বছরের কিশোর আবদুল নঈম খান রিন্টুসহ পরিবারের ১৬ জন সদস্য ও আত্মীয়স্বজনকে ঘাতকরা হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু সবসময় ভাবতেন বাংলাদেশে তার কোন শত্রু নেই, থাকতে পারে না, এটিই স্বাভাবিক। ধানমন্ডির ৩২ নং বঙ্গবন্ধুর বাড়িটি কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বঙ্গবন্ধুর পরিধেয় সেই রক্ত মাখা পাঞ্জাবী, মুজিব কোট, চশমা, জায়নামাজ আর পবিত্র কোরআন শরীফ সংরক্ষিত রয়েছে ৩২নং ধানমন্ডির যাদুঘরে, যা দেখলে ব্যথিত করে দর্শনার্থীদের হৃদয়। বুলেটের দাগ ও বুলেটবিদ্ধ দেওয়াল বহন করছে সেই রক্তমাখা শোকের ছায়া। সাংবাদিক লেখক অ্যান্থনি মাসকারেনহাস তাঁর লেখা বইয়ের একটি অংশে উল্লেখ করেছেন, ২০ মার্চ, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর ঘাতক মেজর ফারুক জে. জিয়াউর রহমানকে ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরিকল্পনার বিষয়ে অবহিত করেছিলেন। মেজর জিয়া বলেছিলেন, অগ্রসর হও। তবে সরাসরি তোমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারব না। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর মেজর জিয়াউর রহমান হত্যাকারীদের বাঁচানোর জন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করে এবং হত্যাকারীদের বিদেশে পালাতে সাহায্য করে ও চাকরীর ব্যবস্থা করে দেয়। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ সালে স্বপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মূল হোতাই ছিলেন জিয়াউর রহমান। অ্যান্থনি মাসকারেনহাস আরো বলেছেন জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহনের পর তাঁর নির্দেশে স্বাধীনতার পক্ষশক্তিকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করা হয়। আমেরিকার সাংবাদিক ও লেখক লরেন্স লিফশুলজ (পুলিৎজার শান্তি পুরস্কার বিজয়ী) লিখেছেন, কর্নেল আবু তাহের, খালেদ মোশাররফসহ অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যার জন্য দায়ী জিয়াউর রহমান।

সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হক (বীর মুক্তিযোদ্ধা) অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, মেডিসিন সার্জারি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ; হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

এখানেই শেষ নয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার টার্গেট করে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা চালানো হয় বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের জনসভায়। আইভি রহমানসহ ২৪ জন মৃত্যুবরণ করেন এবং শেখ হাসিনাসহ আহত হন পাঁচ শতাধিক। ওই সময়টা ছিল জামায়াত-বিএনপির শাসনামল। ওই সময় তারেক জিয়ার হাওয়া ভবন ছিল সকল অপকর্মের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর মদদেই দুর্বৃত্তরা বঙ্গবন্ধু এভিনিউ-এ শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলা চালায়। ওই হৃদয়বিদারক ঘটনার জন্য তারা বিচার তো দূরের কথা, দুঃখও প্রকাশ করেনি।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পেয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। তেমনি তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার সঠিক নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি এক লাখ ৩১ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের সমুদ্র জলসীমা নিয়ে বিশাল ভূখণ্ড। এ ছাড়া তিনি প্রায় ৬৫ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছেন ১১১টি ছিটমহলের বাসিন্দাদের। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রবেশ করল সুদূর মহাকাশে। গত ১২ মে ২০১৮ শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সফল উৎক্ষেপন দ্বারা ৫৭ তম সদস্য রাষ্ট্রের তালিকায় পৌছে গেল বাংলাদেশ। দ্রুতগতিতে আজ দেশ উন্নয়নের প্ল্যাটফর্মে ধাবমান। সব বাধা অতিক্রম করে আগামী ২০১৯ সালের শেষ দিকে যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে বহুমুখী পদ্মা সেতুটি, যার উভয় তীরে গড়ে উঠবে শত শত মিলকারখান্না, হাটবাজার, বিমানবন্দর, রেলস্টেশনসহ অনেক কিছু। আমরা হব আরো সম্মানিত জাতি। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে যে কুচক্রী মহল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করেছে, তারা বাঙালি জাতির চিরশত্রু। তাদের ব্যাপারে সবাইকে সাবধান থাকতে হবে। এ দেশের শান্তি ও স্বাধীনতার পক্ষের সবাইকে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধহয়ে ওই অপশক্তিকে রুখতে হবে। সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের এ দেশে কোনো ঠাঁই হবে না।

***লেখক** : অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, মেডিসিন সার্জারি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ; হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।*

www.kalerkantho.com

১৪ ৩১ মে ২০১৩, শুক্রবার কালের কণ্ঠ উপ-সম্পাদকীয়

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

খাদ্য ও ফলমূলে ভেজাল : শেষ কোথায়?

কিছু ব্যবসায়ীর কাছে মুনাফার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বাধিকার পায়। তাদের কাছে ক্রেতা বা ভোক্তার জীবন তুচ্ছ, টাকাই মুখ্য। অথচ প্রতিটি মানুষের কাছে তার জীবনের চেয়ে আপন আর কিছুই নেই। সুস্থ থাকা আল্লাহ প্রদত্ত বড় নিয়ামত ও সম্পদ। এ দেশের হাতেগোনা কিছুসংখ্যক ব্যবসায়ীর কাছে গোটা দেশের মানুষ জিম্মি। তাই টাকা খরচ করে বিষ খাচ্ছি, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র—এক কথায় সবাই। প্রতিবছর হাজার হাজার শিশু থেকে বৃদ্ধ—সবাই ডাক্তারের শরণাপন্ন হচ্ছি শুধু ভেজালমিশ্রিত ফলমূল, মাছ, শাকসবজি ও নানা খাবার খেয়ে। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা যায়, কিডনি, লিভার, পাকস্থলীসহ আমাদের অনেক অঙ্গই জটিল রোগে আক্রান্ত। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ফলমূল, মাছ, মাংস ও তৈরি খাবার—সব কিছুতেই কম-বেশি ভেজাল, যা প্রকৃতপক্ষে কেমিক্যাল নামের বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ। যেমন ফল পাকাতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড (বিষ), মাছ, মাংস, দুধে ফরমালিন (যা মানুষের মৃতদেহ সংরক্ষণে ব্যবহার হয়ে থাকে), সালফিউরিক এসিড গুঁড়া দুধে, ডিডিটি পাউডার গুঁটকি মাছে, কলা ও পেঁপে পাকানোর জন্য ইথাইলিন অক্সাইড, ইউরিয়া (সার) চালের সৌন্দর্য বাড়াতে, আলকাতরা মিষ্টি ও কাপড়ের রঙে, ইটের গুঁড়া শুকনা মরিচ ও হলুদের সঙ্গে, কাঠের গুঁড়া খোলা চায়ের সঙ্গে এবং ডালডা-ঘিতে ভেজাল দেওয়া হয়। এমনকি গুড়, মুড়ি, চকোলেট, মিষ্টি, আইসক্রিম ও ফলের জুস, প্যাকেটজাত ফলের রস ইত্যাদিতে বিষাক্ত দ্রব্য মিশিয়ে আকর্ষণীয় করে বিক্রি করে দেশের লাখ লাখ মানুষের অজান্তেই মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। বিষ প্রয়োগের পরপর সে ফলগুলো বাজারজাত করাই মারাত্মক। আকর্ষণীয় রং যার যত বেশি, সেখানে বিষের পরিমাণও তত বেশি। মানবদেহের জন্যও ক্ষতিকারক। একই সঙ্গে আম পাকার পর পচন রোধকল্পে নিয়মিত ফর্মালিন স্প্রে করে অসাধু ব্যবসায়ীরা। ক্যালসিয়াম কার্বাইড মানুষের চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি, কিডনি ক্যান্সার, মস্তিষ্কের ক্ষতিসাধন করে এবং গর্ভবতী মায়ের সন্তান হতে পারে বিকলাঙ্গ। ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে কিছু ব্যবসায়ী রমজান মাসের ইফতারিতেও বিষাক্ত বিভিন্ন রঙের কেমিক্যাল মেশায়। মহাখালীস্থ ইনস্টিটিউট অব ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ২০১২ সালের ডিসেম্বরে পৃথকভাবে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন কম্পানির জুসের নমুনা পরীক্ষা করে দেখতে পায়, ফলের জুসে সামান্যই ফল, তাও অত্যন্ত নিম্নমানের। এসব জুসের রং ও ঘ্রাণ বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয়। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএলআরআই) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গবাদিপ্রাণীর খাদ্যে ক্ষুদ্রমাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক, হরমোন ও কীটনাশক মেশানো হয়। পরোক্ষভাবে যা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক। এসব মাংস দীর্ঘদিন খেলে রোগপ্রতিরোধক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যাবে, শিশুরা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী হয়ে যায়। তথ্যমতে, ১০ বছর আগে দেশে কিডনি রোগীর সংখ্যা ছিল ৮০ লাখ। এখন এ সংখ্যা দুই কোটির অনেক বেশি এবং তাদের অর্ধেকই শিশু। এ ছাড়া দেশে বছরে ৮৪ হাজার মানুষ নতুনভাবে ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে ভেজাল খাদ্য খেয়ে। উল্লেখ্য,

> ১৯৫৯ সালের জাতীয় ভোক্তা অধিকার আইন ও পিওর ফুড অর্ডিন্যান্স এবং ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন রয়েছে। এ আইনে ফরমালিন অপব্যবহারকারীর তিন বছর জেল ও দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে

বিগত ২০১২ সালে দিনাজপুরে চারজন শিশু মারা যায় বিষ মিশ্রিত লিচু খেয়ে। বাগানের মালিকের শিশুও মারা যায় ওই ফল খেয়ে। এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, বিষাক্ত খাবারের কারণে বাংলাদেশে প্রায় ছয় শতাংশ দম্পতি বন্ধ্যত্ব এবং ১০ শতাংশ মানুষ প্রতিবন্ধিত্বের শিকার। খাদ্য ও ফলমূলে ব্যবহৃত বিষের প্রভাবে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, কিডনি রোগ, লিভারসিরোসিস, হৃদরোগ প্রভৃতি মারণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অকালে ঝরে যাচ্ছে অনেক মূল্যবান জীবন। শুধু তা-ই নয়, বন্ধ্যত্ব ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মহার বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এ দেশের ধনিক শ্রেণী; কারণ হিসেবে বলা যায়, বিদেশি ফল ও ফাস্টফুডে এই শ্রেণীই বেশি অভ্যস্ত।

স্বাস্থ্যের জন্য মহাক্ষতিকর ফরমালিনের আইনগত ব্যবহার নিয়েও অনেক কথা রয়েছে। ইতিপূর্বে খাদ্যে ফরমালিন ব্যবহারের বিরুদ্ধে তেমন কোনো আইন ছিল না। তবে ১৯৫৯ সালের জাতীয় ভোক্তা অধিকার আইন ও পিওর ফুড অর্ডিন্যান্স এবং ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন রয়েছে। এ আইনে ফরমালিন অপব্যবহারকারীর তিন বছর জেল ও দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। এ বছর সরকার ফরমালিন অপব্যবহারকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি ১৫ বছর ও এক লাখ টাকা জরিমানার বিধান করে নতুন আইন তৈরি করেছে, যা যুগোপযোগী। তবে এর সঠিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন। ফরমালিন একটি কেমিক্যাল, যা মেডিক্যাল ও ভেটেরিনারি চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য মৃত মানুষ ও গবাদিপ্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংরক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে গবেষণার জন্য প্রয়োজন মাত্র ১০০ মেট্রিক টন। অর্থাৎ বাকি ৪০০ মেট্রিক টন ফরমালিন মানবদেহে বিভিন্ন খাদ্যের মাধ্যমে প্রবেশ করে ক্ষতিসাধন করে (তথ্য : Institute of Public Health) ▶ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিশেষ করে ভ্রাম্যমাণ আদালত ও র‍্যাব প্রতিবছরই শত শত মণ বিষাক্ত আম, মাছসহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী জব্দ ও ধ্বংস করে থাকে। এর পরও অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের অপতৎপরতা চালিয়েই যাচ্ছে। বিষাক্ত ফলমূল ও খাদ্য থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ফলমূল, টমেটো, কাঁচামরিচ, শসা ও বেগুন খাওয়া বা রান্নার কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগে পানিতে ডুবিয়ে রাখুন। দোকানে তৈরি ফাস্টফুড ও জুস ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। যদিও তা অত্যন্ত কঠিন। তবে কিছুটা আশার আলো হচ্ছে, ঢাকাসহ কয়েকটি শপিং সেন্টারে ফরমালিনমুক্ত ফলমূল, শাকসবজি, মাছ-মাংসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এটা কতটা কার্যকর হবে সেটিই প্রশ্ন। ব্যবসায়ীদের মধ্যেও ভালো মানুষ আছেন। এ মুহূর্তেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ রাখার জন্য খাদ্যসামগ্রীকে অবশ্যই বিষের অভিশাপমুক্ত রাখতে হবে। এ জন্য সবাইকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও নিজের বিবেকের কাছে সৎ হতে হবে। তবেই বিষাক্ত খাদ্যের মহাসমস্যা দূরীভূত হবে।

লেখক : অধ্যাপক, চেয়ারম্যান, মেডিসিন, সার্জারি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর
fhoque.hstu@gmail.com

ডা. মো. ফজলুল হক ▷

অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিন

ভোট ভোটারের নিজস্ব আমানত। এ আমানত যোগ্য প্রার্থী বা যোগ্য রাজনৈতিক দলের পক্ষে পড়বে—এটিই স্বাভাবিক। টেনশন করার কিছু নেই। ড. মাহাথির মোহাম্মদ একাধারে ২২ বছর (১৯৮১-২০০৩) মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে ওই দেশকে উন্নয়নের উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন বিধায় প্রায় ৯৩ বছর বয়সে ওই দেশের মানুষ আবার জোর করেই রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন করেছে তাঁকে। এ থেকে সবারই শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। দেশের স্বার্থে কাজ করলে ভোটারের পেছনে দৌড়াতে হবে না। মানবিক মূল্যবোধ থেকেই তারা যথাস্থানে ভোট দেবে। বর্তমানে ভোটাররাও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই ভাবছে। গত ১০ বছরে দেশ উন্নয়নের মানদণ্ডে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এটি অস্বীকার করার কারণ নেই। তবে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অস্বীকারও করে থাকে অনেকে। বিগত শেষ চার বছরের শাসনামলে হরতাল-অবরোধ প্রায় শতভাগ বিলুপ্ত হয়েছে। এটিও বড় সাফল্য। গত ২৫ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের মিছিলে পেট্রলবোমার আঘাতে সাত-আটজন গুরুতর আহত হয়। এ ধরনের ঘটনা কোনো বিবেকবান ব্যক্তি মেনে নিতে পারেন না। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি কারো কাম্য নয়।

প্রার্থীর জয় পেতে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, ওই প্রার্থীর বিগত বছর বা বিগত জীবনের কর্মকাণ্ড, আচার-ব্যবহার, নীতি-নৈতিকতা, সততা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, রাজনৈতিক দলের ভাবমূর্তি ও দেশের স্বাধীনতায় ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়। একসময় পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারাও মন্তব্য করেছিলেন—বাঙালি গরিব, অশিক্ষিত, পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, চলাচলের জন্য রাস্তা নেই, কেরোসিনের অভাবে সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়ত। বর্তমানে সেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা এবং সে দেশের বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের এই উন্নয়নকে মডেল হিসেবে দেখছেন। প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছেন, ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশের মতো উন্নয়ন করে দেখাতে হবে।

আমাদের দেশের নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী হেরে গেলেই বলা হয়, ভোটে কারচুপি হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে। ভোটারদের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ চাই ইত্যাদি। পোলিং এজেন্ট বের করে দেওয়া হয়েছে, জোর করে ব্যালট ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে অথবা জাল ভোট দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি, পুনর্নির্বাচন চাই। পরাজিত রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর এ ধরনের মন্তব্য চিরাচরিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, বিষয়টি দেশের মানুষের কাছে নয়, বিদেশিদের কাছেও অভিযোগ আকারে তুলে ধরা হচ্ছে। তবে লাখ লাখ ভোট প্রদান ও গ্রহণে কিছু অনিয়ম হতেই পারে, যেমনটি হয় পরীক্ষার হলে ছিটেফোঁটা নকল। নকল করা ছাত্ররা কোনো দিন ভালো ফল করতে পারে না, ফেলই করে বেশি। তেমনই নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়। আমি ১৯৮৩ সালে সরকারি চাকরিতে (ক্যাডার সার্ভিসে) যোগদানের পর থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছি। তা ছাড়া ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছি। সব নির্বাচনেই হেরে যাওয়া দলের একই মন্তব্য শুনেছি। প্রিসাইডিং অফিসার (তৎকালীন) হিসেবে আমার মন্তব্য হলো, মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যই বেশি। এদিকে কর্ণপাত করার কিছু নেই। তবে এর আগে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত যতগুলো নির্বাচন হয়েছিল, সেখানে যে মাত্রায় অনিয়ম ও ভোট কারচুপি হয়েছে, তা বর্তমানে অতটা দেখা যায় না। সে সময় রাস্তায়ও ব্যালট পেপার পাওয়া যেত। বর্তমান যুগটি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যুগ। ফেসবুক, ইউটিউবের যুগ, হাতে হাতে ক্যামেরাবিশিষ্ট মোবাইল ফোন। কোথায় কী ঘটছে, তা মুহূর্তের মধ্যে মিডিয়ায় চলে আসে, ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে সব কিছু ভাইরাল হয়ে। গোপনীয়তা রক্ষা দুরূহ ব্যাপার।

স্বাধীনতার পক্ষের চার হাজার ৫০০ জন আর্মি অফিসার ও সেনাকে গুলি করে হত্যার ঘটনা জিয়াউর রহমানের শাসনামলেই ঘটেছিল। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার ঘটনায় জিয়াউর রহমানের হাত ছিল, যার অনেক প্রমাণ আছে।

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় ২৪ জনের মৃত্যু, অবৈধ পথে ১০ ট্রাক অস্ত্র বিদেশ থেকে দেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল বিএনপি-জামায়াত শাসনামলে। তা ছাড়া মিল-কলকারখানায় অগ্নিসংযোগ, পেট্রলবোমার দ্বারা মানুষ হত্যা; বাস, ট্রাক, ট্রেনে অগ্নিসংযোগ; গাছ কেটে রাস্তা অবরোধ ইত্যাদি বিএনপি ও জামায়াতের হরতালেই ঘটেছিল। এ দেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়, আগুন সন্ত্রাস চায় না। পোড়া মানুষের কান্না শুনতে ও দেখতে চায় না। সেসব বিভীষিকাময় ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক, তা আর দেখতে চায় না। সবাই দেশের উন্নতি চায়, অগ্রগতি চায়। এ অগ্রগতি বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বারাই সম্ভব হচ্ছে, যার প্রমাণ অনেক; যেমন—সমুদ্র বিজয়, ছিটমহল বিনিময়, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (প্রক্রিয়াধীন), রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (প্রক্রিয়াধীন), মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন, নিজস্ব অর্থে বিশ্বব্যাংকের ঋণ ছাড়া বিশ্বের অন্যতম খরস্রোতা নদীতে পদ্মা সেতু তৈরির কাজ চলমান, ফ্লাইওভার, মেট্রো রেল (নির্মাণাধীন), সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন এবং বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে দেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ ঘরবাড়িতে বিদ্যুৎসংযোগ পৌঁছেছে। জঙ্গি দমন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ এবং আগুন সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি এ সরকারেরই অগ্রগতির নিদর্শনস্বরূপ। অর্থাৎ দেশের স্বার্থে কাজ করলে ভোটাররাই সে দলের প্রার্থী বা সরকারকে দেশের স্বার্থে কাজ করার আরো সুযোগ করে দেবে—এটিই স্বাভাবিক। এ কারণেই এ সরকারের পক্ষের প্রার্থীরাই বিপুল ভোটে এগিয়ে যাবেন, এ প্রত্যাশা প্রায় সবার মাঝে। আরো ১০টি বছর একাধারে কাজ করার সুযোগ পেলে উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বিশ্বের অনেক দেশকে ছাড়িয়ে যাবে বাংলাদেশ।

লেখক : ভিসি ও চেয়ারম্যান
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

আমাদের দেশের নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী হেরে গেলেই বলা হয়, ভোটে কারচুপি হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে। ভোটারদের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ চাই ইত্যাদি। পোলিং এজেন্ট বের করে দেওয়া হয়েছে, জোর করে ব্যালট ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে অথবা জাল ভোট দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি, পুনর্নির্বাচন চাই। পরাজিত রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর এ ধরনের মন্তব্য চিরাচরিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, বিষয়টি দেশের মানুষের কাছে নয়, বিদেশিদের কাছেও অভিযোগ আকারে তুলে ধরা হচ্ছে।

মেইল-ইমেইল

চিঠি পাঠান কালের কণ্ঠ'র ঠিকানায়
ই-মেইল : editorial@kalerkantho.com

সর্প দংশন ও আমাদের করণীয়

প্রফেসর ডাঃ মোঃ ফজলুল হক

প্রাণিবিদদের মতে বিশ্বে প্রায় ২৫০০ প্রজাতির সাপ রয়েছে। তবে সব সাপই বিষাক্ত নয়। মাত্র ২৫০ প্রজাতির বিষধর সাপ রয়েছে। এর মধ্যে ভয়ঙ্কর সাপের প্রজাতি মাত্র দশটি। যাদের ছোবলে মৃত্যু অবধারিত। কয়েক প্রজাতির সাপ আস্ত প্রাণি গিলে খায়, কামড়ে ক্ষতস্থানে পঁচন ধরে এবং বিষের মাধ্যমে শরীর অবশ ও রক্ত জমাট বেধে মৃত্যু ঘটায়। বাংলাদেশে মোট ৮২ প্রজাতির সাপের মধ্যে ২৮ প্রজাতি কমবেশী বিষাক্ত। তবে ৪ প্রজাতির সাপের কামড়ে প্রাণির মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম। এগুলো হল, কোবরা (গোখরা ও গোমা, যারা ফনা তুলতে পারে); রাসেল ভাইপার, কালকেউটে এবং সবুজ সাপ। এ চারটির মধ্যে কালকেউটে সবচেয়ে বেশী বিষাক্ত। বিষাক্ত সাপের কামড়ে সাধারনত প্রাণির মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনাই বেশী যদি যথাযথ চিকিৎসার সুযোগ না থাকে। অবিষধর সাপের ক্ষেত্রে মৃত্যু হবে না, তবে কামড়ানোর কারনে ক্ষতস্থান তৈরী, ভয়ভীতি বা সাময়িক মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। সর্প দংশণ সাধারনত সারা বছরেই হতে পারে। তবে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালেই বেশী ঘটে থাকে। শীতকালে কয়েক প্রজাতির সাপ প্রায় ৩-৪ মাস মাটির গর্তে বাস করে । এ অবস্থায় বাস করাকে হাইবারনেশন (শীত নিদ্রা) বলা হয়। এ সময়ে খাওয়াও বন্ধ থাকে। এরা জীবন্ত ব্যাঙ, ইদুর, মাছ বা অন্যান্য প্রাণি এমনকি হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল ও হরিন ইত্যাদি আস্ত গিলে ফেলতে পারে (অজগর)। সাপ ছায়াযুক্ত, অন্ধকার ও নাতিশীতস্ন পরিবেশে, ঝোঁপঝাড়, গাছপালা, ধানক্ষেত, ইঁদুরের গর্তে, পরিত্যক্ত বিল্ডিং এর ফাঁকে, পাটকাঠি ও খড়ের স্তুপ, ইটের স্তুপসহ বিভিন্ন স্থানে বাস করে। স্বাভাবিকভাবে পুকুর, নদী, সমুদ্র ও পাহাড়ে বাস করতে দেখা যায়। গরমের সময় সাপ গর্ত থেকে বের হয়ে খোলা জায়গায় চলে আসে। গরমের কারণে অনেক সময় সিঁড়ি বেয়ে ২-৩ তলায় উঠে আসতেও দেখা যায়। এমনকি গোসল খানার ষ্টিল জাতীয় হাতল বা স্টিলের হ্যাংগারের সাথে ঠান্ডা পাওয়া ও তৃষ্ণা মেটানোর জন্যই পেঁচিয়ে থাকতে দেখা যায়। তবে সাপের একটি নীতিও আছে। সাপ সাধারণতঃ বিনা কারণে দংশণ করে না। আঘাত, ভয়ভীতি, উত্তেজিত করলেই আত্মরক্ষার্থে কামড় দেয়। তবে অজগর সাপ খাদ্য হিসেবে যে কোন প্রাণিকেই খেয়ে ফেলতে পারে। এধরণের দু'টি ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি জেলায় যথাক্রমে একটি ছাগল ও একজন শ্রমিককে আস্ত গিলে ফেলে অজগর দুটি। গত কয়েক দিন পূর্বে এধরণের একটি ঘটনাও ঘটেছে চট্টগ্রামে। এতে বোঝা যায় বাংলাদেশের পাহাড় ও টিলা গুলোতে অনেক অজগর সাপ রয়েছে। বিষধর সাপ সাধারনত স্থলে বাস করে। রাতের বেলায় খাবার সন্ধানে বের হয়ে পড়ে ফলে সর্প দংশনের ঘটনা রাত্রেই বেশী ঘটে। গ্রামগঞ্জে হাঁস-মুরগীর বাচ্চার সন্ধানে গোখরা সাপগুলো গাছ বা খুঁটি বেয়ে মুরগীর খাঁচায় ও হামলা চালায়।

বিশ্বে ভয়াঙ্কর ১০ ধরনের সাপ, যেমন; (১) **ইনল্যান্ড তাইপেনঃ** এ সাপটি সবচেয়ে বিষধর ও মারাত্মক। লম্বা প্রায় ৮ ফুট, অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়। এ জাতীয় সাপ এক ছোবলে যে পরিমান বিষ বের করে তা দ্বারা প্রায় ১০০ জন মানুষের অথবা একলক্ষ ইদুরের মৃত্যু জন্যই যথেষ্ট। এর একটি ছোবল ৫০টি কোবরার ছোবলের সমান। এ বিষে রয়েছে Neurotoxin যা শরীর অবশ ও শক্ত হয়ে যাওয়া, রক্ত জমাটবাধা এবং শ্বাস কষ্টে রোগীর মৃত্যু ঘটে। (২) **ব্ল্যাক মাম্বা সাপঃ** বিষের দিক থেকে এটি পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানে। এটি প্রধানতঃ আফ্রিকার জঙ্গলে বাস করে। ভয়ংকর ও উত্তেজিত স্বভাবের। Neurotoxin বিষ যা শরীরে প্রবেশ করলেই মাত্র কয়েক মিনিটে মৃত্যুবরণ করে। ভয়ে

নিজেকে রক্ষার জন্য অন্য প্রাণির উপর আক্রমন চালায়। এ সাপটি ঘন্টায় প্রায় ২০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারে। (৩) **পাইথন সাপঃ** ভয়ংকর সাপ যে নিজ দেহের সমপরিমান ওজনের একটি মানুষ বা যেকোন প্রাণি আস্ত গিলে ফেলতে সক্ষম এবং একদিন পর গলিত মৃত্যুদেহটি বের করে ফেলে। এটি প্রায় ২০ ফুট লম্বা হতে পারে। একে সর্প জগতে দৈত্য বলা হয়। এরা শিকারীকে পেচিয়ে মাংস ও হাড়কে দূর্বল করে গিলতে থাকে। এদের বিষ কম থাকলেও এর শরীরের সমপরিমান আয়তনের প্রাণিকে গিলে ফেলতে সক্ষম। (৪) **কাল কেউটে সাপঃ** এটি ফনা বিশিষ্ট সাপ। আমাদের দেশের গোখরা সাপের মত ১৫ হতে ১৮ ফুট লম্বা ও ৩-৪ ফুট উচু হয়ে হা করে মানুষকে ধাওয়া করে। এরা শাই শাই শব্দ করে মানুষকে ভয় দেখায়। পানিতে দ্রুত সাঁতার কাটতে সক্ষম। প্রতি ছোবলে ১০-১২ সিসি বিষ ছুড়তে সক্ষম যার দ্বারা ২০ জন মানুষকে মাত্র ৩০ মিনিটে মৃত্যু ঘটাতে পারে। (৫) **ভাইপার সাপঃ** এদের কামড়ে মাংসে পঁচন ধরে। এশিয়া মহাদেশে এ সাপ বাস করে। বাংলাদেশেও আছে। নারিকেল গাছের পাতার ভাজে ভাজে এরা বাস করে। এ জাতের সাপের কামড়েই সবচেয়ে বেশী মানুষ মারা যায়। পাঁচ ফুট লম্বা হয়ে থাকে। বেশী মানুষের মৃত্যু এ সাপদ্বারাই হয়ে থাকে বলে প্রাণিবিদের ধারনা। দেখতে হলুদ রং এর। (৬) **বেলচার সি স্নেকঃ** এ প্রজাতির সাপ কয়েক মিলিগ্রাম বিষ দ্বারা প্রায় এক হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম। সাগরের গভীরে এদের বাস। মাছ ধরা জেলেরাই বেশী কামড়ের শিকার হন, কারন জালের সাথে জড়িয়ে উঠে আসে এরা। এজাতের সাপ উত্তর পূর্ব এশিয়ার সাগরেও বাস করে। (৭) **স্পিটিং কোবরাঃ** দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া যায় যার দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় ফুটের বেশী। এরা ফণা ধরে বিধায় দেখতে অন্যদের তুলনায় আকর্ষণীয়। এরা কামড় দেওয়ার চেয়ে বিষ ছুড়তে বেশী পছন্দ করে। আত্মরক্ষার জন্যই বিষ ছোড়ে। চক্ষে লাগলে অন্ধ হওয়ার সম্ভবনাই বেশী। কামড় দিলে মৃত্যু অবধারিত। (৮) **ব্লাক্রেইট সাপঃ** এরা অত্যন্ত হিংস্র, অন্যান্ন প্রজাতির পাশাপাশি নিজ প্রজাতির সাপ খেতেও দ্বিধাবোধ করে না। এর একটি কামড় কোবরার ১৬টি কামড়ের সমান বিষাক্ত। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া পাওয়া যায়। এর বিষ স্নায়ুতন্ত্র ও পেশীকে দূর্বল করে প্রাণির মৃত্যু ঘটায়। (৯) **ইষ্টার্ন ব্রাউন স্নেকঃ** এটি অত্যন্ত বিষধর সাপ, ফণা তুলে। এক দংশনে একজন মানুষের মৃত্যুর জন্যই যথেষ্ট। এরা ফণা ধরে স্থির থাকতে পারে। (১০) **ডেথ এডার সাপঃ** এটি ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ যে সাপ খায় এবং শিকার করতে পছন্দ করে। প্রতি ছোবলে ৪০-১০০ গ্রাম বিষ বের হয়। স্নায়ুতন্ত্র অকেজো করে শ্বাস কষ্টে মাত্র ছয় ঘন্টার মধ্যে প্রাণির মৃত্যু ঘটে। সাপেরও একটি নীতি আছে। পাইথন সাপ ছাড়া সবধরনের সাপই সাধারনত বিনা কারণে বা আঘাতে দংশন করে না।

আমাদের দেশে বনজঙ্গল কম, নিম্ন অঞ্চল এবং বন্যার কারনে উল্লেখিত বিষধর সাপের সংখ্যা বিশ্বের অন্যান্ন দেশের তুলনায় কম। সুন্দর বন ও পার্বত্য অঞ্চলে এর উপদ্রুপ তুলনামুলক বেশী। বর্ষা কালে নিম্নাঞ্চলের বাড়ী ঘরে আত্মরক্ষার্থে সাপ আশ্রয় নেয়। বিশেষ করে খড়ের স্তুপ, পাটকাঠী ও কাচা পাটের স্তুপ, গাছ ও লতা পাতার ভাজে, ইট, বাঁশ, কাঠ, ইদুরের গর্তে এবং কচুরি পানার মধ্যে বাস করে। রাতের অন্ধকারে খাদ্যের সন্ধানে বাহির হয়। বিষধর সাপ বাড়ীর আঙ্গিনা ও ঘরের মেঝে ঘোরা ফেরা করে থাকে। সুতরাং রাত্রে টর্সলাইট ও লাঠি নিয়ে বের হতে হবে। গোখরা সাপের পিছনে যেতে নেই কারণ পিছন দিকে বেকে এসে ছোবল দেওয়া সহজ। কমপক্ষে ১০ ফুট দুরে থাকুন। দংশন পরবর্তী দ্রুত অভিজ্ঞ ডাক্তারের সরনাপন্ন হউন। কবিরাজ ও ওঝার ঝাড় ফুকের সাহায্য নিবেন না। কবিরাজ ও ওঝার ঝাড় ফুকের অর্থই হচ্ছে রোগীকে দ্রুত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। বর্ষা বা গ্রীষ্ম কালে ঘরের মেঝেতে শয়ন করা ঠিক নয়। খড়ের স্তুপে বা ঝোপ জঙ্গলে প্রবেশের সময় লাঠি হাতে ঠক ঠক শব্দ করে অগ্রসর হতে

হবে সাপ দেখলে নিরাপদ দুরুত্বে থাকুন। এরাও ইদুঁর খেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। তবে ব্যাঙ খেয়ে পরিবেশ নষ্ট করে, মশার উপদ্রপ বাড়ায়। বিভিন্ন বিষাক্ত সাপের কামড়ে বিভিন্ন উপসর্গ বা লক্ষন বিভিন্ন প্রকারের যেমন; *কামড়ানোর স্থান থেকে রক্তক্ষরন, প্রদাহ হওয়া (ফুলে যাওয়া), পচন ধরা, চোখের পাতা পড়ে যাওয়া, একটি বস্তুকে দু'টি বস্তুর ন্যায় দেখা, ঢোক গিলতে অসুবিধা হওয়া, রোগী জিহ্বা বের করা বা বড় করে মুখ হা করা সম্ভব না হওয়া, শ্বাস কষ্ট, প্রস্রাব কালো হওয়া, কিডনী বিকল হয়ে প্রস্রাব বন্ধ বা কমে যাওয়া এবং সর্বোপরি রোগী অজ্ঞান হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়া ইত্যাদি।

সর্প দংশন থেকে রেহাই পাওয়ার নিমিত্তেঃ

* ঝোপ জঙ্গল ও রাস্তাঘাটে চলার সময় যথাক্রমে লাঠি ও টর্সলাইট ব্যবহার করা, বাড়ীর আঙ্গিনা ও আশপাশের ঝোপ ঝাড় কেটে নিয়মিত পরিস্কার রাখা, ইদুঁর নিধন ও ইদুঁরের গর্ত বন্ধ করা, খড়ের স্তুপ থেকে খড় সংগ্রহের পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন করা, বাড়ীর পাশে ইটের স্তুপ বেশী দিন জমা না রাখা, ঘরে প্রবেশের পূর্বে আলো জ্বালিয়ে প্রবেশ করা, রাত্রে চলাচলের সময় টর্সলাইট ও লাঠি ব্যবহার করা, বিছানায় শয়নের পূর্বে ভাল করে ঝেড়ে নেওয়া এবং মশারির চতুরদিক গুজে রাখা ইত্যাদি।

বিষাক্ত সাপ কামড়ানোর আধুনিক চিকিৎসাঃ

* দংশনকৃত সাপ ধরা পড়লে বা মেরে ফেল্লে তার ভিডিও চিত্র অথবা আস্ত মৃত সাপটি নিয়ে যাবেন ক্লিনিক বা হাসপাতালের চিকিৎসকের নিকট। এর ফলে সঠিক ডায়াগনোসিস ও অপরবর্তী চিকিৎসা কার্যক্রম সহজ ও দ্রুততর হবে। কামড়ের স্থানটির উপরের অংশ বেধে দিতে হবে। ক্ষতস্থানটি পটাশ পাণি দ্বারা ধুয়ে দিতে হবে। কামড়ানো হাত-পা বেশী নড়া চড়া করা যাবেনা। ক্ষতস্থান কাটা বা পোড়ানো যাবে না। রক্ত চলাচল সম্পূর্নরুপে বন্ধ হতে পারে এমনভাবে টর্নীকয়েড ব্যবহার করা যাবেনা, কারণ এর ফলে গ্যাংগ্রিন হয়ে অঙ্গহানিও হতে পারে।

* কামড়ানোর সাথে সাথে নিকটস্থ্য হাসপাতাল বা ক্লিনিকে যোগাযোগ করা এবং ফকির বা কবিরাজের ঝাড় ফুক থেকে বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন কারণ এরা রোগীকে চিকিৎসার নামে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেয়। উল্লেখ্য বিষ নষ্ট করার জন্য পলিভ্যালেন্ট এন্টিস্নেক ভেনোম ইনজেকশন এর পাশাপাশি শ্বাস কষ্ট লাঘবে কৃত্রিম অক্সিজেনের দ্বারা চিকিৎসার মাধ্যমে রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করার সম্ভবনা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে সর্পদংশন হতে নিজেকে রক্ষায় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা।

ডা. মো. ফজলুল হক ▷

বিগত দিন থেকে শিক্ষা নিন

২১ আগস্ট ২০০৪ সালে গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগের ২৪ জন নেতাকর্মীর মৃত্যু দেশের মানুষ দেখেছে। অবৈধ পথে দশ ট্রাক অস্ত্র বিদেশ থেকে দেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল বিএনপি-জামায়াত শাসনামলে। তা ছাড়া মিল-কারখানায় অগ্নিসংযোগ, পেট্রলবোমার দ্বারা মানুষ হত্যা, বাস, ট্রাক, ট্রেনে অগ্নিসংযোগ, গাছ কেটে রাস্তা অবরোধ ইত্যাদি বিএনপি ও জামায়াতের হরতালেই ঘটেছিল। এ দেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়

আমাদের দেশের নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী হেরে গেলেই বলা হয় ভোটে কারচুপি হয়েছে, ভোটারদের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, পোলিং এজেন্ট বের করে দেওয়া হয়েছে, জাল ভোট দিয়েছে, অর্থাৎ নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি, পুনর্নির্বাচন চাই। লাখ লাখ ভোট প্রদান ও গ্রহণে কিছু অনিয়ম হতেই পারে, যেমনটি হয় পরীক্ষার হলে ছিটেফোঁটা নকল। নকল করা ছাত্ররা কোনো দিন ভালো রেজাল্ট করতে পারে না, ফেলই করে বেশি। তেমনই নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তাই হয়। আমি ১৯৮৩ সালে সরকারি চাকরিতে (ক্যাডার সার্ভিসে) যোগদানের পর থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছি, তা ছাড়া ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছি। সব নির্বাচনেই হেরে যাওয়া পরাজিত দলের একই মন্তব্য শুনেছি। প্রিসাইডিং অফিসার (তৎকালীন) হিসেবে মন্তব্য হলো, মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যই বেশি। তবে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত যতগুলো নির্বাচন হয়েছিল, সেখানে ছোটখাটো ভোটচুরির যে ঘটনা ঘটেছে, তা এখন হয় না বললেই চলে। সে সময় রাস্তায় ব্যালট পেপার পাওয়া যেত। এর কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায় ২০১৩ সালের ১৫ জুন অনুষ্ঠিত চার সিটি করপোরেশন নির্বাচনে। তাতে বিএনপির প্রার্থীরা বিজয়ী হলেও সরকারদলীয় (আওয়ামী লীগ) পরাজিত মেয়র প্রার্থীরা পরাজয়কে হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলেন। বিএনপির বিজয়ী মেয়র প্রার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। এটাই হলো গণতন্ত্র। প্রার্থীর জয় পেতে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে ওই প্রার্থীর বিগত সময়ের কর্মকাণ্ড, আচার-ব্যবহার, নীতি-নৈতিকতা, সততা, রাজনৈতিক দলের ভাবমূর্তি ও দেশের স্বাধীনতায় ভূমিকা ইত্যাদি। গাজীপুরে গত ২৬ জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী বিপুল ভোটে বিজয় লাভ করেন। এ বিজয় প্রার্থীর পাশাপাশি তাঁর রাজনীতির বিজয়। আওয়ামী লীগ ও বর্তমান সরকারের জয়। এ বিজয় এ দেশের স্বাধীনতার সপক্ষের জনগণের বিজয়, উন্নয়নের প্রতি মানুষের সমর্থনের বিজয়। এ জয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের জয়।

নির্বাচন বিশ্লেষকদের আগাম মন্তব্য ছিল গাজীপুর সিটি নির্বাচন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির জন্য এসিড টেস্ট স্বরূপ। দেশ ও জনগণের জন্য কাজ করলে তার মূল্য দিতে জানে এ দেশের মানুষ, তারই প্রমাণ খুলনা ও গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ফলাফল। উল্লেখ্য, নির্বাচনের দুই দিন আগে গাজীপুরে থাকা কয়েক বন্ধুর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, নির্বাচনের খবর কী? তাঁরা অকপটে জানালেন, নৌকা প্রতীকের দিকেই হাওয়া বইছে। নির্বাচনের পর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের একজন হাফেজ সাহেবের সঙ্গে কথা হয়। তাঁর বাড়ি ওই এলাকায় হলেও নির্বাচনী এলাকার মধ্যে নয়। তাঁর মন্তব্য হলো, লোকমুখে শুনেছেন, এবারের নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু হয়েছে, যা এর আগে কখনো গাজীপুরে হয়নি। সাধারণভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় বর্তমান যুগটি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যুগ। কোথায় কী ঘটছে তা মুহূর্তের মধ্যে মিডিয়ায় চলে আসে, ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে সব কিছু। আজকাল কি খুব বেশি অনিয়ম করার সুযোগ আছে।

২১ আগস্ট ২০০৪ সালে গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগের ২৪ জন নেতাকর্মীর মৃত্যু দেশের মানুষ দেখেছে। অবৈধ পথে দশ ট্রাক অস্ত্র বিদেশ থেকে দেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল বিএনপি-জামায়াত শাসনামলে। তা ছাড়া মিল-কারখানায় অগ্নিসংযোগ, পেট্রলবোমার দ্বারা মানুষ হত্যা, বাস, ট্রাক, ট্রেনে অগ্নিসংযোগ, গাছ কেটে রাস্তা অবরোধ ইত্যাদি বিএনপি ও জামায়াতের হরতালেই ঘটেছিল। এ দেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়। আগুন-সন্ত্রাস চায় না। পোড়া মানুষের কান্না শুনতে ও দেখতে চায় না। সেসব বিভীষিকাময় ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক তা আর দেখতে চায় না। দেশের উন্নতি চায়, অগ্রগতি চায়। এ অগ্রগতি বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বারাই সম্ভব হচ্ছে, যার প্রমাণ অনেক। যেমন—সমুদ্র বিজয় (এক লাখ ৩০ হাজার বর্গকিলোমিটার), ছিটমহল বিনিময়, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন (প্রক্রিয়াধীন), মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্র, ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন, বিশ্বব্যাংকের ঋণ ছাড়া বিশ্বের অন্যতম খরস্রোতা নদীতে পদ্মা সেতু তৈরি (কাজ চলমান), ফ্লাইওভার, মেট্রো রেল (নির্মাণাধীন), সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ও বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে ৫৭তম সদস্যসহ বিভিন্ন উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গি দমন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য জিরো টলারেন্স নীতি (চলমান) ইত্যাদি এ সরকারেরই অগ্রগতির একটি অংশ। অর্থাৎ দেশের স্বার্থে কাজ করলে ভোটাররাই সে দল বা প্রার্থীকে আরো দেশের স্বার্থে কাজ করার সুযোগ করে দেবে—এটিই স্বাভাবিক। এ কারণেই এ সরকারের পক্ষের প্রার্থীরাই বিপুল ভোটে এগিয়ে যাচ্ছে। ভোট ভোটারের নিজস্ব আমানত। এ আমানত যোগ্য প্রার্থী বা যোগ্য রাজনৈতিক দলের পক্ষে পড়বে। এটাই স্বাভাবিক। টেনশন করার কিছু নেই। ডা. মাহাথির মোহাম্মদ একাধারে ২২ বছর (১৯৮১-২০০৩) মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে ওই দেশকে উন্নয়নের উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন বিধায় প্রায় ৯৩ বছর বয়সে ওই দেশের মানুষ আবার জোর করেই রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন করেছেন তাঁকে। এ থেকে সবারই শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। দেশের স্বার্থে কাজ করলে ভোটারের পেছনে দৌড়াতে হবে না ভোটের জন্য।

লেখক : চেয়ারম্যান ও ডিন, মেডিসিন, সার্জারি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিম্যাল সায়েন্স অনুষদ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

ডা. মো. ফজলুল হক ▷

অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিন

ভোট ভোটারের নিজস্ব আমানত। এ আমানত যোগ্য প্রার্থী বা যোগ্য রাজনৈতিক দলের পক্ষে পড়বে—এটিই স্বাভাবিক। টেনশন করার কিছু নেই। ড. মাহাথির মোহাম্মদ একাধারে ২২ বছর (১৯৮১-২০০৩) মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে ওই দেশকে উন্নয়নের উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন বিধায় প্রায় ৯৩ বছর বয়সে ওই দেশের মানুষ আবার জোর করেই রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন করেছে তাঁকে। এ থেকে সবারই শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। দেশের স্বার্থে কাজ করলে ভোটারের পেছনে দৌড়াতে হবে না। মানবিক মূল্যবোধ থেকেই তারা যথাস্থানে ভোট দেবে। বর্তমানে ভোটাররাও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই ভাবছে। গত ১০ বছরে দেশ উন্নয়নের মানদণ্ডে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এটি অস্বীকার করার কারণ নেই। তবে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অস্বীকারও করে থাকে অনেকে। বিগত শেষ চার বছরের শাসনামলে হরতাল-অবরোধ প্রায় শতভাগ বিলুপ্ত হয়েছে। এটিও বড় সাফল্য। গত ২৫ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের মিছিলে পেট্রলবোমার আঘাতে সাত-আটজন গুরুতর আহত হয়। এ ধরনের ঘটনা কোনো বিবেকবান ব্যক্তি মেনে নিতে পারেন না। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি কারো কাম্য নয়।

প্রার্থীর জয় পেতে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, ওই প্রার্থীর বিগত বছর বা বিগত জীবনের কর্মকাণ্ড, আচার-ব্যবহার, নীতি-নৈতিকতা, সততা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, রাজনৈতিক দলের ভাবমূর্তি ও দেশের স্বাধীনতায় ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়। একসময় পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারাও মন্তব্য করেছিলেন—বাঙালি গরিব, অশিক্ষিত, পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, চলাচলের জন্য রাস্তা নেই, কেরোসিনের অভাবে সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়ত। বর্তমানে সেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা এবং সে দেশের বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের এই উন্নয়নকে মডেল হিসেবে দেখছেন। প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছেন, ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশের মতো উন্নয়ন করে দেখাতে হবে।

আমাদের দেশের নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী হেরে গেলেই বলা হয়, ভোটে কারচুপি হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে। ভোটারদের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ চাই ইত্যাদি। পোলিং এজেন্ট বের করে দেওয়া হয়েছে, জোর করে ব্যালট ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে অথবা জাল ভোট দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি, পুনর্নির্বাচন চাই। পরাজিত রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর এ ধরনের মন্তব্য চিরাচরিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, বিষয়টি দেশের মানুষের কাছে নয়, বিদেশিদের কাছেও অভিযোগ আকারে তুলে ধরা হচ্ছে। তবে লাখ লাখ ভোট প্রদান ও গ্রহণে কিছু অনিয়ম হতেই পারে, যেমনটি হয় পরীক্ষার হলে ছিটেফোঁটা নকল। নকল করা ছাত্ররা কোনো দিন ভালো ফল করতে পারে না, ফেলই করে বেশি। তেমনই নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়। আমি ১৯৮৩ সালে সরকারি চাকরিতে (ক্যাডার সার্ভিসে) যোগদানের পর থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছি। তা ছাড়া ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছি। সব নির্বাচনেই হেরে যাওয়া দলের একই মন্তব্য শুনেছি। প্রিসাইডিং অফিসার (তৎকালীন) হিসেবে আমার মন্তব্য হলো, মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যই বেশি। এদিকে কর্ণপাত করার কিছু নেই। তবে এর আগে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত যতগুলো নির্বাচন হয়েছিল, সেখানে যে মাত্রায় অনিয়ম ও ভোট কারচুপি হয়েছে, তা বর্তমানে অতটা দেখা যায় না। সে সময় রাস্তায়ও ব্যালট পেপার পাওয়া যেত। বর্তমান যুগটি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যুগ। ফেসবুক, ইউটিউবের যুগ, হাতে হাতে ক্যামেরাবিশিষ্ট মোবাইল ফোন। কোথায় কী ঘটছে, তা মুহূর্তের মধ্যে মিডিয়ায় চলে আসে, ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে সব কিছু ভাইরাল হয়ে। গোপনীয়তা রক্ষা দুরূহ ব্যাপার।

স্বাধীনতার পক্ষের চার হাজার ৫০০ জন আর্মি অফিসার ও সেনাকে গুলি করে হত্যার ঘটনা জিয়াউর রহমানের শাসনামলেই ঘটেছিল। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার ঘটনায় জিয়াউর রহমানের হাত ছিল, যার অনেক প্রমাণ আছে।

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় ২৪ জনের মৃত্যু, অবৈধ পথে ১০ ট্রাক অস্ত্র বিদেশ থেকে দেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল বিএনপি-জামায়াত শাসনামলে। তা ছাড়া মিল-কলকারখানায় অগ্নিসংযোগ, পেট্রলবোমার দ্বারা মানুষ হত্যা; বাস, ট্রাক, ট্রেনে অগ্নিসংযোগ; গাছ কেটে রাস্তা অবরোধ ইত্যাদি বিএনপি ও জামায়াতের হরতালেই ঘটেছিল। এ দেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়, আগুন সন্ত্রাস চায় না। পোড়া মানুষের কান্না শুনতে ও দেখতে চায় না। সেসব বিভীষিকাময় ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক, তা আর দেখতে চায় না। সবাই দেশের উন্নতি চায়, অগ্রগতি চায়। এ অগ্রগতি বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বারাই সম্ভব হচ্ছে, যার প্রমাণ অনেক; যেমন—সমুদ্র বিজয়, ছিটমহল বিনিময়, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (প্রক্রিয়াধীন), রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (প্রক্রিয়াধীন), মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন, নিজস্ব অর্থে বিশ্বব্যাংকের ঋণ ছাড়া বিশ্বের অন্যতম খরস্রোতা নদীতে পদ্মা সেতু তৈরির কাজ চলমান, ফ্লাইওভার, মেট্রো রেল (নির্মাণাধীন), সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন এবং বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে দেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ ঘরবাড়িতে বিদ্যুৎসংযোগ পৌঁছেছে। জঙ্গি দমন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ এবং আগুন সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি এ সরকারেরই অগ্রগতির নিদর্শনস্বরূপ। অর্থাৎ দেশের স্বার্থে কাজ করলে ভোটাররাই সে দলের প্রার্থী বা সরকারকে দেশের স্বার্থে কাজ করার আরো সুযোগ করে দেবে—এটিই স্বাভাবিক। এ কারণেই এ সরকারের পক্ষের প্রার্থীরাই বিপুল ভোটে এগিয়ে যাবেন, এ প্রত্যাশা প্রায় সবার মাঝে। আরো ১০টি বছর একাধারে কাজ করার সুযোগ পেলে উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বিশ্বের অনেক দেশকে ছাড়িয়ে যাবে বাংলাদেশ।

লেখক : ভিসি ও চেয়ারম্যান
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

> আমাদের দেশের নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী হেরে গেলেই বলা হয়, ভোটে কারচুপি হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে। ভোটারদের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ চাই ইত্যাদি। পোলিং এজেন্ট বের করে দেওয়া হয়েছে, জোর করে ব্যালট ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে অথবা জাল ভোট দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি, পুনর্নির্বাচন চাই। পরাজিত রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর এ ধরনের মন্তব্য চিরাচরিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, বিষয়টি দেশের মানুষের কাছে নয়, বিদেশিদের কাছেও অভিযোগ আকারে তুলে ধরা হচ্ছে।

মেইল-ইমেইল
চিঠি পাঠান কালের কণ্ঠ'র ঠিকানায়
ই-মেইল : editorial@kalerkantho.com

উপ-সম্পাদকীয় সাপ্তাহিক গণবন্ধু ৭
রেজি নং ডিএ ১০৩১ ❑ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ১৩ ❑ ০৬ অক্টোবর ২০১৩ ইং ❑ ঢাকা, রবিবার ২১ আশ্বিন ১৪২০, ২৯ জিলহ

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও বিশ্বে দেশের ভাব মুর্ত্তি

প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ ফজলুল হক

বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যে ১৮টি দেশ এগিয়ে আছে, বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। ক্ষুধা ও দারিদ্র বিমোচনে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে ফলে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ২০০৬ সালে ৫.৭ শতাংশ হতে ২০১৩ তে ৬.৭ শতাংশে। বিশ্ব ব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বিশ্বের সর্বোচ্চ প্রতিবেদনে অর্জিত প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ৫ম স্থানে রয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব বানকি মুন বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য মডেল দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নবেল বিজয়ী অমর্ত সেনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নের রোডম্যাপে বাংলাদেশের অবস্থানকে অত্যন্ত স্বর্ণোজ্জ্বল বলে অবিহিত করেন। অমর্তসেন আরও বলেন নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে এগিয়ে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এক জনসভায় মন্তব্য করেন উন্নয়নের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম পর্যায়ে। তাছাড়াও কতিপয় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশকে গনতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখ হচ্ছে। বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে আমেরিকায় নির্বাচনের পূর্বেই সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের ফিরিস্তি জনসম্মুখে উপস্থাপন করে জনসমর্থন যাচাই করা হয়। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বাগ-বিতন্ডা হয় জনসমাবেশে একই প-টফর্মে। সে সকল দেশে উন্নয়নমূলক কর্মের সফলতার-মানদন্ডে বিচার বিশ্লেষণ করেই ঐ সরকারকে পুণরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে থাকেন। কারণ হিসেবে বলা যায় দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নের পরিসমাপ্ত ঘটাতে ৫ বছর সময় যথেষ্ট নয়। সে মানদন্ডে বিচার বিশ্লেষণ করলে বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিতেই হবে। নির্বাচনের পূর্বেই জন সমর্থন যাচাই-বাছাই করা হয় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে। আগামী নির্বাচনে কাকে ভোট দিবেন তা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে উঠে দেশের উন্নয়নের হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে। বহির্বিশ্বে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদিসহ সকল সেক্টরের উন্নয়নকে বেশ গুরুত্বের সাথে দেখা হয়।

দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘের বিশেষ পুরস্কার "সাউথ সাউথ" দ্বারা সম্মানিত করেন। প্রধান মন্ত্রী বলেন এটি এদেশের জনগণেরই অর্জন। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যে ১৮টি দেশ এগিয়ে আছে, বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে ফলে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ২০০৬ সালে ৫.৭ শতাংশ হতে ২০১৩ তে ৬.৭ শতাংশে। বিশ্ব ব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বিশ্বের সর্বোচ্চ প্রতিবেদনে অর্জিত প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ৫ম স্থানে রয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব বানকি মুন বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য মডেল দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নবেল বিজয়ী অমর্ত সেনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নের রোডম্যাপে বাংলাদেশের অবস্থানকে অত্যন্ত স্বর্ণোজ্জ্বল বলে অবিহিত করেন। অমর্তসেন আরও বলেন নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে এগিয়ে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এক জনসভায় মন্তব্য করেন উন্নয়নের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম পর্যায়ে। তাছাড়াও কতিপয় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশকে গনতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখ হচ্ছে। বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে আমেরিকায় নির্বাচনের পূর্বেই সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের ফিরিস্তি জনসম্মুখে উপস্থাপন করে জনসমর্থন যাচাই করা হয়। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বাগ-বিতন্ডা হয় জনসমাবেশে একই প-টফর্মে। সে সকল দেশে উন্নয়নমূলক কর্মের সফলতার মানদন্ডে বিচার বিশ্লেষণ করেই ঐ সরকারকে পুণরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে থাকেন। কারণ হিসেবে বলা যায় দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নের পরিসমাপ্ত ঘটাতে ৫ বছর সময় যথেষ্ট নয়। সে মানদন্ডে বিচার বিশ্লেষণ করলে বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিতেই হবে। নির্বাচনের পূর্বেই জন সমর্থন যাচাই-বাছাই করা হয় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে। আগামী নির্বাচনে কাকে ভোট দিবেন তা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে উঠে দেশের উন্নয়নের হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে। বহির্বিশ্বে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদিসহ সকল সেক্টরের উন্নয়নকে বেশ গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। তাই আমাদের দেশের নির্বাচনের ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সকল সরকারকেই তার শাসনামলের ০৫ বছরের কর্মকান্ডের হিসাব সঠিক ভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন, যাতে বিগত সময়ের চেয়ে দেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামনের দিকে যাচ্ছে, না পিছনে, না একই স্থানে অবস্থান করছে। যে কোন দৃষ্টিকোন থেকেই দেখা হোক না কেন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও বিভিন্ন সেক্টরে বর্তমান সরকার যে উন্নয়নের ছাপ রেখেছে তার যথেষ্ট তথ্য রয়েছে। তবে ঘন ঘন অনাকাঙ্খিত হরতাল একটি রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নৈতিবাচক প্রভাব ফেলে সে ব্যাপারেও মন্তব্য করেছেন অনেকে। তবে ৪২ বছরে বয়সের স্বাধীন দেশে ৩৫ বছরের পুঞ্জিভূত সমস্যা রাতারাতি দূরকরাও দুরহ ব্যাপার। ভাল একটা কিছু পেতে হলে সংশ্লিষ্ট সরকারকে কাজ করার পরিবেশ তৈরীর সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে। তবে কাজ করলে শতভাগই সঠিক হবে এমনটিও আমরা আশা করতে পারি না। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশটিতে পোড়া মাটি, ভাঙ্গা ব্রীজ আর দরিদ্র ও ক্ষুধা পিড়িত অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত জনগণ নিয়েই বাঙালীদের কাছে হস্তগত হয় বাংলাদেশ। পর্যায়ক্রমে এদেশে যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটেছে। উন্নয়নে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের কম বেশী অবদান রয়েছে। এক্ষেত্রে সকল কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী মানুষ ও সকল বৈধ রাজনৈতিক দলের আন্তরিক প্রচেষ্টা এর দাবীদার। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি, দল বা সরকার যতটুকু অবদান রেখেছেন, দেশবাসী ততটাই মূল্যায়ন করতে ভুল করবেন না। বর্তমান ও পূর্ববর্তী গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনামলের তুলনামূলক চিত্র জনস্বার্থে উপস্থাপিত হল। যেমন ২০০৬ সালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ-৩.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার -২০১৩ সালে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৬ সালে রফতানী আয় ১.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৩ সালে ২.৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৬ সালে রেমিটেন্স প্রবাহ ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৩ সালে ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১০ টাকায় কৃষকদের ব্যাংক হিসাব খোলা ও সহজ শর্তে কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা। বর্তমান সরকার গত সাড়ে চার বছরে মালয়েশিয়ায় আড়াই লক্ষ শ্রমিক প্রেরণ এবং ৬ লক্ষ বাংলাদেশীকে সৌদিআরবে চাকুরী করার বৈধতা প্রদানের ব্যবস্থা করে। পূর্বে বিদেশে যেতে ৩-৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হত ও দালালের খপ্পরে পড়ে চাকুরীতো দুরের কথা জেল খেটে নিঃস্ব হয়ে দেশে ফেরত আসা ছাড়া কোন উপায় ছিলনা। সামাজিক নিরাপত্তা যেমন: ২,৪৭,৫০০ জনকে বয়স্ক ভাতা প্রদান, ৯,০২,০০০ জনকে বিধবা ভাতা প্রদান, ২,৮৬,০০০ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান। ২০১৩ সালে খাদ্য উৎপাদন ৩.৫০ কোটি মেট্রিকটন অর্থাৎ ৩০ শতাংশে বৃদ্ধি (২৩ লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্য উদ্বৃত্ত)। ২০০১-২০৬ সময়ে বৈদেশিক বিনিয়োগ ২৬০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২০০৯-২০১২ সময়ে ৮৫৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করণ। গত ৪ বছরে গৃহহীনদের আশ্রয়ের নিমিত্তে: ১৬৪টি গুচ্ছ গ্রামে ১৯,০০৩ পরিবারকে পুর্নবাসন, ৭১৮৮টি গৃহহীন পরিবারের জন্য ১০৯৮টি ব্যারাক হাউজ নির্মানাধীন। ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-ময়মনসিংহে ৪ লেন বিশিষ্ট রাস্তা নির্মানাধীন, কুড়িল ফ্লাই ওভার, মিরপুর এয়ার পোর্ট ফ্লাই ওভার, বনানী ফ্লাই ওভার তৈরী ও হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়িত এবং যাত্রাবাড়ী গুলিস্তান ফ্লাইওভার ডিসেম্বর/১৩ নাগাদ নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে ধারনা করা যাচ্ছে। ২০০৯-২০১৩ সময়ে বর্তমান সরকার মোট ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার জনকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে কম খরচে। স্বাস্থ্য সেবার নিমিত্তে বর্তমান সরকার ৬টি নার্সিং কলেজ ও ১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপিত ও শিক্ষার আধুনিকায়নের লক্ষে ২০,৫০০টি মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় মাল্টি মিডিয়ার ক্লাস রুম স্থাপনসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান। শিক্ষার উন্নয়নে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত, ফলে বর্তমানে শিক্ষার হার ৬৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয়ে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র সীমানা ও ১২টি গ্যাস ব্লক বাংলাদেশের মুঠো দখলে চলে আসে। বর্তমানে ৬০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুতের আওতায় এবং আরও ৩০ লক্ষ নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৫১,৫০০ নার্স ও সহকারী এবং ২৫০০০ স্কুল শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় কৃতিত্বের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শান্তি মডেল জাতিসংঘে গৃহিত হয়েছে। বর্তমানে মাত্র ৩৩,০০০ টাকায় জনশক্তি রফতানীর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ১২,২৬০টি কমিউনিটি হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। ২০০৬ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় ৩,৬৩২ মেগাওয়াট ও ২০১৩ সালে ৮,৫৩৭ মেগাওয়াট অর্থাৎ এ সরকারের আমলে অতিরিক্ত মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমান ৪৯০৫ মেগাওয়াটের বেশী। ফলে বর্তমানে অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে বিদ্যুত লোডশেডিং তুলনামূলক অনেক কম। মানুষের মাথা পিছু গড় আয় ১০৪৪ মার্কিন ডলার বা ৮৫,০০০/-টাকা। ২০১১ সালে ৯৯.৪৭ শতাংশ শিশুদের স্কুলে আনা এবং ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের হার ৪৮ শতাংশ হতে কমিয়ে ২১ শতাংশে নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যদিকে ১লা জানুয়ারী ২০১৩ তে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই সময়ে ২৭ কোটি নতুন বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিয়ে দেশবাসীকে অবাক করেছে বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ৩৫টি মাদ্রাসাকে আইসিটি ল্যাবসহ মডেল মাদ্রাসায় উন্নীত করণ ও ১০০টি মাদ্রাসায় ভকেশনাল কোর্স চলুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী উচ্চ শিক্ষার বিভাগ রাখা হয়েছে। ২৬,১৯৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয় করণ এবং ১,৪০,০০০ জন শিক্ষককে চাকুরীতে সরকারী করণ করা হয়েছে। অন্যদিকে দরিদ্র বিমোচনের জন্য ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় ৭৫ লক্ষ নারীকে মাসে ৩০ কেজি হারে খাদ্য শষ্য প্রদান ও ওএমএস, ভিজিডি, ভিজিএফ টি আর, কাবিখা ও খাদ্য নিরাপত্তা খাতে বছরে ৩,৯৪৫ কোটি টাকা ব্যয় করছে বর্তমান সরকার। বাগের হাটে ১৩০০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে (তথ্য বিঃ বোঃ)। দৈনিক ২৩ কোটি লিটার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প-্যান্ট নির্মান। তাছাড়াও, *মাতৃত্বকালীন, ২০০৬ সালে ৪ মাস, ২০১৩ সালে ৬ মাস। *শিশু মৃত্যুর হার, ২০০৬ সালে ৬.১০ শতাংশ, ২০১৩ সালে ৩.৯৯ শতাংশ, *স্বাক্ষরতার হার, ২০০৬ সালে ৫১.৯ শতাংশ, ২০১৩ সালে ৬৫.০৪ শতাংশ, *দারিদ্র হার ২০০৬ সালে ৪১.৫ শতাংশ, ২০১৩ সালে২৯.০৩ শতাংশ, *কর্মসংস্থান, ২০০৬ সালে ২৪ লক্ষ, ২০১৩ সালে ৭৫ লক্ষ, *বৈদেশিক বিনিয়োগ, ২০০৬ সালে ১৮৭ কোটি মার্কিন ডলার, ২০১৩ সালে ৩৮২ কোটি মার্কিন ডলার, *জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি গড়, বি.এন.পি ২০০৬ সালে ১৩৬ শতাংশ, ২০১৩ সালে ৩৮ শতাংশ, *পোষাক রপ্তানিতে বিশ্বের অবস্থান, ২০০৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ ২০১৩ সালে দ্বিতীয় স্থানে, * ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা, ২০০৬ সালে ৫৭ লক্ষ, ২০১৩ সালে ৪ কোটি, *শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী, ২০০৬ সালে ১৬৬২ টাকা, ২০১৩ সালে ৩০০০ টাকা, *রপ্তানি আয়, ২০০৬ সালে ১.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৩ সালে ২.৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, *হাসপাতালের সংখ্যা, বি.এন.পি ২০০৬ সালে ১৬৮০ টি, ২০১৩ সালে ২৫০১ টি, *পবিত্র হজ্ব পালন, ২০০৬ সালে ৪০ হাজার যাত্রী (সর্বোচ্চ), ২০১৩ সালে ১ লক্ষ ১০ হাজার (সর্বোচ্চ), *জেলেদেরকে খাদ্য সহায়তা, ২০০৬ সালে ৬৫০০ মেট্রিক টন, ২০১৩ সালে ৫৬২০০ মেট্রিক টন, *দৈনিক গ্যাস উত্তোলন, ২০০৬ সালে ১৫১৩ মিলিয়ন ঘনফুট, ২০১৩ সালে ২২৫০ মিলিয়ন ঘনফুট ২০০৬ সালে একজন দিন মজুর ১দিনের পারিশ্রমিক দিয়ে সর্বোচ্চ ৪ কেজি চাল ক্রয় করতে পারতেন, কিন্তু বর্তমানে ১দিনের শ্রমে ১০ কেজি চাউল ক্রয় করা সম্ভব। বর্তমান সরকারের আমলেই খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা হয়েছে। উপরন্তু ৭ ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যর হার ২২.৫ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে বর্তমান সরকারের।

এমনিভাবে শিক্ষা গবেষণা, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য ও কৃষিসহ বিভিন্ন সেক্টরে পূর্বের তুলনায় অনেকটা অগ্রগামী পরিলক্ষিত হচ্ছে। মূল কথা হলো রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা হ্রাস পেলে এবং সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহমর্মীতার আন্তরিকতা বৃদ্ধি পেলে ভবিষ্যতে এদেশকে অনেক দেশই মডেল হিসেবে গ্রহণ করবে।

ডা. মো. ফজলুল হক ভ

স্বাধীনতার সূচনায় বঙ্গবন্ধু

মহান স্বাধীনতা অর্জনে প্রস্তুতিমূলক হাজারো ঘটনা রয়েছে, যার মূল নায়কই ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীনতার ঘোষক এবং জাতির পিতা। রাজনৈতিক কারণে প্রায় ১৪ বছর ঝরে গেছে কারার প্রকোষ্ঠে, অর্থাৎ জেলখানায়। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণেই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল সব হিসাব-নিকাশের দিকনির্দেশনা। ঐতিহাসিক ভাষণের দিকনির্দেশনা ও ২৬শে মার্চের অগ্নিঝরা বাণীর মর্মার্থে উদ্দীপিত হয়েছিল সমগ্র বাঙালি জাতি, জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ।

পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তারা সাধারণ মানুষের বন্ধু ছিল না। কথায় কথায় গুলি চালাত, বুটের লাথিতে লুটিয়ে পড়ত বাঙালিরা। তারা বাঙালিদের ন্যূনতম সম্মান ও অধিকার দিত না। বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও ক্ষমতায় বসতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এ দেশের মুক্তিকামী মানুষের মুক্তিসংগ্রাম ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীনতাই আমাদের মাথার মুকুট।

৭ই মার্চ ১৯৭১ সালে ঐতিহাসিক ভাষণের মূল কথাই ছিল বাঙালি জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে আমাদের কী করতে হবে? ১৮ মিনিটের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর বার্তা ও অবস্থান এতটাই সুস্পষ্ট, সংযত ও সুসংহত ছিল যে এর কোনো তুলনাই আর চলে না। ভাষণের শুরু থেকে শেষ অবধি বঙ্গবন্ধু মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো টেনে ধরে রেখে যখন ছেড়ে দিলেন, তখন শুধু উপস্থিত লাখ লাখ শ্রোতাই নয়, প্রায় গোটা জাতি স্বাধীনতার স্বপ্নে উজ্জীবিত হয়ে গেল। এর ফলে সমগ্র জাতি তথা সাড়ে সাত কোটি বাঙালি জনগোষ্ঠী বুঝে নিল তাদের করণীয় ও দিকনির্দেশনা। স্লোগান উঠেছিল, এক মুজিব অন্তরালে লক্ষ মুজিব ঘরে ঘরে। এ স্লোগান সামনে রেখে বাঙালিরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে, জীবন বিসর্জন দিতে এতটুকুও পিছুটান ছিল না। অনেক সন্তান তার মা-বাবাকে এবং স্বামী তার স্ত্রীকে না বলেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অনেকে আজও ফিরে আসেননি।

৩০ লাখ মানুষ শহীদ হয়েছে, দুই লাখ মা-বোন অসম্মানিত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা কোনো বিনিময়ে বা ব্যক্তিস্বার্থে যুদ্ধ করেননি। স্বার্থ একটাই, বাংলা মায়ের স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁরা। ওই সময় পাক বাহিনী ঢাকাস্থ রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার, পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা চালিয়ে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে। ঘরবাড়ি, স্কুল-কলেজ, মিল-কারখানায় আগুন ধরিয়ে দেয়। বাড়িঘর ছেড়ে লাখ লাখ মানুষ পালিয়ে গ্রামের ঠিকানায় বা আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে অবস্থান নেয়। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে পালাতে থাকে। রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনী (জামায়াত মতাদর্শের) গ্রামগঞ্জে ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মানুষ হত্যার মিশন চালায়। অন্যদিকে মুক্তিকামী প্রকৃত বাঙালিরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যাঁর যা কিছু ছিল তা নিয়েই প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। দ্রুত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত ১২টা ২০ মিনিটে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এ দিনটি মহান স্বাধীনতা দিবস নামে খ্যাত। যার প্রতিটি শব্দের অর্থই ছিল পাকিস্তানিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নয়। ওরা আমাদের শত্রু। ওদের থেকে নিজেদের বাঁচাতে হবে। দেশকে বাঁচাতে হবে।

মূল বক্তব্যটি ছিল ইংরেজিতে, যার মূল অর্থ দাঁড়ায় 'ইহাই হয়তো আমার (বঙ্গবন্ধুর) শেষ বার্তা, আজ হতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি, যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার পাক বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।'

এ স্বাধীনতা ঘোষণার কয়েক মিনিট পরই পাকিস্তান সামরিক জান্তা বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে প্রথমে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এবং সেখান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যায়। মানসিক নির্যাতন চালানো হয়, ফাঁসির আদেশ হয়, জেলখানার পাশে কবর খোঁড়া হয়। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না, আমার লাশ যেন বাংলার মাটিতে দাফন করা হয়।' বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি বাংলাদেশের ওয়্যারলেস ও টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সমগ্র দেশে পৌঁছে দেওয়া হয়। ছাত্র, কৃষক, শ্রমিকসহ সব শ্রেণি ও পেশার মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশ রক্ষায়। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গ্রামগঞ্জ, শহর ও শহরতলিতে চলে প্রশিক্ষণের মহড়া। আর্মি, ইপিআর ও পুলিশ সদস্যরাই প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। দলে দলে লোক যোগ দেয় মুক্তিযুদ্ধে। অস্ত্রের সন্ধানে থানার অস্ত্রাগার ও বন্দুকের দোকান লুট করে অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। অনেক আর্মি, ইপিআর ও পুলিশ সদস্য স্বেচ্ছায় অস্ত্র লুট করে যোগ দেয় মুক্তিযুদ্ধে। ভারত বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিল আমাদের। শত্রুর মোকাবেলায় ২১ দিন মেয়াদি স্বল্পমাত্রায় ট্রেনিং দিয়ে থ্রি নট থ্রি, এসএলআর, স্টেনগান, এসএমজি, ডিনামাইট ও গ্রেনেটসহ মুক্তিযোদ্ধারা ফিরে আসে বাংলাদেশে, যোগ দেয় গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধে। মুক্তিযোদ্ধাদের পেটে খাবার তেমনটা না থাকলেও দেশপ্রেমই ছিল তাঁদের বড় খোরাক। আল্লাহর রহমতে পাকিস্তানি সৈন্য ও এ দেশের রাজাকারদের শক্ত বাধা সত্ত্বেও জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ চালিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিল মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী বাঙালি জাতি। আজও অনেক আহত মুক্তিযোদ্ধা অনেক কষ্টে ও অভাবে দিনাতিপাত করছেন, হুইলচেয়ারে বসে চলছে তাঁদের জীবনযাত্রা। বঙ্গবন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রম, সততা, দেশপ্রেম, মানবপ্রেমকে পুঁজি ধরেই আমরা পেয়েছি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ দেশকে রক্ষা করা, সমৃদ্ধিশালী করা, সম্মানিত করা দলমত-নির্বিশেষে সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। দেশ উন্নয়নের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আরো এগিয়ে যাবে। আরো এগোতে হবে।

লেখক : চেয়ারম্যান, মেডিসিন, সার্জারি অ্যান্ড অবস্টেটিকস বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

পাকিস্তানি সৈন্য ও এ দেশের রাজাকারদের শক্ত বাধা সত্ত্বেও জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ চালিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিল মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী বাঙালি জাতি। আজও অনেক আহত মুক্তিযোদ্ধা অনেক কষ্টে ও অভাবে দিনাতিপাত করছেন, হুইলচেয়ারে বসে চলছে তাঁদের জীবনযাত্রা। বঙ্গবন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রম, সততা, দেশপ্রেম, মানবপ্রেমকে পুঁজি ধরেই আমরা পেয়েছি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ দেশকে রক্ষা করা, সমৃদ্ধিশালী করা, সম্মানিত করা দলমত-নির্বিশেষে সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। দেশ উন্নয়নের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আরো এগিয়ে যাবে

মেইল-ইমেইল

চিঠি পাঠান কালের কণ্ঠ'র ঠিকানায়
ই-মেইল : editorial@kalerkantho.com

উপ-সম্পাদকীয়

১৩ জানুয়ারি ২০১৩

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

পাকশাসন ও তাদের সীমাহীন শোষনে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ছিলেন নিষ্পেসিত। প্রায় সকলের মধ্যেই একটি ক্ষোভ ঐ দুঃশাসনের বেড়াজাল হতে বের হতে পারলেই নিস্তার, তবে প্রবাদ আছে ঐ বিড়ালের গলায় ঘন্টা কে বাধবেন? এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ যেহেতু ঐ সময়ে বিশ্বব্যাপী পাকিস্তানকে ক্ষমতাশীল দেশ ও পাক সৈন্যদেরকে বিশ্বের সেরা সৈন্য হিসেবে সুনামও ছিল। ঐ কঠিন সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালী জাতিকে সুসংগঠিত করে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে পর্যায়ক্রমে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ছয়দফার দাবী, ১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থান এবং '৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় তথা বাংলাদেশের জন্ম। ঐ সকল ঘটনাবলী ও সাফল্যের মূলে যার অবদান সবার উর্দ্ধে তিনি হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, বাংলাদেশের স্থপতি, বাংলার অবিসাংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যিনি পাকিস্তানের সু-দীর্ঘ ২৩ বছরে ১৪ বার গ্রেফতার, প্রায় ১৩ বছর রাজনৈতিক কারণে কারাবরণও দু'বার ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে এসেছেন। তার কণ্ঠস্বর ছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর অনুপ্রেরণার উৎস। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। সেদিন ভোর ৫টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ হাতে ৩২ নং ধানমন্ডির বাসায় বাংলাদেশের সোনালি মানচিত্র খচিত লাল-সবুজ পতাকা উত্তোলন করেন। এরই মাধ্যমেই দীর্ঘ ২৩ বছরের পাকিস্তানি শাসন ও শোষনের কবল থেকে দেশ মুক্তিলাভের শুভ সূচনা করেন এবং পৃথিবীর মানচিত্রে প্রথম স্থান পায় বাংলাদেশের নতুন পতাকা। ২৫ মার্চ শুরু হয় নৃশংস গণহত্যা। ২৬ মার্চ রাত ১টা ২০ মিনিটে স্বাধীনতা ঘোষণার কয়েক মিনিট পরই গ্রেফতার করা হয় বঙ্গবন্ধুকে। ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ মাস বঙ্গবন্ধু ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। একটি প্রশ্ন জাগে পাকিস্তানিদের ভাষা উর্দ্ধ, সাঁতার কাটতে জানেনা, রাস্তাঘাট চিনেনা, কিন্তু কিভাবে এবং কার সহযোগীতায় স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্রেফতার করা হল বঙ্গবন্ধুকে, হত্যা করা হলো প্রায় ত্রিশ লক্ষ বাঙালীকে। হত্যাকারী ও স্বাধীনতা বিরোধীরাই রাজাকার, আলবদর, আলসামস্ অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধী। বঙ্গবন্ধুর জীবনের স্বর্ণোজ্জ্বল অংশটুকুই কাটিয়েছেন কারার প্রকষ্টে। কয়েকবার কবর খোড়া হয়েছে ভয়ভীতি দেখানোর জন্য যাতে বাংলার মানুষের মুক্তি বা স্বাধীনতার দাবী না তুলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু বলতেন, আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায়, শিক্ষা পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।

২৫ মার্চ/১৯৭১ সালের দিবাগত রাত ১২টা-২০মিনিটে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন যেমন, "এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তা নিয়েই শেষ পর্যন্ত দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহবান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।"
এই ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়ারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রেরিত হয়। এর পর ২৬ মার্চ/১৯৭১ রাত ১টা-৩০ মিনিটে, ৩২ নম্বর ধানমন্ডীর বাড়ী হতে পাকবাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত, ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি এবং অগনিত শিক্ষক, সাংবাদিক, প্রকৌশলী, লেখক, বিচারকসহ অনেক বুদ্ধিজীবিকে পরিকল্পিত হত্যা করা হয় চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র ৪২ ঘন্টা পূর্বে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সানে। ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ সনে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যায় সমগ্র জাতি গভীরভাবে শোকাহত। "বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর খবর শুনে বৃটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ডউইলসন লন্ডনের এক বাঙালি সাংবাদিকের কাছে লেখা শোকবাণীতে বলেন, "এটা আপনাদের কাছে অবশ্যই এক বিরাট ন্যাশনাল ট্রাজেডি। আমার কাছে এক পরম শোকাবহ পার্সোনাল ট্রাজেডি।" এ নৃশংস হত্যাকান্ডের জন্য পাকিস্তানের বর্তমান বিজ্ঞানী কাদের খান, ঐ '৭১ এর ঘটনার জন্য লজ্জিত হয়েছেন মর্মে পত্রিকায় প্রকাশিত। এজন্য পাকিস্তানের ক্ষমাচাওয়াই যথেষ্ট নয়, ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিৎ। বঙ্গবন্ধুকে যারা দেখেছেন, বক্তব্য শুনেছেন তারা আজও ভুলে যাওয়ার কথা নয়। তিনি সত্যিকারের একজন জনদরদী নেতা শুধু বাংলাদেশের জন্যই নন। তিনি ছিলেন, সমগ্র বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত মানুষের মুক্তির কণ্ঠস্বর, এক অনন্য নেতা ও রাজনীতিবিদ। আমি মনেকরি তিনি বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ উন্নয়নের শীর্ষে আসীন হতে এত অধিক সময়ের প্রয়োজন হতনা। আমরা হতাম আরও অধিক সম্মানের। গত ২০০৯ সনে পবিত্র হজ্জব্রত পালনের সময় পবিত্র কাবাঘর চত্বরে এক নাইজেরিয়ান হাজী সাহেব আমাকে বলেন Where did you come from? I am from Bangladesh. আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, Do you know Bangladesh? তিনি বললেন, Yes, Sheikh Mujibur Rahman এ থেকে বোঝা যায় তিনি বাংলাদেশের মহান নেতাই শুধু নন, অনেক সম্মানের ও গৌরবের বিদেশীদের কাছেও। তাঁর সম্পর্কে বিদেশী সাংবাদিক সিরিল ডান বলেছেন, "বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা যিনি রক্তে, বর্ণে, ভাষায়, কৃষ্টিতে এবং জনসূত্রেও ছিলেন খাঁটি বাঙালি। জনগণকে নেতৃত্বদানের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও সাহস তাঁকে এ যুগের এক বিরল মহানায়কে রূপান্তর করেছে।" বিশ্বখ্যাত যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউজ উইক' পত্রিকায় প্রকাশিত"শেখ মুজিব সুপারম্যান ও রাজনীতির কবি"। বৃটিশ মানবতাবাদী আন্দোলনের প্রয়াত নেতা মনীষী লর্ড ফেনার ব্রকওয়ে মন্তব্য করেছিলেন নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু, "আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, ভারতের মহাত্মা গান্ধী, আয়ার ল্যান্ডের জর্জ ডি ভ্যালেরার চেয়েও এক অর্থে মহান নেতা কারন তিনিই একমাত্র নেতা যিনি একই সাথে একটি স্বাধীন জাতি ও স্বাধীন ভূমির জনক। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুকে আলীঙ্গনাবদ্ধ করে কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন, "আমি হিমালয় পর্বত দেখিনি, শেখ মুজিবকে দেখলাম। ব্যক্তিত্বে ও সাহসে এই মানুষটি হিমালয় পর্বতের মতই। আমি হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। "মিসরের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হাসনাইন হাইকেল বলেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের নন সমগ্র বিশ্বের নেতা। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন আমাদের ইসলাম হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর ইসলাম, যে ইসলাম জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বারবার যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনার পৃষ্টপোষকতা করে, আমাদের সংগ্রাম সেই মুনাফিকদের বিরুদ্ধে। যে দেশে শতকরা ৯৫ জন মুসলমান, সে দেশে ইসলাম বিরোধী আইন পাসের ভাবনা ভাবতে পারেন তারাই যারা ইসলামকে ব্যবহার করেন দুনিয়াটা শায়েস্ত

প্র:পৃ:উ:

সাপ্তাহিক গনবন্ধু

। করার জন্য।

১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে তিনি যে নির্বাচনী অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন, নির্বাচনের সেই অঙ্গীকার তিনি তাঁর সাড়ে তিন বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনামলে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বল্পকালীন শাসনামলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জনমানুষের ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন সমকালীন মুসলিম বিশ্বে এর দৃষ্টান্ত বিরল। নিম্নে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলোঃ * ১৯৭৫ সালের ২২ শে মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন, *বাংলাদেশ সীরাত মজলিশ প্রতিষ্ঠা, *বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন (পূর্বে স্বায়ত্তশাসিত মাদ্রাসা বোর্ড ছিল না), * বিশ্ব এজতেমার জন্য টঙ্গিতে সরকারী জায়গা বরাদ্দ, *কাকরাইলের মারকাজ মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দ, * হজ্জ পালনের জন্য সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করণ *রাশিয়াতে প্রথম তাবলীগ জামায়াত প্রেরণের ব্যবস্থা করেন, কারণ ঐ দেশটি কমিউনিষ্ট মতাদর্শের কারনে সেখানে বিদেশ হতে ইসলাম প্রচারের জন্য কেউ অনুমতি পেতনা না। বঙ্গবন্ধুই প্রথম তাবলীগ জামাত প্রবেশের অনুমতির ব্যবস্থা করছেন *আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন ও সাহার্য্য প্রেরণ, * ও, আই, সি সম্মেলনে যোগদান ও মুসলিম বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন *ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ), শব-ই-কদর, শব-ই-বরাত উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা এবং উল্লেখিত দিনগুলোতে সিনেমা হল প্রদর্শন বন্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান, *মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধকরণ এবং শাস্তির বিধান, , *রেসকোর্স ময়দানের ঘোড়াদৌড় প্রতিযোগিতা বন্ধকরণ ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধু তাঁর সাড়ে তিন বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনামলে ইসলামের খেদমতে যে অভূতপূর্ব নিদর্শন রেখে গেছেন তা ধর্মপ্রাণ মুসলিম সমাজ অবশ্যই মূল্যায়ন করবেন। তাছাড়াও ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের বিনামূল্যে বই বিতরণ যার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে এইচএসসি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ করার ব্যবস্থা করছেন বর্তমান সরকার। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের সাথে স্থায়ীভাবে সংযোজিত হল ১,১১,৬০০ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র জল সীমা। যা ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর শাসনামল থেকেই প্রক্রিয়াধীন ছিল যেটি গত ১৪ই মার্চ/২০১২ ইং তারিখে বাস্তবায়িত হল।

স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের চক্রান্তেই বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবার শাহাদাত বরণ করতে হল। এটি অমানবিক ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের শামীল। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ১৫ আগস্ট একটি কলংকিত অধ্যায়। যেদিন আমরা অপবাদ আর বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারব, সেই দিনই সম্ভব হবে তাঁর অসামান্য ঋণের কিঞ্চিৎ পরিশোধ করা। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার বর্গ এবং জেল হত্যার চার নেতা, বুদ্ধিজীবি ও সাংবাদিকসহ '৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহীদদের এবং ২১ আগষ্টের গ্রেনেট হামলায় নিহতদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। সকল তথ্যাদি এটাই প্রমান করে বঙ্গবন্ধু ছিলেন সত্যিকার অর্থেই একজন দেশ প্রেমিক, জনদরদী এবং ধর্ম প্রাণ মুসলিম নেতা, যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙালী, স্বাধীনতার ঘোষক ও বাংলাদেশের স্থপতি। ঘাতক কর্তৃক অকাল মৃত্যুতে আজ বাঙালী জাতি শোকাহত। বিজয়ের এ মাসেই '৭১ এর স্বাধীনতা বিরোধীদের ধ্বংসযোগ্য ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। বঙ্গবন্ধুর অবশিষ্ট হত্যাকারীসহ সকল যুদ্ধাপরাধীর বিচারকার্য্য সম্পাদনের মাধ্যমে কলঙ্কমুক্ত হোক এটিই এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির প্রাণের দাবী।

লেখকঃ প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হক (মুক্তিযোদ্ধা)
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
ই-মেইলঃ *fhoque.hstu@gmail.com*

ডা. মো. ফজলুল হক ভ

সুদূর মহাকাশে বাংলাদেশের স্যাটেলাইট

১৯৯৬ সালে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য গিয়েছিলাম টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে। এক পিএইচডি ছাত্র জানতে চাইলেন, তোমার দেশ কোনটি? বাংলাদেশ বলায় বেশ কয়েক মিনিট পর বললেন, এটি কোথায় অবস্থিত। ভারতের কোন দিকে। ২০০৯ সালে গিয়েছিলাম সৌদি আরবে হজ পালন করতে। নাইজেরিয়ান এক হাজি সাহেব আমার বাড়ি কোন দেশে জানতে চাইলেন। আমি বললাম বাংলাদেশে। পাল্টা প্রশ্ন করলাম—তুমি বাংলাদেশ চেনো কি? উত্তরে তিনি বললেন, ইয়েস—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, দ্য ফাদার অব নেশন। এতে বুঝতে পারলাম বাংলাদেশকে চিনতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর পরিচয়টি তাদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা, অদম্য সাহস, দেশপ্রেম ও সততার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ফসল হিসেবে জাতিকে দিয়েছেন সোনার বাংলাদেশ। তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা দিয়েছেন আধুনিক বাংলাদেশের রূপরেখা, স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য অদম্য সাহস ও শক্তি। তাঁর রাজনৈতিক জীবন ৩৭ বছর কয়েক মাস। দেশ-বিদেশের অনেক বাধাকে জয় করে একের পর এক অভাবনীয় কাজ করে বিশ্ববাসীকেও তাক লাগিয়েছেন। ১৯৭২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪৬ বছরের মধ্যে আওয়ামী লীগ শাসন করেছে সাড়ে সতেরো বছর। এ সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর শাসনামল মাত্র সাড়ে তিন বছর। সে সময়ে দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধবিধ্বস্ত ঘরবাড়ি, যোগাযোগব্যবস্থাসহ বিভিন্ন কাজের জন্য বিদেশের কাছে ধরনা দিয়ে দেশকে উন্নয়নের জোয়ারে আনতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে। এরপর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ফলে উন্নয়নের চাকা বন্ধ হয়ে যায়। বিশ্ববাসী আজ আমাদের দেশকে উন্নয়নের মডেল হিসেবে দেখছে। যেমন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য মডেল দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এক জনসভায় মন্তব্য করেন, উন্নয়নের দিক থেকে বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম পর্যায়ে। এ ছাড়া নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন বাংলাদেশের অবস্থানকে মর্গোজ্জ্বল বলে অভিহিত করেছেন।

আজ আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রচেষ্টায় পেয়েছি মহাকাশের সন্ধান। ১২ মে ২০১৮ শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে নতুন যুগের মহাকাশ যাত্রা শুরু হলো। এ সরকারকে কাজ করার সুষ্ঠু পরিবেশ দিলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। হেনরি কিসিঞ্জারের মন্তব্য ছিল তলাবিহীন ঝুড়ি, আজ সেই আমেরিকার মাটি থেকেই মহাকাশে উড়ল বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট। বাংলাদেশ আজ ৫৭তম স্যাটেলাইটসম্পন্ন রাষ্ট্রের তালিকায়।

শুধু সম্মানই নয়, প্রতিবছর অতিরিক্ত খরচ ছাড়াও আয় হবে প্রায় ৪০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। বর্তমানে অর্থনীতিতে ৭৪টি উদীয়মান দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৩৪তম অবস্থানে, যা পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলঙ্কার চেয়েও বেশি। এখানেই শেষ নয়, দেশে নতুনভাবে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। বর্তমানে ৩০টি টিভি চ্যানেল রয়েছে বাংলাদেশে, যার স্যাটেলাইট ভাড়া প্রতিবছর ১১৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা, যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল থেকে চলে যেত। এখন বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট হওয়ায় দেশের টাকা দেশেই থাকবে। তা ছাড়া আয় হবে কোটি কোটি টাকা। পূর্বাভাসের মাধ্যমে দুর্যোগ থেকেও মানুষ রক্ষা পাবে আগাম বার্তার কারণে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, দেশের স্বার্থকে দেখতে হবে সবার উর্ধ্বে। ভাবতে হবে বিগত ৪৬ বছরে কোন সরকার কতটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছে। পেশিশক্তির যুগ শেষ অনেক আগেই। এখন প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্ব। প্রযুক্তিতে যে দেশ যত ভূমিকা রাখতে পারবে সে দেশ ততটাই সমৃদ্ধ। ২০০৮ সালেও দেখেছি বিদেশিদের ফেলে দেওয়া কম্পিউটার, প্রিন্টার রাস্তা থেকে কুড়িয়ে তা মেরামত করে ব্যবহার করার মতো অবস্থা। দেখেছি একটি কালভার্ট, ব্রিজ, রাস্তাঘাট তৈরি ও খাল খননের জন্য বিদেশিদের ওপর নির্ভর করতে হতো আমাদের। ২০০৯ সাল থেকে ধীরে ধীরে ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। শুধু তা-ই নয়, পর্যায়ক্রমে সফলতা আসছে আমাদের। শেখ হাসিনার সরকার আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে সমুদ্র জয় করেছে। এর মাধ্যমে এক লাখ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার মিয়ানমারের দখল থেকে এবং ১৯ হাজার ৪৬৭ বর্গকিলোমিটার সমুদ্রসীমা ভারতের দখল থেকে বাংলাদেশের অধীনে আসে। তা ছাড়া ৬৮ বছরের বন্দিজীবন থেকে ছিটমহলবাসীদের মুক্ত করেছেন শেখ হাসিনা। বর্তমান সরকারের ভালো কাজগুলো মূল্যায়ন করে দেশকে আরো এগিয়ে নিতে হবে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিগত সময়ে একাধারে প্রায় ২২ বছর রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে দেশটিকে এগিয়ে নিয়েছিলেন বিধায় সে দেশের মানুষ আবার তাঁকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেছে। আমাদের উন্নয়নের গতি সঠিক পথে রাখতে হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিকল্প নেই বলে বেশির ভাগ মানুষ মনে করে। সততা ছাড়া বা সৎ নেতা ছাড়া দেশই শুধু নয়, নিজের ছোট সংসারও টিকিয়ে রাখা যায় না।

লেখক : ডিন, ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিম্যাল সায়েন্স অনুষদ এবং চেয়ারম্যান, মেডিসিন, সার্জারি অ্যান্ড অবস্টেট্রিকস বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান সরকারের ভালো কাজগুলো মূল্যায়ন করে দেশকে আরো এগিয়ে নিতে হবে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিগত সময়ে একাধারে প্রায় ২২ বছর রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে দেশটিকে এগিয়ে নিয়েছিলেন বিধায় সে দেশের মানুষ আবার তাঁকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেছে। আমাদের উন্নয়নের গতি সঠিক পথে রাখতে হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিকল্প নেই বলে বেশির ভাগ মানুষ মনে করে।

editorial@kalerkantho.com

২১ আগস্ট ২০০৪ সালে গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগের ২৪ জন নেতাকর্মীর মৃত্যু দেশের মানুষ দেখেছে। অবৈধ পথে দশ ট্রাক অস্ত্র বিদেশ থেকে দেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল বিএনপি-জামায়াত শাসনামলে। তা ছাড়া মিল-কারখানায় অগ্নিসংযোগ, পেট্রলবোমার দ্বারা মানুষ হত্যা, বাস, ট্রাক, ট্রেনে অগ্নিসংযোগ, গাছ কেটে রাস্তা অবরোধ ইত্যাদি বিএনপি ও জামায়াতের হরতালেই ঘটেছিল। এ দেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়

ডা. মো. ফজলুল হক ▷

বিগত দিন থেকে শিক্ষা নিন

আমাদের দেশের নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী হেরে গেলেই বলা হয় ভোটে কারচুপি হয়েছে, ভোটারদের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, পোলিং এজেন্ট বের করে দেওয়া হয়েছে, জাল ভোট দিয়েছে, অর্থাৎ নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি, পুনর্নির্বাচন চাই। লাখ লাখ ভোট প্রদান ও গ্রহণে কিছু অনিয়ম হতেই পারে, যেমনটি হয় পরীক্ষার হলে ছিটেফোঁটা নকল। নকল করা ছাত্ররা কোনো দিন ভালো রেজাল্ট করতে পারে না, ফেলই করে বেশি। তেমনই নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তাই হয়। আমি ১৯৮৩ সালে সরকারি চাকরিতে (ক্যাডার সার্ভিসে) যোগদানের পর থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছি, তা ছাড়া ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছি। সব নির্বাচনেই হেরে যাওয়া পরাজিত দলের একই মন্তব্য শুনেছি। প্রিসাইডিং অফিসার (তৎকালীন) হিসেবে মন্তব্য হলো, মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যই বেশি। তবে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত যতগুলো নির্বাচন হয়েছিল, সেখানে ছোটখাটো ভোটচুরির যে ঘটনা ঘটেছে, তা এখন হয় না বললেই চলে। সে সময় রাস্তায় ব্যালট পেপার পাওয়া যেত। এর কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায় ২০১৩ সালের ১৫ জুন অনুষ্ঠিত চার সিটি করপোরেশন নির্বাচনে। তাতে বিএনপির প্রার্থীরা বিজয়ী হলেও সরকারদলীয় (আওয়ামী লীগ) পরাজিত মেয়র প্রার্থীরা পরাজয়কে হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলেন। বিএনপির বিজয়ী মেয়র প্রার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। এটাই হলো গণতন্ত্র। প্রার্থীর জয় পেতে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে ওই প্রার্থীর বিগত সময়ের কর্মকাণ্ড, আচার-ব্যবহার, নীতি-নৈতিকতা, সততা, রাজনৈতিক দলের ভাবমূর্তি ও দেশের স্বাধীনতায় ভূমিকা ইত্যাদি। গাজীপুরে গত ২৬ জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী বিপুল ভোটে বিজয় লাভ করেন। এ বিজয় প্রার্থীর পাশাপাশি তাঁর রাজনীতির বিজয়। আওয়ামী লীগ ও বর্তমান সরকারের জয়। এ বিজয় এ দেশের স্বাধীনতার সপক্ষের জনগণের বিজয়, উন্নয়নের প্রতি মানুষের সমর্থনের বিজয়। এ জয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের জয়।

নির্বাচন বিশ্লেষকদের আগাম মন্তব্য ছিল গাজীপুর সিটি নির্বাচন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির জন্য এসিড টেস্ট স্বরূপ। দেশ ও জনগণের জন্য কাজ করলে তার মূল্য দিতে জানে এ দেশের মানুষ, তারই প্রমাণ খুলনা ও গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ফলাফল। উল্লেখ্য, নির্বাচনের দুই দিন আগে গাজীপুরে থাকা কয়েক বন্ধুর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, নির্বাচনের খবর কী? তাঁরা অকপটে জানালেন, নৌকা প্রতীকের দিকেই হাওয়া বইছে। নির্বাচনের পর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের একজন হাফেজ সাহেবের সঙ্গে কথা হয়। তাঁর বাড়ি ওই এলাকায় হলেও নির্বাচনী এলাকার মধ্যে নয়। তাঁর মন্তব্য হলো, লোকমুখে শুনেছেন, এবারের নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু হয়েছে, যা এর আগে কখনো গাজীপুরে হয়নি। সাধারণভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় বর্তমান যুগটি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যুগ। কোথায় কী ঘটছে তা মুহূর্তের মধ্যে মিডিয়ায় চলে আসে, ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে সব কিছু। আজকাল কি খুব বেশি অনিয়ম করার সুযোগ আছে।

২১ আগস্ট ২০০৪ সালে গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগের ২৪ জন নেতাকর্মীর মৃত্যু দেশের মানুষ দেখেছে। অবৈধ পথে দশ ট্রাক অস্ত্র বিদেশ থেকে দেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল বিএনপি-জামায়াত শাসনামলে। তা ছাড়া মিল-কারখানায় অগ্নিসংযোগ, পেট্রলবোমার দ্বারা মানুষ হত্যা, বাস, ট্রাক, ট্রেনে অগ্নিসংযোগ, গাছ কেটে রাস্তা অবরোধ ইত্যাদি বিএনপি ও জামায়াতের হরতালেই ঘটেছিল। এ দেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়। আগুন-সন্ত্রাস চায় না। পোড়া মানুষের কান্না শুনতে ও দেখতে চায় না। সেসব বিভীষিকাময় ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক তা আর দেখতে চায় না। দেশের উন্নতি চায়, অগ্রগতি চায়। এ অগ্রগতি বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বারাই সম্ভব হচ্ছে, যার প্রমাণ অনেক। যেমন—সমুদ্র বিজয় (এক লাখ ৩০ হাজার বর্গকিলোমিটার), ছিটমহল বিনিময়, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন (প্রক্রিয়াধীন), মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্র, ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন, বিশ্বব্যাংকের ঋণ ছাড়া বিশ্বের অন্যতম খরস্রোতা নদীতে পদ্মা সেতু তৈরি (কাজ চলমান), ফ্লাইওভার, মেট্রো রেল (নির্মাণাধীন), সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ও বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে ৫৭তম সদস্যসহ বিভিন্ন উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গি দমন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য জিরো টলারেন্স নীতি (চলমান) ইত্যাদি এ সরকারেরই অগ্রগতির একটি অংশ। অর্থাৎ দেশের স্বার্থে কাজ করলে ভোটাররাই সে দল বা প্রার্থীকে আরো দেশের স্বার্থে কাজ করার সুযোগ করে দেবে—এটিই স্বাভাবিক। এ কারণেই এ সরকারের পক্ষের প্রার্থীরাই বিপুল ভোটে এগিয়ে যাচ্ছে। ভোট ভোটারের নিজস্ব আমানত। এ আমানত যোগ্য প্রার্থী বা যোগ্য রাজনৈতিক দলের পক্ষে পড়বে। এটাই স্বাভাবিক। টেনশন করার কিছু নেই। ডা. মাহাথির মোহাম্মদ একাধারে ২২ বছর (১৯৮১-২০০৩) মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে ওই দেশকে উন্নয়নের উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন বিধায় প্রায় ৯৩ বছর বয়সে ওই দেশের মানুষ আবার জোর করেই রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন করেছেন তাঁকে। এ থেকে সবারই শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। দেশের স্বার্থে কাজ করলে ভোটারের পেছনে দৌড়াতে হবে না ভোটের জন্য।

লেখক : চেয়ারম্যান ও ডিন, মেডিসিন, সার্জারি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিম্যাল সায়েন্স অনুষদ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

ডা. মো. ফজলুল হক ভ

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনের প্রধান যদি সৎ ও দেশপ্রেমিক হন, তবেই উন্নয়ন সম্ভব। এটিই চিরন্তন সত্য, স্বতঃসিদ্ধ। হেনরি কিসিঞ্জারের মন্তব্য, 'বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ি' এবং পাকিস্তানি প্রশাসনের মন্তব্য, 'বাঙালিরা বাংলাদেশ এক দিনও চালাতে পারবে না।' ২০১৮ সালের ১২ মে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকেই গর্বের বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট সফল উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে ৫৭তম স্যাটেলাইট সদস্য রাষ্ট্রের তালিকায় বাংলাদেশ। সততা, আন্তরিকতা ও দেশপ্রেম থাকলে সবই সম্ভব, যার উদাহরণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যে ১৮টি দেশ এগিয়ে আছে, বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। অর্থনীতিতে ৭৪টি উদীয়মান দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৩৪তম অবস্থানে, যা পাকিস্তান, ভারত শ্রীলঙ্কার চেয়েও বেশি। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে। ফলে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ২০০৬ সালে ৫.৭ শতাংশ থেকে ২০১৩ সালে ৬.৭ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে ৭.৩ শতাংশে। বিশ্বব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বিশ্বের সর্বোচ্চ অর্জিত প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ পঞ্চম স্থানে রয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য মডেল দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নের রোডম্যাপে বাংলাদেশের অবস্থানকে অত্যন্ত ঈর্ষণীয় বলে অভিহিত করেন। অমর্ত্য সেন আরো বলেন, নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে অনেক এগিয়ে। তাঁর মন্তব্যটি শতভাগ প্রতিফলিত হয়েছে ২০১৮ সালের মার্চে। এ সফলতার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ প্রদান করা হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এক জনসভায় মন্তব্য করেন, উন্নয়নের দিক থেকে বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম পর্যায়ে। এ অবস্থানে দেশকে এগিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বই প্রধান বিষয়। তা ছাড়া উল্লেখ করেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশকে গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে। বহির্বিশ্বে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, যোগাযোগব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা, মাথাপিছু আয়, পররাষ্ট্রনীতিসহ সব সেক্টরের উন্নয়নকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু আয় এক হাজার ৬০২ মার্কিন ডলার, যা উন্নয়নশীল দেশের কাতারে স্থান পাওয়ার তুলনায় অনেক বেশি।

দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ বিশ্বে পুরস্কার সাউথ সাউথ দ্বারা সম্মানিত করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি এ দেশের জনগণেরই অর্জন। উন্নয়নে দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের কমবেশি অবদান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি, দল বা সরকার যতটুকু অবদান রেখেছে, দেশবাসী ততটাই মূল্যায়ন করতে ভুল করবে না। বর্তমান ও পূর্ববর্তী গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনামলের তুলনামূলক চিত্র জনস্বার্থে উপস্থাপিত করা হলো। ২০০৬ সালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৩ সালে এক হাজার ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৩৩ হাজার ৩৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৬ সালে রপ্তানি আয় এক হাজার ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৩ সালে চার হাজার ৮৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ২৩ হাজার ৮৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সামাজিক নিরাপত্তা: যেমন—দুই লাখ ৪৭ হাজার ৫০০ জনকে বয়স্ক ভাতা, ৯ লাখ দুই হাজার জনকে বিধবা ভাতা এবং দুই লাখ ৮৬ হাজার জনকে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৩ সালে খাদ্য উৎপাদন ৩.৫০ কোটি মেট্রিক টন অর্থাৎ ৩০ শতাংশ বৃদ্ধির ফলে ২৩ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য উদ্বৃত্ত। এ কারণে শ্রীলঙ্কায় ৫০ হাজার টন চাল রপ্তানি করা সম্ভব হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-ময়মনসিংহ চার লেনের রাস্তা নির্মাণ। কুড়িল উড়াল সেতু, মিরপুর এয়ারপোর্ট রোড উড়াল সেতু, কর্ণফুলী উড়াল সেতু, যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান উড়াল সেতু নির্মাণ এবং হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়ন। ২০০৯-২০১৩ সময়ে বর্তমান সরকার মোট ছয় লাখ ৭৪ হাজার জনকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে কম খরচে। স্বাস্থ্যসেবার নিমিত্তে ৩৬টি নার্সিং কলেজ স্থাপিত ও শিক্ষার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ২০ হাজার ৫০০টি মাধ্যমিক স্কুল ও মাদরাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এবং ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান। শিক্ষার উন্নয়নে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এক হাজার ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ফলে বর্তমানে শিক্ষার হার ৬১.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (তথ্য : বিবিএস)। ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয়ে এক লাখ ৩০ হাজার বর্গকিলোমিটার সমুদ্র সীমানা ও ১২টি গ্যাস কূপ বাংলাদেশের স্থায়ী দখলে চলে আসে। ১৯৭৪ সালের ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালের ৩১ মার্চে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ৬২ বছর পর বন্দিজীবন থেকে মুক্তি পায় ছিটমহলবাসী। আওয়ামী লীগ সরকার আমলে প্রায় ১৪ হাজারটি কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক সেন্টার চালু করা হয়েছে। ২০০৬ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতো তিন হাজার ৬৩২ মেগাওয়াট ও ২০১৩ সালে আট হাজার ৫৩৭ মেগাওয়াট এবং ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে এসে তা দাঁড়ায় প্রায় ১৬ হাজার মেগাওয়াটে। ফলে বর্তমানে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বিদ্যুৎ লোডশেডিং তুলনামূলক অনেক কম। অন্যদিকে বছরের প্রথম মাসে বিনা মূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া এবং মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ৩৫টি মাদরাসাকে আইসিটি ল্যাবসহ মডেল মাদরাসায় উন্নীতকরণ এবং ১০০টি মাদরাসায় ভোকেশনাল কোর্স চালুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য ৪০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি উচ্চশিক্ষার বিধান রাখা হয়েছে। ২৫ হাজার ২৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং এক লাখ ৩০ হাজার ১০০ জন শিক্ষককে চাকরিতে সরকারীকরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় ৭৫ লাখ নারীকে মাসে ৩০ কেজি হারে খাদ্যশস্য প্রদান ও ওএমএস, ভিজিডি, ভিজিএফ, টিআর, কাবিখা এবং খাদ্য নিরাপত্তা খাতে তিন হাজার ৯৪৫ কোটি টাকা ব্যয় করছে বর্তমান সরকার। মাতৃত্বকালীন ছুটি চার মাস থেকে ছয় মাস করা হয়েছে। সাক্ষরতার হার ২০০৬ সালে ৫১.৯ শতাংশ, ২০১৩ সালে ৬৫.৪৪ শতাংশে। দারিদ্র্যের হার ২০০৬ সালে ৪১.৫ শতাংশ, ২০১৩ সালে ২৯.৩৩ শতাংশ। কর্মসংস্থান ২০০৬ সালে ২৪ লাখ, ২০১৩ সালে ৭৫ লাখ। পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বের অবস্থান চতুর্থ এবং ২০১৩ সালে দ্বিতীয় স্থানে। ইন্টারনেট গ্রাহকসংখ্যা ২০০৬ সালে ৫৭ লাখ, ২০১৩ সালে চার কোটি এবং ২০১৮ সালে আট কোটি ৮৩ লাখ জন। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০০৬ সালে এক হাজার ৬৬২ টাকা, ২০১৩ সালে তিন হাজার টাকা এবং ২০১৮ সালে এসে তা দাঁড়ায় ৯ হাজার টাকায়। রপ্তানি আয় ২০১৮ (জানুয়ারি) ছিল ২৩ হাজার ৮৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বৈদেশিক মুদ্রার বর্তমান রিজার্ভ ৩৩ হাজার ৩৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। হাসপাতালের সংখ্যা ২০০৬ সালে এক হাজার ৬৮৩টি, ২০১৩ সালে দুই হাজার ৫০১টি। উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশ রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ নিম্নমধ্যবিত্ত আয়ের দেশ (LDF) থেকে 'উন্নয়নশীল' দেশের কাতারে উপনীত হয়েছে। এসব অবদান ও উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষতা, আন্তরিকতা, দেশপ্রেম, দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সততার কারণেই সম্ভব হয়েছে। সে কারণে বিশ্বের ১৭৩টি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সততার মানদণ্ডে ৮৭ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে এবং উন্নয়নের সব সূচক পূরণ হওয়ায় বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেছেন। ২০১৫ সালে ফোর্বস ম্যাগাজিনের ভাষ্য মতে, বিশ্বের ক্ষমতাধর নারীর তালিকায় সম্মানের স্থান এবং বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় রয়েছেন তিনি। এ অর্জন ও উন্নয়নগুলো বাঙালি জাতিকে সম্মানের ক্ষেত্রে অনেক উচ্চতায় স্থান করে দিয়েছে। মূলকথা হলো, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা হ্রাস পেলে এবং সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতার আন্তরিকতা বৃদ্ধি পেলে ভবিষ্যতে এ দেশকে অনেক দেশই মডেল হিসেবে গ্রহণ করবে।

বিশ্বের ১৭৩টি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সততার মানদণ্ডে ৮৭ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে এবং উন্নয়নের সব সূচক পূরণ হওয়ায় বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেছেন। ২০১৫ সালে ফোর্বস ম্যাগাজিনের ভাষ্য মতে, বিশ্বের ক্ষমতাধর নারীর তালিকায় সম্মানের স্থান এবং বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় রয়েছেন তিনি। এ অর্জন ও উন্নয়নগুলো বাঙালি জাতিকে সম্মানের ক্ষেত্রে অনেক উচ্চতায় স্থান করে দিয়েছে। মূলকথা হলো, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা হ্রাস পেলে এবং সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতার আন্তরিকতা বৃদ্ধি পেলে ভবিষ্যতে এ দেশকে অনেক দেশই মডেল হিসেবে গ্রহণ করবে।

লেখক : চেয়ারম্যান ও ডিন, মেডিসিন, সার্জারি অ্যান্ড অবস্টেট্রিকস বিভাগ, ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিম্যাল সায়েন্স অনুষদ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

ডা. মো. ফজলুল হক ▷

মাদক সমস্যার প্রতিরোধ জরুরি

পাত্রীর অভিভাবক সব সময়ই চিন্তায় থাকেন—তাঁর মেয়ের বর যেন মাদকসেবী না হয়। গরিব, কিন্তু চরিত্রবান হলেও আপত্তি নেই। কয়েক লাখ পরিবার ধ্বংস ও লক্ষাধিক বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছে মাদকের কারণে। আমার এক শিক্ষকের (বিশ্ববিদ্যালয়ের) মাদকসেবী সন্তান মাদকের টাকা না দেওয়ার কারণে লাঠির আঘাতে মাকে হত্যা করে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিশেষ করে র‍্যাবের অভিযান অব্যাহত থাকায় মাদক চোরাচালানি ও কারবারিরা জীবনের ভয়ে আত্মগোপন করছে। নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন, জীবন ও জীবিকার জন্য একজন মানুষের কত টাকার প্রয়োজন? এ কারবার ছাড়াও অনেক ভালো ও সম্মানজনক ব্যবসা আছে। প্রত্যেক মাদক কারবারি নিজের সন্তানদের মাদক থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে, অথচ অন্যের সন্তানদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

মাদক একটি মৃত্যুফাঁদ। এ ফাঁদে যে একবার পা দেবে তার অকালমৃত্যু অবধারিত। একজন মাদকসেবী তার মা-বাবার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। সে মা-বাবাকে হত্যা করতে একটুও দ্বিধা বোধ করে না, যার অসংখ্য প্রমাণ এ দেশেই আছে। সে তার নিজের জীবনের জন্য পীড়াদায়ক, সমাজের জন্য আতঙ্ক, মা-বাবার জন্য বোঝা ও ভয়ের কারণ, রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতির কারণ। মাদকের অর্থ জোগান দিতে মা-বাবার ওপর নিয়মিত চাপ থাকে। টাকা না পেয়ে চুরি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, ডাকাতি, বাসাবাড়ির আসবাবপত্র, স্বর্ণালংকারসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রি করে অর্থ জোগাতে মরিয়া হয়ে ওঠে। যৌতুক আদায়ের নামে শ্বশুর ও স্ত্রীর ওপর অত্যাচার মাদকসেবীদের একটি সাধারণ কৌশল। একটি দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করার অন্যতম মাধ্যম মাদক। ইসলাম ধর্ম মতে, মাদক সেবনকে হারাম করা হয়েছে। (সুরা মায়েদা, ৯০; সুরা নিসা, ৪৩ ও বুখারি শরিফ-৫১৯৭)

ইয়াবা এখন এক আতঙ্কের নাম। ইয়াবা উৎপাদনকারী দেশ মিয়ানমার হওয়ায় বাংলাদেশ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বুদ্ধি-বিবেক যাদের কম, তারাই এ পথে পা বাড়ায়। সচেতন ব্যক্তি, যাঁদের সামান্যতম জ্ঞান আছে এবং যাঁরা ভালো-মন্দ বোঝেন তাঁরা স্বেচ্ছায় মৃত্যুর ঝুঁকিতে পা বাড়াবেন না, এটাই স্বাভাবিক।

আশির দশক থেকেই ফেনসিডিল ও হেরোইন চোরাই পথে ভারত থেকে এ দেশে আসত, এখনো আসছে। ইয়াবা প্রবেশ করছে মিয়ানমার থেকে। ২০০৮ সালে ৩৬ হাজার ইয়াবা বড়ি ধরা পড়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে। ২০০৮ সাল থেকে এযাবৎ ১০ কোটির বেশি ইয়াবা বড়ি জব্দ করা হয়েছে। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যার যাতায়াতের জন্য রয়েছে বিশাল সমুদ্রবন্দর ও জলসীমানা। নদী-নালা, খাল-বিল হয়ে প্রবেশ করে শহর-বন্দরে। মিয়ানমার থেকে নৌকায় নাফ নদ পার হলেই কক্সবাজার। সেখান থেকে সহজেই ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে।

বর্তমানে বাংলাদেশে মাদক কারবারির সংখ্যা ১৪ হাজারের বেশি এবং মাদকসেবীর সংখ্যা প্রায় ৭০ লাখ, যাদের মধ্যে কিছু স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, এমনকি দু-একজন শিক্ষকও খুঁজে পাওয়া যায়। মাদক আমদানিতে প্রতিবছর প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। প্রায় ৬০ শতাংশ মাদকের অর্থ জোগাতে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা, ধর্ষণসহ বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত রয়েছে ওই শ্রেণিটি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীর সেনাদের ঘুম হারাম করে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মেথামেফেটামিন (ইয়াবা) ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধের পর এটি যখন সাধারণ মানুষের নাগালে চলে যায় এবং কয়েক বছরের মধ্যেই মাদকসেবীরা অকালে মৃত্যুর পথযাত্রী হতে থাকে। তখন ইয়াবা জাপানে নিষিদ্ধ করা হলেও ছড়িয়ে পড়ে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল নামে খ্যাত মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনসহ বিভিন্ন দেশে। ১৯৭০ সালে নিয়ন্ত্রিত পদার্থ আইনে মেথামেফেটামিন (ইয়াবা) ব্যবহার জাপানে নিষিদ্ধ করা হয়। জাপানিদের মতে, ইয়াবা আণবিক বোমার চেয়েও মারাত্মক। ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট ফ্যাটম্যান ও লিটল বয় নামের দুটি আণবিক বোমা আঘাত হানে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে। ফলে দুই লাখ ১৪ হাজারের বেশি জাপানি সেকেন্ডের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। এক অর্থে ইয়াবা আণবিক বোমার চেয়েও মারাত্মক। কারণ মাদকসেবী নিজে ধুঁকে ধুঁকে মরে, অন্যের ক্ষতি করে, মা-বাবা ও সমাজের জন্য বোঝা, সমাজকে কলুষিত করে এবং রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও সুনামকে হেয় প্রতিপন্ন করে।

মিয়ানমার ইয়াবা তৈরি ও সরবরাহে বিশ্বে প্রথম স্থানে রয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তারাই আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। বিভিন্ন দেশে ছদ্মনামে ইয়াবা; যেমন—পাগলা মাদক (থাইল্যান্ড), ইয়াবা (মিয়ানমার), হর্স ড্রাগ (বার্মিজ), বাবা, ইয়াবা (বাংলাদেশ), বুলবুলিয়া (ভারত), মাগো (চীন) নামে পরিচিত। এতে রয়েছে মেথামেফেটামিন ও ক্যাফিন। মিয়ানমার বিশ্বের বৃহত্তম মেথামেফেটামিন উৎপাদক ও সরবরাহকারী দেশ। তারা বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে ইয়াবা সরবরাহ করে দেশের যুবসমাজকে ধ্বংস করার মহাষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারেই মাদকের ছোবল থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করার জন্য কঠিন ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করছেন। এর আগে জঙ্গিদের কারণে মানুষ মসজিদ ও ঈদের মাঠে যেতেও ভয় পেত, এমনকি বাস ও ট্রেনে যাতায়াতও নিরাপদ ছিল না। বর্তমান সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বনের ফলে মানুষ অনেকটাই চিন্তামুক্ত ও আশাবাদী। বর্তমান সময়ে মাদক কারবারি ও মাদকসেবী ছাড়া প্রায় সবাই এ অভিযানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। জনগণ মাদকের অভিশাপ থেকে নিজের সন্তান, দেশ ও সমাজকে বাঁচাতে চায়। সবার মধ্যে আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারই এ জটিল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম; যার প্রমাণ অনেক।

মাদক একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। সমাধান করতে হবে আন্তর্জাতিকভাবে। মাদক উৎপাদন ও সরবরাহকারী দেশগুলোর তালিকা তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হতে পারে। মাদকের ছোবলে শুধু বাংলাদেশই নয়, সারা বিশ্বই আক্রান্ত। এটি এক ধরনের মারণাস্ত্র, যা একটি জাতিকে স্লো পয়জনের মতো নিঃশেষ করে দিতে পারে। তা-ই হচ্ছে। মাদক নিয়ন্ত্রণে দল-মত-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাইকে একই প্ল্যাটফর্মে অবস্থান নিতে হবে। সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কাজের স্বার্থে সঠিক তথ্য প্রদান করতে হবে। এটি দল-মত-নির্বিশেষে সবারই নৈতিক দায়িত্ব।

লেখক : ডিন, ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিম্যাল সায়েন্স অনুষদ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

মাদক একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। সমাধান করতে হবে আন্তর্জাতিকভাবে। মাদক উৎপাদন ও সরবরাহকারী দেশগুলোর তালিকা তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হতে পারে। মাদকের ছোবলে শুধু বাংলাদেশই নয়, সারা বিশ্বই আক্রান্ত। এটি এক ধরনের মারণাস্ত্র, যা একটি জাতিকে স্লো পয়জনের মতো নিঃশেষ করে দিতে পারে। তা-ই হচ্ছে। মাদক নিয়ন্ত্রণে দল-মত-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাইকে একই প্ল্যাটফর্মে অবস্থান নিতে হবে। সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কাজের স্বার্থে সঠিক তথ্য প্রদান করতে হবে।

ডা. মো. ফজলুল হক ▶

বিভীষিকাময় আগস্টের সেই কালরাত

বঙ্গবন্ধু তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা আর ব্যবহার দ্বারা বাঙালি জাতির হৃদয়কে জয় করেই ১৯৭১ সালে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষকে এক পতাকাতলে সমবেত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর আহ্বান ও ঘোষণায় মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে ৩০ লাখ মানুষ জীবন দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি। ২৩ বছরের পাকিস্তানি শাসন ও শোষণে প্রায় ১৪টি বছরই রাজনৈতিক কারণে জেল খেটেছেন শেখ মুজিবুর রহমান

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এই রাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। ঘাতকরা একই রাতে আরো কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতাকে হত্যা করে। ফলে রাজনৈতিক অঙ্গনে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। বঙ্গবন্ধু ভাবতেন সবাই তাঁর বন্ধু ও মিত্র। এ কারণেই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসীনে থেকেও সাধারণ মানুষের মতোই চলাফেরা করতেন। কুশলবিনিময় করতেন। ভাবতেই পারেননি তাঁর শ্রমের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশে ওই ধরনের হিংস্র স্বভাবের মানুষ থাকতে পারে। বাঙালি জাতি যুগ যুগ ধরে তাদের ঘৃণা করবে এবং ধিক্কার জানাবে। আজও সেই ধানমন্ডির সেই বাড়িটি হত্যাকাণ্ডের চিত্র ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে সাক্ষী হয়ে। রক্তের দাগ আর জীবন হননকারী বুলেটের প্রমাণ বহন করছে দেয়ালগুলো, যা দর্শনার্থীদের মনকে ব্যথিত করে। বঙ্গবন্ধুর পরিধেয় সেই রক্তমাখা পাঞ্জাবি, মুজিব কোট, চশমা, জায়নামাজ আর পবিত্র কোরআন শরিফ সংরক্ষিত রয়েছে যথাস্থানে। ওই নৃশংস হত্যার সংবাদ পেয়ে ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন লন্ডনের এক বাঙালি সাংবাদিকের কাছে লিখিত শোকবাণীতে উল্লেখ করেন, এটা আপনাদের কাছে এক বিরাট ন্যাশনাল ট্র্যাজেডি। আমার কাছে এক পরম শোকাবহ পার্সোনাল ট্র্যাজেডি। বিদেশি সাংবাদিক সিরিল ডান বলেছেন, বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা, যিনি রক্তে, বর্ণে, ভাষায়, কৃষ্টিতে এবং জন্মগত সূত্রেও ছিলেন খাঁটি বাঙালি। ব্রিটিশ মানবতাবাদী আন্দোলনের প্রয়াত মনীষী লর্ড ব্রকওয়ে মন্তব্য করেছিলেন, নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এক অর্থে মহান নেতা, যিনি একই সঙ্গে একটি 'স্বাধীন জাতি ও স্বাধীন ভূমির জনক'। বঙ্গবন্ধু তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা আর ব্যবহার দ্বারা বাঙালি জাতির হৃদয়কে জয় করেই ১৯৭১ সালে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষকে এক পতাকাতলে সমবেত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর আহ্বান ও ঘোষণায় মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে ৩০ লাখ মানুষ জীবন দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি। ২৩ বছরের পাকিস্তানি শাসন ও শোষণে প্রায় ১৪টি বছরই রাজনৈতিক কারণে জেল খেটেছেন শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীন বাংলাদেশে মাত্র অল্প সময়ের জন্য দেশ শাসন ও গড়ার কাজে সময় লাগানোর সুযোগ পেলেও অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের স্বাক্ষর রেখেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর প্রতিটি কথা, চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার মধ্যেই ছিল দেশপ্রেম। বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার মধ্যে ছিল দেশের উন্নয়নের বড় হাতিয়ার কৃষি খাত (কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) যেটি আজ অনেক দূর উন্নয়নের পথে। তিনি বৃদ্ধদের জন্য বয়স্ক ভাতার কথা বলতে গিয়ে বলতেন, বৃদ্ধ বয়সে পকেটে টাকা-পয়সা না থাকলে ছোট ছোট নাতি-নাতনিরাও তাঁর কাছে যেতে চায় না। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর ওই বক্তব্যটি তুলে ধরেন। এ ধরনের মনের মানুষ বর্তমানে বিরল। শেখ মুজিবুর রহমান জেলের প্রকোষ্ঠেই নামাজ পড়তেন, কোরআন শরিফ তিলাওয়াত করে এই পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য হাত তুলে দোয়াও করতেন। তিনি শুধু জনদরদি নেতাই নন, প্রকৃত অর্থেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ আদর্শ মুসলমান। ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। এ ছাড়া তাবলিগ জামাতকেও মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন। আর সে কারণেই ঢাকার কাকরাইল মারকাজ মসজিদের সম্প্রসারণের জন্য মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এক একর জমির অনুমোদন দেন। এর পর বিশ্ব এজতেমার মাঠ ব্যবহারের অনুমতি এবং রাশিয়ায় প্রথম তাবলিগ জামাত প্রবেশের অনুমতির ব্যবস্থা করেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর ওই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় কমিউনিস্ট রাষ্ট্র রাশিয়ায়ও ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশবলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে প্রায় প্রতিটি জেলায় ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে মসজিদের সম্মানিত ইমাম সাহেবদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, বাংলাদেশ সিরাত মসজিদ, হজ পালনের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা, আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে আরব বিশ্বের পক্ষে সমর্থন ও সাহায্য প্রেরণ করেন। ওআইসি সম্মেলনে যোগদান ও মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, ঈদে মিলাদুন্নবী, শবেকদর ও শবেবরাত উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা এবং ওই দিনগুলোতে সিনেমা প্রদর্শন বন্ধ ঘোষণা, মদ-জুয়া-হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধের ঘোষণা এবং শান্তির বিধান করেন বঙ্গবন্ধু। এসব কার্যক্রম ও পদক্ষেপ দ্বারা ইসলামের প্রসারে আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও মুসলিমবিদ্বেষী বিদেশি চক্রের ইঙ্গিতে এ দেশের কিছু বিপথগামী দেশদ্রোহী স্বাধীনতার বিপক্ষের সেনা সদস্যদের হাতে অকালে সপরিবারে আত্মীয়স্বজনসহ জীবন দিতে হলো তাঁকে। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে বিচারকাজ বন্ধ রেখে হত্যাকারীদের উৎসাহিত করা হয়। সেই একই অপশক্তি ২১ আগস্ট ২০০৪ জননেত্রী শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলা চালিয়ে আইভি রহমানসহ প্রায় ২৪ জন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীকে হত্যা এবং প্রায় ৩০০ জনকে আহত করে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আল্লাহর অশেষ রহমতে বেঁচে যান। গ্রেনেড হামলার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই ছিল তাঁকে দুনিয়া থেকে বিদায় দিয়ে বাংলাদেশকে লুটপাটের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা। তাদের আশা পূরণ হয়নি। ষড়যন্ত্রকারীদের অনেকেই দেশ-বিদেশে পলাতক। তাদের বিচারকাজ বিলম্বিত হওয়ায় দেশে ক্রমাগতভাবে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে। উল্লেখ্য, ১৫ ও ২১ আগস্টের ওই ঘটনার পর দেশের মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় ও দ্রব্যমূল্য বাড়তে থাকে এবং ধস নামে অর্থনীতিতে। এটিই শেষ নয়, আরো অনেক ঘটনা ঘটে; যেমন—উদীচী, রমনা বটমূল ও ময়মনসিংহের সিনেমা হলসহ একযোগে ৬৪ জেলায় বোমা হামলা। বিচারকসহ শতাধিক ব্যক্তিতে একই নিয়ম ও একই কায়দায় হত্যা করা হয়। বর্তমানে ওই ষড়যন্ত্রকারীদের অনেকেই বিদেশে অবস্থান নিয়ে আরো সুসংগঠিত হয়ে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। অনেকে ইসলামের নাম ভাঙিয়ে অনৈতিক ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ চালানোর জন্য নানাভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমনকি গভীর বনজঙ্গলেও অস্ত্র কারখানা গড়ে তুলছে। বিভিন্ন সময় অস্ত্র-গোলাবারুদসহ ধরা পড়ছে র‍্যাব ও পুলিশের হাতে। অর্থাৎ তাদের ষড়যন্ত্র আজও থেমে নেই। দেশের চলমান উন্নয়নের চাকা টেনে ধরার জন্য দেশেই শুধু নয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও চলছে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র। ভবিষ্যতে ১৫ ও ২১ আগস্টের মতো অপ্রত্যাশিত ও হিংসাত্মক ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন আর না ঘটে, এটাই সবার প্রত্যাশা। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। তবে প্রয়োজন হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক রাজনীতি পরিহার করে দল-মত ও ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবার উন্নয়নে অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। আমরা যত উন্নয়নের কথাই বলি না কেন, বাংলাদেশের সব সফলতার মূলেই বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের ইতিহাস, রাজনীতির ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যুগ যুগ ধরে ইতিহাস হয়ে থাকবে। সরকারে পালাবদল হতে পারে; কিন্তু বাংলার রূপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীনতার ঘোষক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানকে কেউই অস্বীকার করতে বা মুছে ফেলতে পারবে না। দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে, অর্থনৈতিক মুক্তির স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে এবং বর্তমান ও আগামী নতুন প্রজন্মের শান্তির ঠিকানা গড়ার এখনই উপযুক্ত সময়।

লেখক : প্রফেসর, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

ডা. মো. ফজলুল হক ▷

সমৃদ্ধিশালী জাতি গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চলে সরকারের অর্থায়নে, এ দেশের খেটে খাওয়া মানুষ তথা কৃষক ও শ্রমিকের ঘামঝরা অর্থে, নাগরিকদের ট্যাক্সে এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের আয়ের একটি অংশে। একজন গ্র্যাজুয়েট তৈরিতে সরকারের খরচ হয় ৯০ লাখ থেকে এক কোটি টাকা। মর্যাদার মানদণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। সততার সঙ্গে গবেষণার পথ ধরেই এগোতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি তাঁদের নিজেদের জ্ঞানের গভীরতাও বৃদ্ধি পায়। একটি প্রচলিত কথা আছে—পুরাতন চাল ভাতে বাড়ে। সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের চাকরির বয়সসীমা ৬৫ বছর। অভিজ্ঞ শিক্ষকদের অবসর বলে কিছু নেই। কারণ অবসরের পরও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় চাকরি করার সুযোগ মেলে।

স্বাধীন বাংলাদেশের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৯৭২ সালে ছয়টি স্বনামধন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই সময় শিক্ষার হার ছিল ২৬ শতাংশেরও নিচে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নামগন্ধও ছিল না। লোকসংখ্যা মাত্র সাড়ে সাত কোটি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সেই সময় ছিল না। প্রকৃতির অপার রহস্যের অন্তর্নিহিত তথ্য গবেষণা দ্বারা আহরণ ও উদ্‌ঘাটন করে মানব কল্যাণে তা প্রয়োগ করার কৌশলই হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ৩৯টি। এর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯টি। দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে বেগবান করার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একটি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরো ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেন। তা ছাড়া রয়েছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশবলে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। সব শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয় এফিলিয়েশন সাপেক্ষে নিজ নিজ বিধিমোতাবেক একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম চলে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য সিনিয়র প্রফেসর, মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারণী এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে মঞ্জুরি কমিশনে। উল্লেখ্য, মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে মেধা বিকাশের ওপর জোর দেয় তৎকালীন বঙ্গবন্ধু সরকার। ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার দ্বার উন্মোচিত হয়।

একসময়ের মঙ্গাপীড়িত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রতি নজর দেয় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সরকার। এরই ফলে ১৯৯৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে। এ লক্ষ্যে দেশে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রথম পর্যায়ে ছয়টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হয়। বর্তমানে শিক্ষা বিস্তার ও গবেষণায় ৯টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যথারীতি চলমান রয়েছে। উত্তরবঙ্গে অবস্থিত হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি), যেটি দিনাজপুর জেলা শহর থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তরে দিনাজপুর-রংপুর-ঢাকা এবং দিনাজপুর-পঞ্চগড় বিশ্বরোড সংলগ্ন রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ৮৫ একর জায়গাজুড়ে। যেখানে গড়ে উঠেছে দৃষ্টিনন্দন বেশ কয়েকটি অট্টালিকা, যার মধ্যে আটটি অনুষদ বিদ্যমান। এখানে ৪৩টি বিভাগের অধীনে স্নাতক পর্যায়ে ২২ প্রকার এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৩১ প্রকারের ডিগ্রি প্রদান করা হয়ে থাকে। তা ছাড়া এমবিএ ৪ এবং পিএইচডি ১১ প্রকারের ডিগ্রি প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে দেশি-বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার। স্নাতক পর্যায়ে সাতটি অনুষদের অধীনে চার বছর মেয়াদি (আট সেমিস্টার) এবং ভেটেরিনারি সায়েন্স (ডিভিএম) পাঁচ বছর মেয়াদি (১০ সেমিস্টার) পড়ে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি নিতে হয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক সংখ্যা ২৯৩ জন। আশা করা যায় এ বছরেই শিক্ষক সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়ে যাবে। মোট সাতটি ছাত্রাবাস, যার মধ্যে তিনটি ছাত্রীদের জন্য। ৮ জুলাই ২০০১ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ৩৫ নম্বর আইন হিসেবে হাবিপ্রবি আইন পাস করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ১০ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে চ্যান্সেলর মহোদয় দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ কোনো ব্যক্তিকে চার বছর মেয়াদে ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ দান করেন। এ পর্যন্ত পালাক্রমে পাঁচজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেন। সবাই অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ ও সুনামের সঙ্গে পালন করেন। বর্তমানে প্রফেসর ড. মু. আবুল কাসেম ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ থেকে সুশৃঙ্খলভাবে প্রশাসনিক ও একাডেমিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যতিক্রমধর্মী কিছু কাজ হচ্ছে যেমন—শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণায় বিশেষ নজর দান, সেশন জট কমিয়ে আনা, অবকাঠামোর উন্নয়ন, যোগাযোগের জন্য নতুন বাস, মিনিবাস, মাইক্রোবাস ও অ্যাম্বুল্যান্স ক্রয়। ভেটেরিনারি চিকিৎসায় গ্রামগঞ্জে গিয়ে প্রাণীর চিকিৎসার স্বার্থে অ্যাম্বুলেটরি ক্লিনিক ও বাস ক্রয় করার উদ্যোগ গ্রহণ। মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও কৃষকদের মধ্যে স্বল্পমূল্যে উন্নতমানের পোনা সরবরাহের লক্ষ্যে একটি হ্যাচারি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্র্যাজুয়েটদের চাকরি সন্ধানের নিমিত্তে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

একটি বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান ভালোভাবে চালিয়ে নিতে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সবার সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে উন্নয়নে সহযোগিতা করা। এ ব্যাপারে বর্তমান প্রশাসনের কোনো কমতি নেই বিধায় যথারীতি বিশ্ববিদ্যালয়টি এগিয়ে যাচ্ছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক, একাডেমিক ও গবেষণা সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যেতে প্রত্যেক শিক্ষকের ক্যাম্পাসে অবস্থানের কোনো বিকল্প নেই। এ বিষয়টি সবাইকে গুরুত্বসহকারে অনুধাবন করতে হবে।

“ একটি বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান ভালোভাবে চালিয়ে নিতে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সবার সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে উন্নয়নে সহযোগিতা করা। এ ব্যাপারে বর্তমান প্রশাসনের কোনো কমতি নেই বিধায় যথারীতি বিশ্ববিদ্যালয়টি এগিয়ে যাচ্ছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক, একাডেমিক ও গবেষণা সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যেতে প্রত্যেক শিক্ষকের ক্যাম্পাসে অবস্থানের কোনো বিকল্প নেই। এ বিষয়টি সবাইকে গুরুত্বসহকারে অনুধাবন করতে হবে।

লেখক : চেয়ারম্যান ও ডিন, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

মেইল-ইমেইল

চিঠি পাঠান কালের কণ্ঠ'র ঠিকানায়
ই-মেইল : editorial@kalerkantho.com

১৬ই ডিসেম্বর/১৯৯২

অর্থনীতি

বিষ প্রয়োগে প্রতিবছর ৪০ কোটি টাকার গো-সম্পদ হত্যা

ডাঃ মোঃ ফজলুল হক

একজন গরীব কৃষক অনেক স্বপ্ন সামনে রেখে একটি গাভী পুষছে দুধ খাবে, দুধ বিক্রি করে অভাব ঘুচাবে এ আশা বা প্রত্যাশা নিয়ে। কিন্তু অসাধু চামড়া সংগ্রহকারী (মুচি) বিষের বিনিময়ে গো-হত্যা করে এমনি একটি কৃষক পরিবারকে করে সর্বস্বান্ত। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের জঘন্য অমানবিক কাজ প্রতিনিয়তই ঘটছে। প্রতিটি গ্রামে গড়ে ১টি করে গরুকে বিষ প্রয়োগ করা হলে ৬৮ হাজার গ্রামে মোট ৬৮ হাজারটি গরুকে বিষ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে প্রতিটি গরুর গড় মূল্য ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা হলে মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। প্রকাশ থাকে যে, মুচি বা অসাধু চামড়া সংগ্রহকারী কখনই কম মূল্যমানের বাছুর গরু-মহিষকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে না অর্থাৎ বড় ও স্বাস্থ্যবান গরু-মহিষকেই শুধু মাত্র বিষ প্রয়োগে হত্যা করে চামড়া সংগ্রহ করে থাকে। এর ফলে ইতিমধ্যেই অনেক কৃষক বা গাভী পালনকারী নিরুৎসাহিত হয়েছেন। একদিকে যেমন সুষম খাদ্যের অভাব অন্যদিকে ব্যাপকভাবে বিষ ক্রিয়ার গো-হত্যা এজন্য দায়ী।

বর্তমানে উন্নত জাতের একটি গাভী দৈনিক ৮ লিটার হতে ২০ লিটার-এর অধিক দুধ দিয়ে থাকে। এ ধরনের একটি গাভীর মূল্য ২৫ হাজার হতে ৭৫ হাজার টাকা। প্রতি লিটার দুধের গড় মূল্য ১৫/- (পনের) টাকা হলে প্রতিমাসে প্রতিটি গাভী হতে প্রায় ৩,৫০০/-টাকা হতে ১০,৫০০/- (দশ হাজার পাঁচশত) টাকা আয় হয়ে থাকে। অথচ এক টাকা মূল্যমানের বিষই যথেষ্ট এ ধরনের একটি গাভীর জীবনকে কেড়ে নিতে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে গো-হত্যা করে চামড়া সংগ্রহ করার জন্য একটি সংঘবদ্ধ দল বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি এলাকায়ই রয়েছে। এদের মধ্যে কেউ বা বিষ প্রয়োগের দায়িত্বে, কেউ কেউ চামড়া ছাড়ানোর কাজে এবং কেউ কেউ চামড়া ছাড়ানোর সময় মালিক কর্তৃক চামড়া দিতে অস্বীকৃতি জানালে বা পুঁতে রাখতে চাইলে তাকে অনুরোধ করে মুচিকে চামড়া সংগ্রহে সহায়তাদান করে থাকে। অন্যদিকে কোন সময় মুচি বিপাকে পড়লে তাকে সহায়তা করে থাকে এই তৃতীয় ব্যক্তিটি। আপাত দৃষ্টিতে তৃতীয় ব্যক্তিকে নিরপেক্ষ মনে হলেও পরোক্ষভাবে মুচির দলের লোক যদিও সে ঐ এলাকার বাসিন্দা। এরা সবাই মৃত গরুর চামড়ার বিক্রিলব্ধ অর্থের ভাগ পেয়ে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, এদের এজেন্টরা গ্রামে-গঞ্জে ফেরী করার ছলে জিনিসপত্র কেনা-বেচার মধ্য দিয়ে গবাদিপশুকে বিষ প্রয়োগ করার সংবাদ পাওয়া গেছে। এমনিভাবে অভিনব কায়দায় যুগ যুগ ধরে এদেশের কৃষকদের করছে গোয়াল শূন্য এবং গাভী পালনে আগ্রহী লোকদের বিষ প্রয়োগে গো-হত্যার মাধ্যমে করছে নিরুৎসাহিত। গরুর মালিক মনে করে তার গরুটি পাতলা পায়খানা বা রোগে মারা যাচ্ছে। এ ভ্রান্ত ধারণা যুগের পর যুগ চলে আসছে।

জনসাধারণের মধ্যে আরও একটি ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে, যেমন : মৃত গরু-মহিষের চামড়া ব্যবহার করা বা বিক্রি করা নাজায়েজ। আসলে তা নয়। মৃত গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া ইত্যাদির চামড়া ছাড়ানোর পর লবণ মেখে শুকিয়ে বিক্রিলব্ধ অর্থ হালাল (প্রমাণ : হানাফী মাজহাবের প্রসিদ্ধ ফেকার কিতাব, হেদায়া প্রথম খণ্ড পবিত্রতা প্রসংগ-২৪ পৃষ্ঠা এবং উর্দু বেহেশতী জেওর ১ম খণ্ড(তিপিখওহ্যা) ১১৯ পৃষ্ঠা (কৃত মাও : আশরাফ আলী থানভী (রহঃ))। সুতরাং আমাদের অজ্ঞতার কারণেই যুগ যুগ ধরে মুচিরা এদেশের গো-সম্পদ ধ্বংসের মাধ্যমে চামড়া সংগ্রহ করে চলছে।

যে সকল গবাদিপশু তড়কা, বাদলা বা গলাফুলা রোগে মারা যায় সেগুলো মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে। অন্য কারণে মৃত গরু-মহিষের চামড়া যাতে মালিক সংগ্রহ করতে পারে সে জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে হবে, ফলে ৯০% গবাদিপশু অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে বলে আমার ধারণা।

শহর এলাকার চেয়ে শহরতলী বা গ্রাম অঞ্চলেই বিষক্রিয়ার প্রকোপ অনেক বেশী। গ্রামের লোক সাধারণত নিরীহ এবং সরল প্রাণের। বিষক্রিয়ার কথা অবগত হওয়ার পরও যারা মুচির বিরুদ্ধে কেস করতে বা প্রতিবাদ করতে পারে না বা পারলেও কোন ঝামেলায় জড়াতে চায় না, সে এলাকায়ই এ ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে। গো-সম্পদ হ্রাসের আরও অনেক কারণের মধ্যে গরু চুরি এবং চোর কর্তৃক জবাই করে চামড়া ছাড়ানোও দায়ী। উদাহরণ স্বরূপ আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি, বিভিন্ন কর্মস্থলে যেমন মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ এবং বর্তমানে কর্মস্থলে নরসিংদীর বিভিন্ন গ্রামে বিষ প্রয়োগে গো-হত্যার প্রবণতা অনেক বেশী। আমার জানা মতে নরসিংদী জেলায় প্রতিবছর কম হলেও এক হাজার গরুকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গত ফেব্রুয়ারী/৯০-তে নরসিংদী জেলার মনোহরদী থানার ৪/৫টি গ্রামে ২/৩ দিনে প্রায় ৩ শ' গরু মারা যায়। কর্তৃপক্ষ মৃত গরুর ভিসারা কেন্দ্রীয় পশু রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারে ঢাকায় প্রেরণ করে কেমিক্যাল টেষ্ট করে ৫৩০(৪) তাং-১৯-২-৯০" মোতাবেক আরসেনিক বিষের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। এ সংবাদ ৪ ঠা মার্চ/৯০ তাং- দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়। বিষ প্রয়োগের কথা অবগত হয়ে এলাকার জন-সাধারণ উত্তেজিত হয়ে কয়েকজন মুচিকে ধরে ফেলে এবং তারা বিষ প্রয়োগে গো-হত্যার কথা স্বীকার করে। এদের বিচারের জন্য স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-এর নিকট সোপর্দ করা হয়। তাছাড়াও নরসিংদী থানায় একটি গাভীর ভিসারা সিডিআইএল-এ পাঠিয়ে স্মারক নং-১৪১১ তাং- ২৯-৫-৯০ মোতাবেক আরসেনিক বিষের উপস্থিতি পাওয়া যায় এবং রায়পুরা ও বেলাব থানায় একই ধরনের বিষের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এমনিভাবে মানিকগঞ্জ জেলার ডাকুলী নামক গ্রামেও মুচিকে হাতে-নাতে ধরে বেদম প্রহার করা হয়। এতে ধৃত মুচি সবার নিকট স্বীকার করে যে, তাদের একটি সংঘবদ্ধ চক্র রয়েছে, যারা বিভিন্ন এলাকায় বিষ প্রয়োগে গো-হত্যা করে চামড়া সংগ্রহের মাধ্যমে বাজারে বিক্রি করে থাকে। জরিপ করে দেখা গেছে, মুচিরা যে এলাকায় বাধাগ্রস্ত হয়েছে বা গণপিটুনি খেয়েছে সেখানেই গরু মরা বন্ধ হয়েছে।' এমনিভাবে প্রতিনিয়তই দেশের কোন না কোন স্থানে এ ধরনের বহু সংখ্যক ঘটনা ঘটে চলেছে।

বিষক্রিয়ার উপসর্গ

বিভিন্ন বিষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ। বিষের প্রধান উপসর্গ হল শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত হ্রাস পাবে অর্থাৎ ৯১ ফাঃ-এর নীচে নেমে আসবে, কোন সময় মুখ দিয়ে লালা নির্গত হবে এবং পায়খানা পানির মত পাতলা হবে। পায়খানার সাথে বিজল বা মিউকাস এবং ছিটে ছিটে রক্ত মিশ্রিত চর্বির ন্যায় বেরিয়ে আসবে। শরীরের লোম দাঁড়িয়ে থাকবে। কোন কোন সময় পেটের ব্যথায় ছটফট করতে থাকবে। অনেক সময় ঝিমানি বা দুশ্চিন্তের ভাব থাকবে এবং মৃত্যুর আধ-ঘন্টা পূর্বে ঘাড় বাকা ও চক্ষু নীল রং ধারণ করে শেষবারের মত ২/৩ দফায় পানির মত পায়খানা এবং নাক, মুখ দিয়ে পাকস্থলীর তরল খাদ্যদ্রব্য বের হয়ে হাত-পা দাপড়িয়ে দাপড়িয়ে মারা যাবে। এ ধরনের উপসর্গ দেখে আপনি বিষের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবেন।

সর্বশেষে কর্তৃপক্ষের নিকট আমার প্রস্তাব গো-সম্পদ রক্ষার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন :

১। রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা ও সংবাদপত্রে যথাক্রমে স্লাইড ও বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষ প্রয়োগের ব্যাপারে জন-সাধারণকে সতর্ক করা।

২। বিষ প্রয়োগে গো-হত্যাকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা।

৩। চামড়া ছাড়ানোর ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা একান্ত প্রয়োজন। যেমন : কোন এলাকায় গবাদিপশু মারা গেলে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত চৌকিদার, দ্বারা চামড়া সংগ্রহ করে বিক্রিলব্ধ অর্থ স্ব স্ব ইউনিয়নের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা যেতে পারে। এর ফলে একদিকে যেমন ইউনিয়ন পরিষদের আয় বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে মৃত গরুর চামড়া না পাওয়াতে মুচি স্ব-ইচ্ছায় বিষ প্রয়োগ হতে বিরত থাকবে।

৪। মৃত গবাদিপশুর মালিক গরুর চামড়া ছাড়ানোর পর লবণ মেখে সামান্য শুকিয়ে বিক্রি করে বিক্রিলব্ধ অর্থ নিজের জন্য অথবা আত্মীয়-স্বজনদের স্বার্থে ব্যয় করতে পারেন। এ পদ্ধতিতে চামড়া সংগ্রহ করাটা ইসলাম সম্মত।

৫। উপরোল্লিখিত বিষয়ে তথ্য শাখা, উপ পশুসম্পদ বিভাগ কর্তৃক সাইন বোর্ড ও পোস্টারিং আকারে যথাক্রমে, অফিস-আদালতে ও রাস্তায় রাস্তায় প্রদর্শন করে জনসাধারণকে অবগত করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে একদিকে যেমন গো-হত্যা হ্রাস পাবে অন্যদিকে চামড়ার সুষ্ঠু সংরক্ষণ হতে পারে।

লেখক : ভিএস
নরসিংদী পশু হাসপাতাল

বি:দ্র: এটি আমার জীবনের প্রথম লেখা এবং এ লেখাটি ১৯৯২ সালে অর্থনীতির পাতায় শ্রেষ্ঠ-লেখা হিসেবে বিবেচিত হয়। এ লেখার মাধ্যমে জন সচেতনতা তৈরী হওয়াতে বিষ প্রয়োগে গো-হত্যা বন্ধ হয় ফলে প্রতি বছর প্রায় ১০০ কোটি টাকার গবাদিপ্রানি অকাল-মৃত্যু

একুশে টেলিভিশন লিমিটেড
পরিবর্তনে অঙ্গীকারবদ্ধ
(https://ekushey-tv.com/)

হাবিপ্রবি'র রেজিস্ট্রার হলেন অধ্যাপক ডা.ফজলুল হক

হাবিপ্রবি সংবাদদাতা

প্রকাশিত : ০৬:৩২ পিএম, ৩০ মার্চ ২০১৯ শনিবার

হাবিপ্রবি'র রেজিস্ট্রার হলেন অধ্যাপক ডা.ফজলুল হক

দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরেনারি এন্ড এনিম্যাল সাইন্স অনুষদের মেডিসিন সার্জারী এন্ড অবস্ট্রেটিক্স বিভাগের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির প্রধান উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হক ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মু. আবুল কাসেম এর অনুমোদনক্রমে বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ ২০১৯) সদ্য বিদায়ী রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মো. সফিউল আলম স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এই তথ্য জানানো হয়। এই আদেশের মাধ্যমে প্রফেসর ড. মো. সফিউল আলম এর স্থলাভিষিক্ত হবেন প্রফেসর ডা.

মো. ফজলুল হক।

অফিস আদেশে বলা হয়, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (চুক্তি-ভিত্তিক) পদে নিযুক্ত প্রফেসর ড. মো. সফিউল আলমকে (২৮ মার্চ) অপরাহ্ন হতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং সেই সঙ্গে মেডিসিন সার্জারী এন্ড অবস্ট্রেটিক্স বিভাগের প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হককে তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-বিধান, সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব থাকা অবস্থায় প্রাপ্য সুযোগ্য-সুবিধা মেনে চলার প্রেক্ষিতে ২৯ মার্চ হতে রেজিস্ট্রারের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হলো।

প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হক ১৯৫৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি বর্তমান ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার মোলামের টেক গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে সদরপুর, ফরিদপুর আমিরাবাদ পাইলট ইনস্টিটিউটশন থেকে এস এস সি এবং ১৯৭৫ সালে ফরিদপুর ইয়াসিন কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে ডি.ভি.এম (ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন) নিয়ে অনার্স এবং ১৯৮০ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগ থেকে এম.এস.সি. পাশ করেন। এরপর জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৬-১৯৯৭ পর্যন্ত পিজিটি করেন। ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগের ফরিদপুর জেলার সদরপুর থানার সহ-সভাপতি এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী সদস্য ছিলেন।

কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি ১৯৮৩ হতে ২০০৮ সালের ১১ মার্চ পর্যন্ত বিসিএস লাইভস্টক সার্ভিসে কর্মরত ছিলেন। এরপর ২০০৮ সালে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন সার্জারী এন্ড অবস্ট্রেটিক্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৯ সালে এসে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০১২ সালে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হোন।

এছাড়াও তার গবেষণা ধর্মী আর্টিকেলঃ ২১টি, "ইতিহাস কথা বলে পূর্বাপর '৭১" নামক একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ দৈনিক জাতীয় কালের কন্ঠ ,যুগান্তর,ইত্তেফাক সহ বিভিন্ন পত্রিকায় উপ সম্পাদকীয় পাতায় প্রায় ১০০টির বেশি বিভিন্ন সমসাময়িক ঘটনায় নিয়ে লেখাও প্রকাশিত হয়েছে।তিনি মাদার তেরেসা ,এম এ জি ওসমানী ,হাজী মোহাম্মদ মহসিন ও আর্মস পুরুস্কার সহ বিভিন্ন সম্মাননা পদকেও ভূষিত হয়েছেন । এছাড়া তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কেআই/

ভোরের কাগজ

হাবিপ্রবির নতুন রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা.ফজলুল হক

প্রকাশিত হয়েছে: মার্চ ৩০, ২০১৯ , ১:০৫ অপরাহ্ণ | আপডেট: মার্চ ৩০, ২০১৯, ১:০৫ অপরাহ্ণ

কাগজ অনলাইন প্রতিবেদক

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ

দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরেনারি এন্ড এনিম্যাল সাইন্স অনুষদের মেডিসিন সার্জারী এন্ড অবস্ট্রেটিক্স বিভাগের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির প্রধান উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর ডা.মো.ফজলুল হক ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড.মু.আবুল কাসেম এর অনুমোদনক্রমে বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ ২০১৯) সদ্য বিদায়ী রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড.মো.সফিউল আলম স্বাক্ষরিত এক অফিসে আদেশে এই তথ্য জানানো হয়। এই আদেশের মাধ্যমে প্রফেসর ড.মো.সফিউল আলমেরর স্থলাভিষিক্ত হলেন প্রফেসর ডা.মো.ফজলুল হক।

অফিস আদেশে বলা হয় ,এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (চুক্তিভিত্তিক) পদে নিযুক্ত প্রফেসর ড.মো.সফিউল আলম কে ২৮ মার্চ ২০১৯ তারিখ অপরাহ্ন হতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং সেই সাথে মেডিসিন সার্জারী এন্ড

অবস্ট্রেটিক্স বিভাগের প্রফেসর ডাঃ মো ফজলুল হক কে তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-বিধান ,সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব থাকা অবস্থায় প্রাপ্য সুযোগ্য-সুবিধা মেনে চলার প্রেক্ষিতে ২৯ মার্চ ২০১৯ হতে রেজিস্ট্রারের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হলো ।

ডা.ফজলুল হক ২০০৮ সালে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববদ্যালয়ে মেডিসিন সার্জারী এন্ড অবস্ট্রেটিক্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন।২০০৯ সালে এসে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০১২ সালে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হোন।

নতুন দায়িত্ব পাওয়ার ব্যাপারে ডা.হক জানান, ইতোপূর্বে শতভাগ সততার মাধ্যমে আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি।আমাকে নতুন করে যে দায়িত্ব দেয়া হলো তা যেন আমি অতীতের ন্যায় সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারি সে জন্য সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি ।সর্বোপরি আমি বলতে চাই সততা, সেবা, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার মধ্যেই জীবনের সফলতা এবং ইহকাল ও পরকালের শান্তি নিহিত।

সম্পাদক : শ্যামল দত্ত

© ভোরের কাগজ 2002 - 2017

প্রকাশক : সাবের হোসেন চৌধুরী ।মুদ্রাকর: তারিক সুজাত

কর্ণফুলী মিডিয়া পয়েন্ট, তৃতীয় তলা, ৭০ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, (নিউ সার্কুলার রোড, মালিবাগ), ঢাকা-১২১৭ ।

ফফোন: ৯৩৬০২৮৫, ৮৩৩১০৭৪ ফ্যাক্স: ৯৩৬২৭৩৪, সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন : ৮৩৩১৮০৬ ।ইমেইল: info@bhorerkagoj.info

THE DAILY CAMPUS

হাবিপ্রবির নতুন রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পেলেন অধ্যাপক ফজলুল হক

২৯ মার্চ ২০১৯, ১৭:৫৩

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হক।

দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) নতুন রেজিস্টার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি এন্ড এনিম্যাল সাইন্স অনুষদের মেডিসিন সার্জারি এন্ড অবস্ট্রেটিক্স বিভাগের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির প্রধান উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হক।

বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মু. আবুল কাসেমের অনুমোদনক্রমে সদ্য বিদায়ী রেজিস্টার প্রফেসর ড. মো. সফিউল আলম স্বাক্ষরিত এক অফিসে আদেশে এই তথ্য জানানো হয়। এই আদেশের মাধ্যমে সাবেক রেজিস্টার প্রফেসর ড. মো. সফিউল আলমের স্থলাভিষিক্ত হলেন প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হক।

অফিস আদেশে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার (চুক্তিভিত্তিক) পদে নিযুক্ত প্রফেসর ড. মো. সফিউল আলমকে ২৮ মার্চ ২০১৯ তারিখ অপরাহ্ন হতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং সেই সাথে মেডিসিন সার্জারি এন্ড অবস্ট্রেটিক্স বিভাগের প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হককে তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-বিধান ,সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব থাকা অবস্থায় প্রাপ্য সুযোগ্য-সুবিধা মেনে চলার প্রেক্ষিতে ২৯ মার্চ ২০১৯ হতে রেজিস্টারের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হলো।

প্রফেসর ফজলুল হকের কর্ম জীবনের শুরুতে তিনি ১৯৮৩ হতে ২০০৮ সালের ১১ মার্চ পর্যন্ত বিসিএস লাইভস্টক সার্ভিসে কর্মরত ছিলেন।এরপর ২০০৮ সালে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন সার্জারি এন্ড অবস্ট্রেটিক্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৯ সালে এসে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০১২ সালে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন।

লেখালেখিতেও প্রফেসর ফজলুল হকের অবস্থান রয়েছে। তার গবেষণা ধর্মী আর্টিকেল- ২১টি, 'ইতিহাস কথা বলে পূর্বাপর ৭১' নামক একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। দেশের জাতীয় দৈনিক কালের কণ্ঠ, যুগান্তর, ইত্তেফাকসহ বিভিন্ন পত্রিকায় (উপ সম্পাদকীয়) পাতায় প্রায় ১০০টির বেশি বিভিন্ন সমসাময়িক ঘটনায় নিয়ে লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মাদার তেরেসা, এম এ জি ওসমানী, হাজী মোহাম্মদ মহসিন ও আর্মস পুরস্কার সহ বিভিন্ন সম্মাননা পদকেও ভূষিত হয়েছেন।

প্রফেসর ডা. ফজলুল হক ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৮৬ সালে মাদারীপুর জেলায় সরকারী চাকুরীতে কর্মরত থাকাকালীন আন্তঃজেলা ডাকাত দলের দুই সদস্য হাতে নাতে ধরে পুলিশে সোপর্দ ও ৮ ডাকাতের ১০ বছর কারাদণ্ডের ঘটনায় বীরত্বের সম্মাননা হিসেবে ০১ (একটি) SSBL GUN লাইসেন্সের অনুমোদন পেয়েছেন। তিনি কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) ও বিভিএর আজীবন সদস্য, বিভিএর নির্বাচিত সদস্য, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি এর ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য।

নতুন দায়িত্ব পাওয়ার ব্যাপারে ডা. হক জানান, ইতোপূর্বে শতভাগ সততার মাধ্যমে আমার উপর অর্পিত যে দায়িত্ব তা পালনের চেষ্টা করেছি। আমাকে নতুন করে যে দায়িত্ব দেয়া হলো তা যেন আমি অতীতের ন্যায় সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারি সে জন্য সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি। সর্বোপরি আমি বলতে চাই সততা, সেবা, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার মধ্যেই জীবনের সফলতা এবং ইহকাল ও পরকালের শান্তি নিহিত।

উপদেষ্টা সম্পাদক: মাহবুব রনি

১২৮/১, পূর্ব তেজতুরি বাজার, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
ফোন: +৮৮০১৭১২৪৬৮৮৯৭, ইমেইল: news@thedailycampus.com

www.kalerkantho.com
কালের কণ্ঠ ১৫
১৭ সেপ্টেম্বর ২০১০, শুক্রবার

মুক্তধারা

ডা. মো. ফজলুল হক ▸

অ্যানথ্রাক্স গবাদিপশুর জন্য ক্ষতিকারক কিন্তু মানুষের জন্য নয়

এ মুহূর্তে গবাদিপশুর বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে দুজন ভেটেরিনারি ডাক্তার এবং প্রয়োজনীয় ফিল্ড স্টাফ নিয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা জনসাধারণের নাগালে আনা একান্ত প্রয়োজন

অ্যানথ্রাক্স (তড়কা) একটি জীবন হননকারী ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। এ রোগের জীবাণু ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস মাটিতে সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং অনাবৃষ্টির পর অতিবৃষ্টিতে মাটিসহ ঘাসের সঙ্গে গবাদিপশুর শরীরে প্রবেশের পর বিভাজনের মাধ্যমে লাখ লাখ ব্যাকটেরিয়া জন্মগ্রহণ করে মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়। অ্যানথ্রাক্স শুধু গরু-মহিষেই নয়; ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, শূকর, বাঘ, ভালুক, এমনকি হাতিতেও রোগের সৃষ্টি করে। এ রোগ যেহেতু প্রাণিসম্পদ থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়, সে কারণে একে জেনেটিক ডিজিজ বলা হয়। সংক্রমণের মাধ্যম তিনটি, যথা—শ্বাসনালি, খাদ্যনালি ও সরাসরি চর্মের ক্ষতের মাধ্যমে। মশা-মাছিও রোগাক্রান্ত গবাদিপশু থেকে রক্ত গ্রহণ করে মানুষের শরীরে রোগের জীবাণুর প্রবেশ ঘটায়। আমাদের মতো অনুন্নত দেশে অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে রাখা তো দূরের কথা, প্রয়োজনে মুচি মৃত পশুর চামড়াটি সংগ্রহ করে বাকি অংশ রাস্তার ধারে, খাল বা জলাধারে ফেলে দেয়। ফলে কুকুর, শিয়াল, কাক এবং শকুন মাংসগুলো খেয়ে নেয়। কুকুর হাড়গুলো নিয়ে বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘোরাফেরা করে মারণব্যাধি অ্যানথ্রাক্সের স্পোরগুলো দুই-চার কিলোমিটারে ছড়িয়ে দেয়। উল্লেখ্য, অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু মাটিতে ২০ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। স্বাভাবিক ও সুস্থ গবাদিপশু ওই এলাকার ঘাস বা পানি খেলেই পুনরায় আক্রান্ত হতে পারে। এভাবেই বছরের পর বছর একটি মৃত প্রাণীই রোগ ছড়ানোর জন্য যথেষ্ট। এ রোগের প্রভাব বর্ষা মৌসুমেই বেশি। অ্যানথ্রাক্সে মৃত গবাদিপশুর চামড়া ছাড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে অসুস্থ গরুর মাংস তৈরিতে নিয়োজিত যেকোনো ব্যক্তির দেহে স্পোর প্রবেশ করতে পারে। শ্বাসনালির মাধ্যমে সংঘটিত অ্যানথ্রাক্সই মানুষের জন্য মারাত্মক, যাকে Wool Shorter Disease বলা হয়। চামড়ায় ক্ষত বা ঘায়ের মাধ্যমে প্রবেশ করলে সে অ্যানথ্রাক্সকে Malignant Carbuncle বলা হয়। এ অবস্থা ততটা মারাত্মক নয়, যা বর্তমানে বাংলাদেশে ঘটছে। এ রোগে গবাদিপশু হঠাৎ মারা যায়। ফলে চিকিৎসা তো দূরের কথা, মালিকও বুঝতে পারবে না কী ঘটে গেল। অ্যানথ্রাক্সের উপসর্গগুলো হচ্ছে উচ্চতাপমাত্রা (১০৭° ফারেনহাইট) কাঁপুনি, ব্লট (পেট ফাঁপা), শ্বাসকষ্ট, পেটব্যথা ও লাফালাফি করে মারা যাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে নাক ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কালো রঙের রক্ত বের হওয়া। এ ধরনের উপসর্গই প্রমাণ করে অ্যানথ্রাক্স। সাবধান! সাবধান!! মৃত পশুর চামড়া ছাড়াবেন না, সর্বনাশ ডেকে আনবেন না। মৃত পশুটি জরুরি ভিত্তিতে ছয়-সাত ফুট মাটির গর্তে পুঁতে রাখুন। মৃত প্রাণীটি গর্তে রেখে দেহের উপরিভাগে চুন বা Calcium Oxide দ্বারা আবৃত করে মাটিচাপা দিতে হবে। অন্যান্য রক্ত, লালা, দড়িসহ সবই মাটির গর্তে পুঁতে রাখুন। তবে মানুষ হিসেবে আমাদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। নিয়মিত ও সঠিকভাবে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে অ্যানথ্রাক্স রোগ হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

উল্লেখ্য, বিগত বছরগুলোতে এ রোগ স্পোরাডিক ফর্মে ছিল, গবাদিপশু মারাও যেত; কিন্তু মানুষে ব্যাপক আকারে Transmission এ বছরই প্রথম, যা জাতিকে আতঙ্কিত করেছে। মোদ্দা কথা, আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, যেহেতু সহজ চিকিৎসায় সবাই পর্যায়ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠছে। অ্যানথ্রাক্স রোগটি মারাত্মক বটে; কিন্তু প্রতিষেধক টিকা নিয়মিত ব্যবহার করলে গবাদিপশুকে শতভাগ সুস্থ রাখা সম্ভব। তবে আমাদের ত্রুটি কোথায়? এ ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা ও এর সমাধান আলোচনায় আসতে পারে। প্রথমত, প্রাণিসম্পদ বিভাগে প্রয়োজনের তুলনায় লোকবল খুব কম। যেমন—দিনাজপুর জেলার ১৩টি উপজেলার মধ্যে চারটি উপজেলায় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পদ শূন্য। ভেটেরিনারি সার্জনের অবস্থাও অনুরূপ। ১৩টি উপজেলার মধ্যে মাত্র পাঁচটিতে ইউএলএ আছে। এমনিভাবে পঞ্চগড় জেলার পাঁচটি উপজেলার চারটিতেই ভেটেরিনারি সার্জনের পদ শূন্য। দেশের বাকি জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের কমবেশি একই চিত্র।

ভেটেরিনারি সার্জনের পদ শূন্য থাকার পরও আইনগত জটিলতার কারণে বিগত বিসিএস পরীক্ষাগুলোয় ভেটেরিনারি সার্জনের পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। অথচ কৃষি সেক্টরে এর গুরুত্ব অপরিসীম। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক টিকার পরিমাণ বৃদ্ধি ও নিয়মিত ভ্যাকসিন প্রয়োগ এবং ভ্যাকসিন কার্ড সংরক্ষণ করা দরকার। পশু ক্রয়-বিক্রয়ে ভ্যাকসিন কার্ডসহ প্রত্যয়নপত্র প্রদর্শনের বিধান রাখা সময়ের দাবি। অসুস্থ পশু হাসপাতালে এনে চিকিৎসা গ্রহণ করা অনেক সময় সম্ভব হয় না, সে ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ ভেটেরিনারি ক্লিনিকের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। তৃতীয়ত, জাতীয় পর্যায়ে সঠিক পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে। উল্লেখ্য, পশুতে এসব রোগের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার রোধকল্পে এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে পশু ও পশুজাত পণ্যের সঙ্গনিরোধ (Quarantine), আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে আইন (২০০৫ সালের ৬ নং আইন) মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি লাভ করেছে, বিধি তৈরি এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত থাকলেও অদ্যাবধি তা বাস্তবায়িত হয়েছে কি না সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। উল্লেখ্য, দুই হাজার ৫০০ কিলোমিটার বর্ডারে অনেক স্থলবন্দর রয়েছে। সাধারণ নিয়মেই আন্তর্জাতিক আইনে রয়েছে যেকোনো প্রাণী আমদানি করতে হলে বিশেষজ্ঞ দল দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে প্রবেশাধিকার দেওয়া। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন সঙ্গনিরোধের ব্যবস্থা (Quarantine System), যার উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রাণীর দেহে জনসাধারণের, এমনকি পশু-পাখির স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক বা Zoometric Important রোগ, যা শরীরে সুপ্ত অবস্থায় থাকার ব্যাপারটি সঠিক নির্ণয় করে এবং সে মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; কিন্তু স্বাধীনতার ৪০ বছর পরও এগুলো বাস্তবায়িত হয়নি। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের স্থলবন্দর রয়েছে ১০টিরও অধিক, যেমন—হিলি, সোনামসজিদ, বুড়িমারী, দাকসাম, টেকনাফ, বেনাপোল ইত্যাদি। প্রতিটি চেকপোস্টেই প্রয়োজন আধুনিক Quarantine Shed, Disease Diagnostic Lab এবং প্রয়োজনীয়সংখ্যক ভেটেরিনারি সার্জন ও লোকবল, যেখানে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে প্রবেশাধিকার দেওয়ার বিধান থাকবে। বর্তমানে সীমান্ত এলাকায় শুধু কাস্টম চেকপোস্ট এবং বর্ডার পুলিশ ও বিডিআরের নন-টেকনিক্যাল নজর রয়েছে। যেখানে প্রতিটি গরুর অ্যান্ট্রি ফি ৫০০ টাকা ধার্য করে বর্ডার পাস দেওয়া হয়ে থাকে। আমরা এ ক্ষেত্রে কী দেখছি? শুধু পশু আমদানিই নয়, মারাত্মক ধরনের রোগ যেমন অ্যানথ্রাক্স, খুরারোগ, ব্রুসেলোসিস, হিমোরেজিক স্পেটিসেমিয়া, যক্ষ্মা, গো-বসন্ত, জলাতঙ্ক, পিপিআর, বার্ডফ্লুসহ বিভিন্ন মারাত্মক রোগ নিয়ে এ দেশে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি নির্দ্বিধায় প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে মানবসম্পদসহ প্রাণিসম্পদ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এ মুহূর্তে কী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন? পশুরোগের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার রোধে এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার স্বার্থে এ প্রয়োজন Quarantine ২০০৫ সালের ৬ নম্বর আইনের সঠিক বাস্তবায়ন। সুতরাং এ মুহূর্তে গবাদিপশুর বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে দুজন ভেটেরিনারি ডাক্তার এবং প্রয়োজনীয় ফিল্ড স্টাফ নিয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা জনসাধারণের নাগালে আনা একান্ত প্রয়োজন। কারণ রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের অভাবে গ্রামগঞ্জে অদক্ষ কোয়াকের (গরুর হাতুড়ে চিকিৎসক) ভুল ও প্রতারণামূলক ওষুধ প্রয়োগে দিন দিন অ্যানথ্রাক্সসহ বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত জীবাণুর ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রতিটি সিটি করপোরেশনে স্বাস্থ্যসম্মত মাংস সরবরাহের জন্য প্রয়োজন মডার্ন Slaughter House, যেখানে থাকবে Mini Diagnostic Lab এবং Quarantine Space এবং আবাসিক ব্যবস্থা। বর্তমানে ঢাকা সিটি করপোরেশনে দক্ষ ও সৎ ভেটেরিনারি অফিসারের প্রয়োজন। যার অধীন সাতটি Slaughter House-এ ১৪ জন Veterinary Surgeon এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সঠিক পথে থেকে স্বাস্থ্যসম্মত মাংস নগরবাসীকে সরবরাহে ভূমিকা রাখতে পারবেন, অর্থাৎ অ্যানথ্রাক্সই নয়, এর চেয়েও মরণব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। পাখির অ্যানথ্রাক্স রোগ হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। তবে রাস্তাঘাটে পশু জবাইয়ের রক্ত, মাটিতে বিদ্যমান রোগ-জীবাণুর কন্টামিনেশনে বা অন্য যেকোনো রোগে বা বিষ প্রয়োগে আক্রান্ত হয়ে পাখি মারা যেতে পারে।

সবশেষে আমি মনে করি, নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগে গবাদিপশু অ্যানথ্রাক্স (তড়কা) থেকে রক্ষা পাবে এবং এ মুহূর্তে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান, মেডিসিন, সার্জারি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমাল সায়েন্স অনুষদ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

কালের কণ্ঠ

উপ-সম্পাদকীয়

ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার

ডা. মো. ফজলুল হক

নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকার রাখে। এটি কারো দয়া বা আন্তরিকতার বিষয় নয়। বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষের আবাসস্থল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের যথেষ্ট সুনাম থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে ১৮ দলের, বিশেষ করে জামায়াত-শিবিরের হরতাল-অবরোধে যে ধ্বংসাত্মক ঘটনাগুলো ঘটেছে, তা দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই শুধু নয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও এর নেতিবাচক প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়তে শুরু করেছে। বিশ্বের প্রায় সব ক্ষমতাধর দেশই জামায়াত-শিবিরের ধ্বংসাত্মক জ্বালাও-পোড়াও নীতিকে অনৈতিক বলে অভিহিত করার পাশাপাশি দলটির রাজনীতি করার বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্টে জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করা হয়। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বা ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে এ দেশ ও জাতিকে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে এবং বাংলাদেশ সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের তালিকায় চলে যাবে। পবিত্র ধর্ম ইসলামে ধ্বংসাত্মক বা হিংস্রতা গ্রহণযোগ্য নয়। হত্যা তো দূরের কথা, মানুষের মনে কষ্ট হোক- এমন ব্যবহার করাও নিষেধ রয়েছে। সূরা আল বাকারার ১৭৮ নম্বর আয়াতে কোনো মানুষ স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, ইচ্ছাকৃতভাবে, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করলে বিনিময়ে হত্যা করার বিধান রয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'কেসাস'। একই সূরার ২১৭ নম্বর আয়াতে উল্লেখ রয়েছে, হত্যার আদেশদাতার শাস্তি ওই হত্যাকারীর চেয়েও কঠিন। গত ২০১৩ সালের শেষের দিকে ও এ বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে হরতাল ও অবরোধকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল, তা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। প্রাণীকুলের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সুখ-শান্তিতে বসবাসের নিমিত্তে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আলো-বাতাস-পানিসহ কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু রেখেছেন সবার জন্য উন্মুক্ত। চলাচল ও বসবাসের জন্য জল ও স্থলভূমি রেখেছেন সবার জন্য অবারিত। সব শ্রেণী, পেশা ও বর্ণের মানুষ বিশ্বের যেকোনো দেশেই শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবে- এটিই প্রকৃত বিধান। সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু বলে সমাজে শ্রেণীবিন্যাস করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দূরত্ব ইসলাম ধর্মসহ কোনো মতাদর্শেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্বে প্রায় ২০০টির অধিক ছোট-বড় দেশ রয়েছে। এর মধ্যে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত মোট দেশের সংখ্যা ১৯৫টি, যার মধ্যে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের সংখ্যা ১৯৩টি। তা ছাড়া বেশ কয়েকটি দেশ আজও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। সব দেশেই রয়েছে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাভাষী মানুষের জন্য আবাসস্থল। বিশ্বের সব দেশেই বিভিন্ন আনুপাতিক হারে এসব শ্রেণীর মানুষ বাস করে যাচ্ছে। কম-বেশি সবাই ব্যতিটায় বাস করে জীবনের শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে আত্মতৃপ্তি পায়। সবাই বিভিন্ন পেশায় কাজকর্ম করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে। বিদেশে গিয়েও পুনরায় নিজ দেশে ফিরে এসে শান্তির সঙ্গে ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন নিয়েই জীবন সচল রাখতে নিজ নিজ কাজে মনোনিবেশ করে থাকে। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই একটি ধর্মের মানুষ সংখ্যাগুরু, বাকি সবাই সংখ্যালঘু। বাংলাদেশে যারা সংখ্যালঘু, অন্য দেশে একই শ্রেণীটি সংখ্যাগুরু। সুতরাং এ ধরনের ভাবার অবকাশ নেই। দৃশ্যমান বা অদৃশ্য- সব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রধানত মানুষের উপকার বা মঙ্গলের জন্য। তাই জন্মসূত্রে হোক আর গ্রিনকার্ডের মাধ্যমেই হোক, রাষ্ট্র বা দেশ সবার। মানুষ হিসেবে সবারই যার যার অবস্থান থেকে সাধ্যানুযায়ী স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার রয়েছে। কেউ যেন অধিকার বঞ্চিত না হয়।

৫ জানুয়ারির নির্বাচনপূর্ব ও উত্তর সময়ে বাংলাদেশের ধ্বংসাত্মক ঘটনাগুলোতে শুধু বিবেকবান এ দেশের মানুষই নয়, বিদেশি বন্ধুরাও শংকিত। বিদেশে অবস্থানরত অনেক বাংলাদেশিও সন্দেহের চোখে রয়েছে বিদেশিদের কাছে। হরতাল-অবরোধে হিংসাত্মক ঘটনাবলি দ্বারা মানুষ হত্যা, কল-কারখানা, যানবাহন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বইপত্রসহ বিভিন্ন স্থাপনায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ঘটনায় সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ হাজার হাজার কোটি টাকা। সহিংসতায় যথাক্রমে ৪৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮৭টি উচ্চ মাধ্যমিক, ২৬টি মাদ্রাসা ও ১২টি কলেজে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। তা ছাড়া রয়েছে ব্যাংক-অফিসসহ বিভিন্ন স্থাপনা। আরো রয়েছে বসতবাড়ি, গাড়ি, মিল-কারখানা, ট্রেন ও লঞ্চসহ অনেক কিছু। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও মন্দির। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ যাই হোক না কেন, বড় ক্ষতি হয়েছে শিক্ষার্থী ও স্বজনহারা পরিবারগুলোর। গত এক বছরে এক হাজার বাস, মিনিবাস, ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সে হিসাবে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত এর সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। তা ছাড়া বাস-ট্রাক ভাঙচুর করা হয়েছে প্রায় তিন হাজার ৫০০টি, যার ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৩০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতির তথ্যমতে, অগ্নিসংযোগ ও বোমাবাজিতে ৫৫ জন পরিবহন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। পরিবহন খাতে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। এক দিনের হরতালে কৃষকের পণ্য বাজারজাতে বাধাগ্রস্ত হওয়ায় লোকসানের পরিমাণ ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা এক হাজার ৯০০ কোটি টাকা। সে হিসাব অনুযায়ী জানুয়ারি ২০১৩ থেকে জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত এক বছরে ৭২ দিন হরতাল-অবরোধে কৃষকের লোকসানের পরিমাণ এক লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা। সিলেট প্রবাসী সমিতির এক আলোচনা সভায় উল্লেখ করা হয়, গত ৪২ দিনের হরতাল ও অবরোধে একমাত্র সিলেট জেলায় পাথর, কয়লা ও চুনাপাথর আমদানিতে সরকার রাজস্ব আদায় থেকে বঞ্চিত হয়েছে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। এমনিভাবে হোটেল ব্যবসায় ক্ষতির পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা, গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে ২২৫টি, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩৮ কোটি টাকা। গাছ কর্তন প্রায় ৫৫ হাজারটি, যার অনুমানিক মূল্য প্রায় ১০ কোটি টাকা। দেশ ও সমাজের উন্নয়নে প্রয়োজন দল-মত, ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে হিংসাবিদ্বেষ, হানাহানির রাজনীতি পরিহার করে দল-মত-নির্বিশেষে সবাই মিলেই বর্তমান উন্নয়নের গতিতে আরো শক্তির সঞ্চার করতে হবে। সে ক্ষেত্রে সব দল-মত, ধর্ম ও বর্ণের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে হবে একটি সন্ত্রাসমুক্ত, হিংসাত্মক হরতাল-অবরোধমুক্ত বাংলাদেশ।

লেখক : অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

শোকের মাস ঃ আগস্ট

কৃষিবিদ প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হক (বীর মুক্তিযোদ্ধা)*

১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির জন্য এক কলঙ্কময় অধ্যায়। প্রতিবছরই পালাক্রমে আগস্ট ফিরে আসে কিন্তু শহীদ হয়েছেন যারা তারা আর কোন দিন ফিরে আসবে না। ঐ সকল ঘাতকরা এতটাই হিংস্র যে বনের হিংস্র পশুকেও হার মানায়। বঙ্গবন্ধুর অবুঝ শিশু শেখ রাসেল কি অপরাধ করেছিল? অন্তঃসত্ত্বা আরজু মনির কি অপরাধ ছিল ? ঘাতকদের মূল লক্ষ্যই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের সকলকে হত্যা করে দেশকে পূর্ব পাকিস্তান কায়েম করা। আল্লাহর বিচার দুনিয়াতেও কিছু হয় তার প্রমান জেল-ফাঁসি শুধু নয়, আরও অনেক বিষয় আছে। পবিত্র কোরআন শরীফের সুরা বাকারার আয়াত নং ১৭৮-এ উল্লেখ আছে যারা কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করল বিনিময়ে তাদের শাস্তি হত্যা (ফাঁসি) যাকে ইসলামিক পরিভাষায় বলা হয় কেসাস এবং এই হত্যার ষড়যন্ত্রকারী বা আদেশদাতার শাস্তি আরও কঠিন। সুরা বাকারার আয়াত নং ২১৭-তে উল্লেখ রয়েছে "ওয়াল ফিতনাতু আকবারু মিনাল কাতলি" যার অর্থ দাড়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা জঘন্যতম। এ ক্ষেত্রে যারা স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন ঐ ঘাতকদের বিচারের রায় অন্তত হওয়া উচিৎ। বঙ্গবন্ধু তিনটি জিনিসকে ভয় পেতেন, তা হলো- বিষধর সাপ, কুমীর এবং মোনাফেক। মোনাফেকদের মূল চরিত্র হলো, তাদের অন্তরে এক বাইরে ভিন্ন চিন্তা। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার বেলায়ও হত্যাকারীরা মোনাফেকের চরিত্রে ভূমিকা রেখেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের সাথে চলেছে, খেয়েছে, ভালোভালো কথা বলেছে, হাসিতামাশা করেছে, চাকুরির ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা নিয়েছে অর্থাৎ সব ধরনের স্বার্থ আদায় করেছে কিন্তু মনের মধ্যে ছিল হিংস্রতা। সর্বদা সুযোগ খুঁজেছে কীভাবে, কখন-কোথায় বঙ্গবন্ধুকে শুধু নয় তাঁর ছেলেমেয়েসহ আত্মীয়স্বজনদেরসহ হত্যা করা যায়। ১৫ ও ২১ আগস্টের দুটি হত্যাকাণ্ডই ঘটিয়েছে এদেশের আলো-বাতাসে লালিত সেই মোনাফেকরা যারা বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন। ১৫ আগস্ট ভোর রাতে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়ীতে অতর্কিত হামলা চালিয়ে সেদিন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন্নেছা, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ কামাল, মেজো পুত্র লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি ও কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, আরিফ সেরনিয়াবাত, দৌহিত্র সুকান্ত আব্দুল্লাহ বাবু, ভ্রাতুষ্পুত্র শহীদ সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা ও সাংবাদিক শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা অফিসার কর্ণেল জামিল আহমেদ এবং ১৪ বছরের কিশোর আবদুল নঈম খান রিন্টুসহ পরিবারের ১৬ জন সদস্য ও আত্মীয়স্বজনকে ঘাতকরা হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু সবসময় ভাবতেন বাংলাদেশে তার কোন শত্রু নেই, থাকতে পারে না, এটিই স্বাভাবিক। তার সে আত্মবিশ্বাস ভুল প্রমানিত হলো। এদেশের ঘাতকরাই তার ও তার পরিবারের সকল সদস্যদের সর্বনাশের কারন হয়ে দাড়ালো। ধানমণ্ডির বত্রিশে বঙ্গবন্ধুর বাড়িটি কালের সাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে। বঙ্গবন্ধুর পরিধেয় সেই রক্ত মাখা পাঞ্জাবি, মুজিব কোর্ট, চশমা, জায়নামাজ আর পবিত্র কোরআন শরীফ সংরক্ষিত রয়েছে ৩২ নং ধানমন্ডির যাদুঘরে, যা দেখলে ব্যথিত করে দর্শনার্থীদের হৃদয়। বুলেটের দাগ ও বুলেট বিদ্ধ দেওয়াল গুলি বহন করছে সেই রক্তমাখা শোকের ছায়া। সাংবাদিক লেখক অ্যান্থনি মাসকারেনহাস তাঁর লেখা বইয়ের একটি অংশে উল্লেখ করেছেন, ২০ মার্চ, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর ঘাতক ফারুক মেজর জিয়াউর রহমানকে ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরিকল্পনার বিষয়ে অবহিত করেছিলেন। মেজর জিয়া বলেছিলেন, অগ্রসর হও। তবে সরাসরি তোমাদের সঙ্গে অংশগ্রহন করতে পারব না। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর মেজর জিয়াউর রহমান হত্যাকারীদের বাঁচানোর জন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ নামক কালো আইন তৈরি করে হত্যাকারীদের বিদেশে পালাতে সাহায্য করে ও চাকরির ব্যবস্থা করে। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫

*ডিন, ভেটেরিনারি এন্ড অ্যানিমেল সায়েন্স অনুষদ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মূল নায়কই ছিলেন জিয়াউর রহমান। অ্যান্থনি মাসকারেনহাস আরো বলেছেন, জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহনের পর তাঁর নির্দেশে স্বাধীনতার পক্ষের সৈন্যদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। যার সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে চার হাজার। আমেরিকার সাংবাদিক ও লেখক লরেন্স লিফশুলজ (পুলিৎজার শান্তি পুরস্কার বিজয়ী) বলেন, জিয়াউর রহমান, কর্নেল আবু তাহের, খালেদ মোশাররফসহ অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যার জন্য দায়ী। মেজর জিয়াউর রহমানের হত্যাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে ১৩ জন আর্মি অফিসারকে ফাঁসি দেয়া হয়। কিন্তু ইনডেমনিটি আইন এক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা হয়নি যা বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর মেজর জিয়া বাস্তবায়ন করেছিলেন।

এখানেই শেষ নয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার টার্গেট করে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা চালানো হয় বঙ্গবন্ধু এভিনিউ-এ আওয়ামী লীগের জনসভায়। এ সময়টি ছিল বিএনপি-জামায়াত শাসনামল। হত্যা পরিকল্পনা, ঘাতক ও হত্যায় অর্থকড়ির খরচ সবই তাদের নির্দেশে। অত্যন্ত অনুতাপের বিষয় মরহুম ওবায়দুর রহমান ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ডানহাত। নিজ চোখে দেখেছি বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ট বন্ধু হিসেবে, অথচ তিনিও ২১ আগস্টের হত্যা পরিকল্পনার একজন বলে জানা যায়। এ দুঃখ রাখি কোথায় ? ফলে আইভি রহমানসহ ২৪ জন মৃত্যুবরণ করেন এবং শেখ হাসিনাসহ আহত হন পাঁচ শতাধিক। ওই সময়টা ছিল জামায়াত-বিএনপির শাসনামল। তারেক জিয়ার হাওয়া ভবন ছিল সকল অপকর্মের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর মদদেই দুর্বৃত্তরা বঙ্গবন্ধু এভিনিউ-এ শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলা চালায়। ওই হৃদয়বিদারক ঘটনার জন্য তারা বিচার তো দূরের কথা, দুঃখ প্রকাশও করেনি। রাজাকারদের মন্ত্রিত্ব দিয়ে অর্থ আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে জঙ্গি তৈরিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মদদ দিয়েছে। বিদেশে টাকা পাচার করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, দেশের উন্নয়নে বাধাদান, কুৎসা রটনা একটি সাধারন বিষয় তাদের কাছে। বর্তমানেও তাদের মদদে ও যোগসাজশে এ দেশে অবস্থানরত দেশ-বিদেশের নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। যার উদাহরণ গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরায় ২০ জনকে গুলি ও জবাই করে হত্যা এবং ঈদের দিন শোলাকিয়ায় গ্রেনেড হামলা চালিয়ে দুজন পুলিশসহ চারজনকে হত্যা। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জিন ও খাদেম, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ধর্মযাজক, বিদেশি ডাক্তার, গবেষক, আওয়ামী লীগ নেতাসহ বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। দেশের মানুষ আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাই সন্ত্রাস দমনে সরকারের পদক্ষেপগুলোকে সাধুবাদ জানাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পেয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। তেমনি তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার সঠিক নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি দুই লাখ ৪৬ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের সমুদ্র জলসীমা নিয়ে বিশাল ভূখণ্ড। প্রায় ৬৫ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছেন ১১১টি ছিটমহলের বাসিন্দাদের। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রবেশ করল সুদূর মহাকাশে। গত ১২ মে ২০১৮, শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সফল উৎক্ষেপন দ্বারা। এক্ষেত্রে ৫৭ তম সদস্য রাষ্ট্রের তালিকায় পৌছে গেল বাংলাদেশ। দ্রুতগতিতে আজ দেশ উন্নয়নের প্ল্যাটফর্মে ধাবমান। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেতু পদ্মা সেতুর ভিতিপ্রস্তর স্থাপনের পরপরই বিরোধী রাজনৈতিক দলের চক্রান্ত থেকে বের হয়ে আসতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে বর্তমান সরকারকে। শুধু তাই নয়, নির্মাণকাজ বিলম্বিত হওয়ায় অতিরিক্ত খরচ হবে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা। সব বাধা অতিক্রম করে আগামী ২০১৯ সালের শেষ দিকে যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে বহুমুখী পদ্মা সেতুটি, যার উভয় তীরে গড়ে উঠবে শত শত কল-কারখানা, হাট-বাজার, বিমানবন্দর, রেলস্টেশনসহ অনেক কিছু। আমরা হবো আরো সম্মানিত জাতি। সব সুযোগ ও সম্মানের দাবিদার এ দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় দেশপ্রেমিক বাঙালি জনগোষ্টি। এ সুযোগগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি তিনিই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর নেতৃত্বে ৩০ লাখ শহীদ। পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট যে কুচক্রীমহল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করেছে এবং নেপথ্যে এ হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতা করেছে তারা বাঙালি জাতির চিরশত্রু। তাদের ব্যাপারে সবাইকে সাবধান থাকতে হবে। এ দেশে তাদের রাজনীতি করার অধিকার আছে কতটুকু-সেটিই বিবেচ্য বিষয়। এ দেশের শান্তি ও স্বাধীনতার পক্ষের সবাইকে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওই অপশক্তিকে রুখতে হবে। সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের এ দেশে কোনো ঠাঁই হবে না। পরকালে তাদের কোথায় স্থান হবে স্বয়ং আল্লাহই ভাল জানেন।

* * * * * * *

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

-প্রফেসর ডাঃ মোঃ ফজলুল হক (বীর মুক্তিযোদ্ধা)

বাংলাদেশ আয়তনে অনেক ছোট একটি দেশ কিন্তু এদেশের মাটি উর্বর, নদী সমুদ্রের পানি উর্বর, মানুষের মন উর্বর ও কর্মক্ষম। সর্বোপরি আমরা বাঙ্গালী জাতি পেয়েছি বঙ্গবন্ধুর মত উদার মনের দেশ প্রেমিক নেতা যিনি বিশ্বের অদ্বিতীয় বললেও ভুল হবে না। যিনি দিয়েছেন বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত সহ সোনার বাংলাদেশ। অনেক পরিকল্পনা এঁকেছিলেন মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা, মাটি ও মানুষের অকৃত্রিম ভালবাসার নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, যিনি একের পর এক অকল্পনীয় কাজগুলি করে দেশকে উন্নয়নের মহাসড়ক থেকে মহাশূন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে শতভাগ সাফল্য অর্জন করেছেন। দেশ বিদেশে অবস্থানরত বাঙ্গালীরা গর্ববোধ করে, নিজেকে সম্মানিত ভাবেন। বর্তমান সরকার আমাদের পরিচয় করে দিয়েছেন মহাশূন্যে।

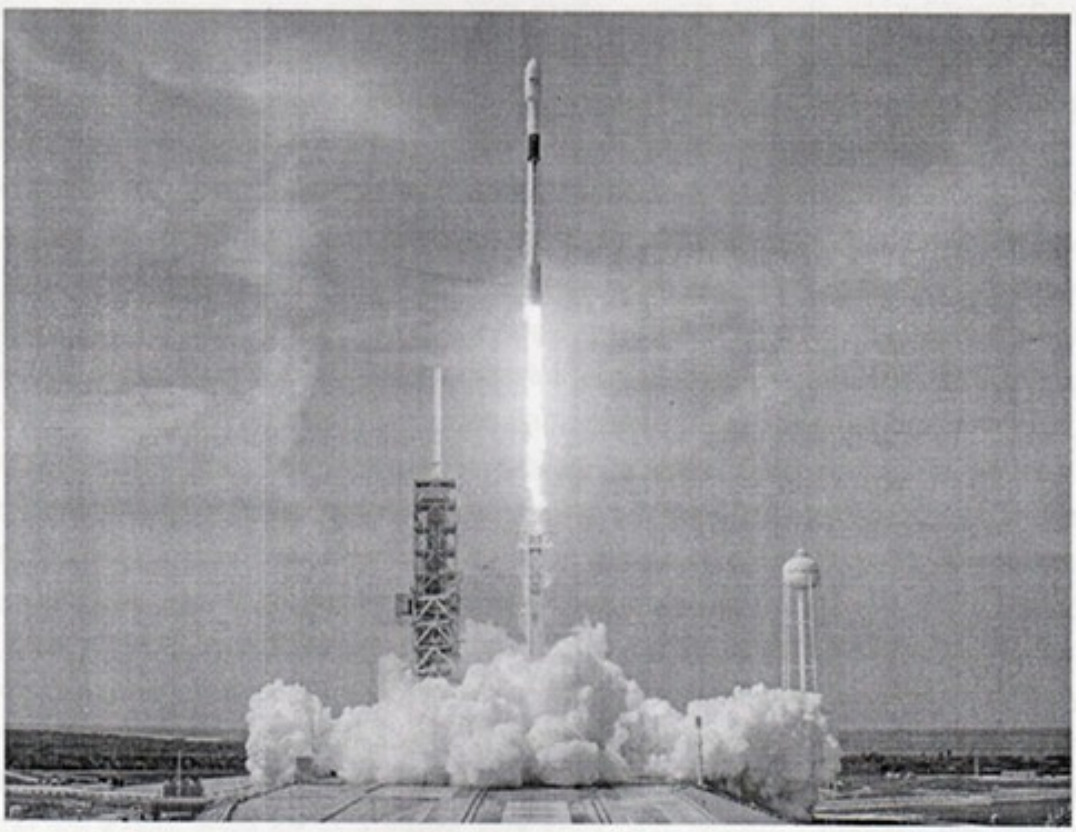

ছবিঃ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১

দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনের প্রধান যদি সৎ এবং দেশ প্রেমিক হন তবেই উন্নয়ন সম্ভব। এটিই চিরন্তন সত্য, শতসিদ্ধ। হেনরী কিসিঞ্জারের মন্তব্য-"বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ি" এবং পাক প্রশাসনের মন্তব্য-''বাঙ্গালীরা বাংলাদেশ একদিনও চালাতে পারবেনা।"গত ১২ মে/২০১৮ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকেই গর্বের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ সফল উৎক্ষেপনের মধ্য দিয়ে ৫৭তম স্যাটেলাইট সদস্য রাষ্ট্রের তালিকায় বাংলাদেশ। সততা, আন্তরিকতা এবং দেশপ্রেম থাকলে সবই

সম্ভব যার উদাহরণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যে ১৮টি দেশ এগিয়ে আছে, বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। অর্থনীতিতে ৭৪টি উদীয়মান দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৩৪তম অবস্থানে যা পাকিস্তান, ভারত শ্রীলঙ্কার চেয়েও বেশী। ক্ষুধা ও দারিদ্র বিমোচনে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে ফলে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ২০০৬ সালে ৫.৭ শতাংশ হতে ২০১৩ তে ৬.৭ শতাংশ এবং ২০১৮ তে ৭.৩ শতাংশ। বিশ্ব ব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন প্রবিবেদনে বিশ্বের সর্বোচ্চ প্রতিবেদনে অর্জিত প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ৫ম স্থানে রয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য মডেল দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনসহ বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক ব্যক্তিত্ব স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নের রোডম্যাপে বাংলাদেশের অবস্থানকে অত্যন্ত স্বর্ণোজ্বল বলে অভিহিত করেন। অমর্ত্য সেন আরও বলেন, নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে অনেক এগিয়ে। তার মন্তব্যটি শতভাগ প্রতিফলিত হয়েছে ২০১৮ সালের মার্চে। এ সফলতার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে **"গ্লোবাল উইমেন লিডারশীপ অ্যাওয়ার্ড ২০১৮"** প্রদান করা হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এক জনসভায় মন্তব্য করেন উন্নয়নের দিক থেকে বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম পর্যায়ে। এ অবস্থানে দেশকে এগিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বই প্রধান বিষয়। তাছাড়াও উল্লেখ করেন বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশকে গনতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে। বহিঃবিশ্বে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সেবা, মাথা পিছু আয়, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদিসহ সকল সেক্টরের উন্নয়নকে বেশ গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু আয় ২০১৮ মার্চ এ ১৬০২ মার্কিন ডলার যা উন্নয়নশীল দেশের কাতারে স্থান পাওয়ার তুলনায় অনেক বেশী।

দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বীকৃতিস্বরুপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘের বিশেষ পুরস্কার **"সাউথ সাউথ"** দ্বারা সম্মানিত করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন এটি এদেশের জনগণেরই অর্জন। উন্নয়নে দেশের সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের কম বেশী অবদান রয়েছে। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি, দল বা সরকার যতটুকু অবদান রেখেছেন, দেশবাসী ততটাই মূল্যায়ন করতে ভূল করবেন না। বিগত খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফল তার কিছুটা ইঙ্গিত বহন করে। বর্তমান ও পূর্ববর্তী গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনামলের তুলনামূলক চিত্র জনস্বার্থে উপস্থাপিত হল। ২০০৬ সালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ-৩৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৩ সালে ১৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে ৩৩,৩৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৬ সালে রপ্তানী আয় ১৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৩ সালে ৪৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে ২৩,৮৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত সাড়ে চার বচরে মালয়েশিয়ায় আড়াই লক্ষ শ্রমিক প্রেরণ এবং ৬ লক্ষ বাংলাদেশিকে সৌদিআরবে চাকুরী করার বৈধতা প্রদানের ব্যবস্থা করে বর্তমান সরকার। সামাজিক নিরাপত্তা যেমনঃ ২,৪৭,৫০০ জনকে বয়স্ক ভাতা, ৯,০২,০০০ জনকে বিধবা ভাতা এবং ২,৮৬,০০০ জনকে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৩ সালে খাদ্য উৎপাদন ৩.৫০ কোটি মেট্রিকটন অর্থাৎ ৩০ শতাংশ বৃদ্ধির ফলে ২৩ লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্য উদ্বৃত্ত। এ কারণে শ্রীলঙ্কায় ৫০ হাজার টন চাল রপ্তানী করা সম্ভব হয়েছে। গত বছরের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া অর্থাৎ মারাত্নক বন্যার কারনে খাদ্য শস্য উৎপাদন মারাত্নক ভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০০১-২০০৬ সময়ে বৈদেশিক বিনিয়োগ ২৬০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২০০৯-২০১২ সময়ে ৮৫৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণ। ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ-৪ লেন বিশিষ্ট রাস্তা নির্মাণ। কুড়িল ফ্লাইওভার, মিরপুর এয়ারপোর্ট রোড ফ্লাইওভার, বনানী ফ্লাইওভার, যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভার নির্মাণ এবং হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়িত। ২০০৯-২০১৩ সময়ে বর্তমান সরকার মোট ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার জনকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে কম খরচে। স্বাস্থ্য সেবার নিমিত্তে ৩৬ টি নার্সিং কলেজ স্থাপিত ও শিক্ষার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ২০,৫০০ টি মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়ার ক্লাশরুম স্থাপনসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এবং ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান। শিক্ষার উন্নয়নে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১,৫০০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, ফলে বর্তমানে শিক্ষার হার ৬১.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (তথ্যঃ বিবিএস) । ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয়ে ১ লক্ষ ৩০ হাজার বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র সীমানা ও ১২ গ্যাস কূপ বাংলাদেশের স্থায়ী দখলে চলে আসে। ১৯৭৪ সালের ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালের ৩১ মার্চ এ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ৬২ বছর পর বন্দি জীবন থেকে মুক্তি পায় সীটমহল বাসী। সীটমহল বাসীর স্লোগান ছিল **"মুজিব দিয়েছে চুক্তি, হাসিনা দিয়েছে মুক্তি। "** আওয়ামীলীগ সরকার আমলে প্রায় ১৪,০০০ টি কমিউনিটি হেল্‌থ ক্লিনিক সেন্টার চালু করা হয়েছে। ২০০৬ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হত ৩,৬৩২ মেগাওয়াট ও ২০১৩ সালে ৮,৫৩৭ মেগাওয়াট এবং ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে এসে তা দাড়ায় প্রায়১৬ হাজার মেগাওয়াটে । ফলে বর্তমানে অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে বিদ্যুৎ লোডশেডিং তুলনামূলক অনেক কম। অন্যদিকে বছরের প্রথম মাসে বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া

এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ৩৫ টি মাদ্রাসাকে আইসিটি ল্যাবসহ মডেল মাদ্রাসায় উন্নীতকরণ ও ১০০ টি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল কোর্স চালুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ৪০ টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী উচ্চ শিক্ষার বিধান রাখা হয়েছে। ২৫,২৪০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১,৩০,১০০ জন শিক্ষককে চাকুরীতে সরকারী করণ করা হয়েছে। অন্যদিকে দারিদ্র বিমোচনের জন্য ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় ৭৫ লক্ষ নারীকে মাসে ৩০ কেজি হারে খাদ্য শষ্য প্রদান ও ওএমএস, ভিজিডি, ভিজিএফ, টি.আর, কাবিখা, এবং খাদ্য নিরাপত্তা খাতে ৩,৯৪৫ কোটি টাকা ব্যয় করছে বর্তমান সরকার। মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস হতে ৬ মাস করা হয়েছে। স্বাক্ষরতার হার ২০০৬ সালে ৫১.৯ শতাংশ, ২০১৩ সালে ৬৫.০৪ শতাংশ। দারিদ্রের হার ২০০৬ সালে ৪১.৫ শতাংশ, ২০১৩ সালে ২৯.০৩ শতাংশ। কর্মসংস্থান ২০০৬ সালে ২৪ লক্ষ, ২০১৩ সালে ৭৫ লক্ষ। পোশাক রপ্তানীতে বিশ্বের অবস্থান চতুর্থ এবং ২০১৩ সালে দ্বিতীয় স্থানে। ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ২০০৬ সালে ৫৭ লক্ষ, ২০১৩ সালে ৪ কোটি এবং ২০১৮ সালে ৮ কোটি ৮৩ লক্ষ জন। শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরী ২০০৬ সালে ১৬৬২ টাকা, ২০১৩ সালে ৩,০০০ টাকা এবং ২০১৮ সালে এসে তা দাড়ায় ৯,০০০ টাকায়। রপ্তানী আয় ২০১৮ (জানুয়ারী) ছিল ২৩,৮৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বৈদেশিক মুদ্রার বর্তমান রিজার্ভ ৩৩,৩৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। হাসপাতাল সংখ্যা ২০০৬ সালে ১৬৮৩ টি, ২০১৩ সালে ২৫০১ টি। উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশ রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের দেশ (LDF) থেকে **"উন্নয়নশীল"** দেশের কাতারে উপনীত হয়েছে। এ সকল অবদান ও উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষতা, আন্তরিকতা, দেশপ্রেম, দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং সততার কারণেই সম্ভব হয়েছে। সে কারণে বিশ্বের ১৭৩ টি রাষ্ট্রের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সততার মানদন্ডে ৮৭ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে এবং উন্নয়নের সকল সূচক পূরণ হওয়ায় বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেছেন। ২০১৫ সালে **ফোর্বস** ম্যাগাজিনের ভাষ্যমতে, বিশ্বের ক্ষমতাধর নারীর তালিকায় সম্মানের স্থান এবং **"বিশ্বের একশত প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায়"** রয়েছেন তিনি। এ অর্জন ও উন্নয়নগুলো বাঙালী জাতিকে সম্মানের ক্ষেত্রে অনেক উচ্চতায় স্থান করে দিয়েছে। মূল কথা হলো রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা হ্রাস পেলে এবং সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগীতার আন্তরিকতা বৃদ্ধি পেলে ভবিষ্যতে এদেশকে অনেক দেশই মডেল হিসেবে গ্রহণ করবে।

প্রফেসর ডাঃ মোঃ ফজলুল হক
চেয়ারম্যান ও ডিন
মেডিসিন, সার্জারি এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ
ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্স অনুষদ
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
দিনাজপুর।

জাপানে ৩৬৫ দিন

প্রফেসর ডা. মো. ফজলুল হক

১৯৯৬ সনের কথা এশিয়া মহাদেশের কয়েকটি দেশ হতে ১৪জন ভেটেরিনারিয়ানকে সল্যচিকিৎসায় এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোনয়ন দেওয়া হয। সৌভাগ্যক্রমে আমি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্ডান ভেটেরিনারি হাসপাতাল ও তৎসংলগ্ন ল্যাবরেটরিতে কাজের সুযোগ পাই। এছাড়া, জাপানের প্রায় সবগুলো প্রদেশ (প্রিফেকচার) সরকারী খরচে ভ্রমনে সুযোগ হয়েছে। যে দেশের অর্থায়নে এত বড় সুযোগ পেয়েছি, তাদের ব্যাপাপরে কিছুটা হলেও স্মৃতিচারণ না করলেই নয়। সে জন্য এ ক্ষুদ্র লেখা সবার সদয় অবগতির জন্য পেশ করা হলো।

ছোট বেলায় পড়েছি, জাপান সূর্যোদয়ের দেশ। আসলেই কী তাই? জাপান ৪টি বড় বড় দ্বীপ নিয়ে গঠিত, যার চতুর্দিকেই সমুদ্র। সুতরাং যখন সূর্য পূর্বদিকে ওঠে তখন মনে হয় এটি সূর্যোদয়ের দেশ। আবার যখন পশ্চিমে অস্ত যায়, তখন মনে হয় সূর্যাস্তের দেশ। তাই জাপানকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দেশ বললেও ভুল হবে কি? দেশটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, শত শত পাহাড় ও টিলার সমন্বয়ে গঠিত। লোকসংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি; প্রতি বর্গমাইলে ৮৩৬ জনের বাস এবং শিক্ষার হার ৯৯ শতাংশ। উত্তরদিকে হককাইডো (সাপোরো) প্রদেশে বছরের প্রায় ৩মাস বরফে ঢাকা থাকে। দক্ষিণাংশের তাপমাত্রা বাংলাদেশের অনুরূপ। মধ্যভাগে টোটিও জাপানের রাজধানী, শীতকালে মাঝে মধ্যে তুষার পড়ে পড়ে ভাব। বাতাসের কোন দিক ঠিক নেই, বরং বেদিক আছে; প্রায় সময়েই বিভিন্ন দিক হতে বাতাস বয়ে। প্রায় সারা বছরই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়। রাস্তার ধারদিয়ে সারি সারি সাকুরা গাছ, তাতে সাদা সাদা ফুল। নাম না জানা শত শত বছরের বড় বড় গাছ। বসন্তে সকল পাতা একত্রে হলুদ বর্ণ ধারণ করে, সমস্ত টোকিও শহরকে হলুদে করে দেয়। পাতা ঝরার পর শহরের গাছ-পালা দেখলে মনে হয় আগুনে পুড়ে অংগার হয়ে দাড়িয়ে আছে। জাপান একটি দ্বীপ রাষ্ট্র হওয়ায় চতুর্দিকে তাদের শত্রুর অভাব নেই বুঝতে পেরে শক্তিশালী সৈন্য বাহিনী গড়ে তোলে।

জাপানে ১৮৮৯ সালে প্রথম সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৪-৯৫ সালে চীরেন সাথে যুদ্ধ শুরু হয় এবং তাইয়ান পেসকার ডোর দ্বীপ, দক্ষিণ মসমুরিয়অ ও কোরিয়ার কিছু অংশ দখল করে। ১৯০৪-০৫ সালে রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করে। প্রথম মহাযুদ্ধে জাপান বীরের ভূমিকা নিলেও ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকা হিরোশিমা ও নাগাশাকিতে পারমানবিক বোমা নিক্ষেপ করলে লক্ষাধিক জাপানী মৃত্যুবরণ করে এবং অনেক লোক আজও বিকলাঙ্গ জীবন-যাপন করছে। এত বোঝা যায়, জাপানীরা এক সময়ে যদ্ধ-বাজ থাকলেও। বোমার আঘাতের পর বর্তমানে তারা অত্যন্ত বিনয়ী ও ভদ্রবেশে বিভিন্ন আবিস্কারে মনোনিবেশ করছে। বর্তমানে তারা সর্বোৎকৃষ্ট জিনিস তৈরী ও বিশ্বব্যাপী সরবরাহে ব্যাপক ভূমিকাও রাখছে।

জাপানীদের গায়ের রং ফর্সা, উচ্চতা মাঝারী চুল বাদামী বা কালো স্বভাব নম্র-ভদ্র। তবে, মেয়েরা বেশী অগ্রসর তারা বাস, ট্রেন, খাবার রেস্তোরা, এতনকি লিফটে উঠতে লাইনে দাঁড়ায়। ট্রেন বা বাসে উঠেই চুপ করে থাকে, বই পড়ে নতুবা ঘুমের ছলে চক্ষু বন্ধ রাখে। অনেক সময়ে ট্রেন বা বাসে বসার স্থান থাকলেও দাঁদিয়ে থাকে। কারণ, বসতে হলে পাশের লোকের সম্যা হতে পারে বা কউ বিব্রত বোধও করতে পারে, এমনটাই বোধহয় ধারনা।

যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল। সাধারণ যাত্রীরা ট্রেনেই যাতায়াত করে বেশী, খরচও কম। ট্রেনের নাম বুলেট ট্রেন বা সিনকানসেন। প্রতি ৫/১০ মিনিট পরপর লোকালট্রেন আসে ও ছেড়ে যায় এ ট্রেন ঘন্টায় গতিবেগ ৩২৫ কিলোমিটার, যা ২০০/৩০০ কিলোমিটার পর পর থামে। সামনের অংশ দেখতে বিমানের মতই, ছিটগুলোও অবিকল বিমানের ছিটের ন্যায়। ড্রাইভার যেন বিমানের পাইলট। ছোট বেলায় শুনেছি ও পাঠ্য পুস্তকেও পড়েছি, কমলাপুর রেল ষ্টেশন এশিয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। জাপানে গিয়ে বুঝলাম তার কোন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। তবে, কমলাপুর রেল ষ্টেশনের যাত্রী ছাউনির কারুকার্য্য দেখার মত নিঃসন্দেহে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে

থাকা অবস্থায় শুনলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরে একটি পাতাল ট্রেনের লাইন তৈরী হচ্ছে। ঠিকই অল্প দিনের মধ্যে লাইনটি চালু হল। মাটির ৩০/৪০ ফুট নিচ দিয়ে চলে এ পাতালট্রেন এবং মনুট্রেন চলে শূন্যে ঝুলে ঝুলে; স্বচক্ষে না দেখলে ধারণা দেয়া কঠিন। টিকেট কাউন্টারসহ সবকিছুই সয়ংক্রিয়। বিভিন্ন ধরনের তৈরী খাবার আপনার সামনে আপনা আপনি ঘুরতে থাকবে, যেটি পছন্দ, ধরলেই হল। পেমেন্ট দিবেন? মেশিনে টাকা ঢুকিয়ে বোতাম চাপুন, নিমিশেই অতিরিক্তি টাকা ফেরৎ পাবেন। ট্রেনের ভাড়া কম দিলে মেশিনেই সাথে সাথে আপনাকে আটকিয়ে দিবে। পুলিশ কোন কথা না বলে নিয়ে যাবে হাজতে। প্রতিটি ট্রেনে ২/৩ জন ড্রাইভার। কোন টিকিট চেকার নেই নিয়ম শৃংখলা তাদের কাছ থেকেই আমাদের শেখা প্রয়োজন।

পড়া লেখা সবই Lab-এ হয়, প্রাইভেট পড়ার প্রয়োজন নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-রাজনীতি ও সেশনজটের ঝামেলা নেই। খাওয়া সময় মত অর্থাৎ সকাল ৭টা, দুপুর ১২টা ও সন্ধ্যা ৭টায়। বেশীর ভাগ জাপানী রাত্রে পাউরুটি খায়। স্বাস্থ্য সচেতন স্লিম থাকতে পছন্দ করে বিধায় আলুর চিপ্‌স, বিস্কুট, চানাচুর খায় খুবইকম। একটি অনুষ্ঠানে চিপস্ খেতেছিলাম। পাশে এক জাপানী পি.এই.ডি ছাত্রী বলেন, হক সান হেট (মানে হক সাহেব), বেশী চিপস্ খেতে নেই, শরীর মোটা হয়ে যাবে। এতে বোঝা যায়, খাদ্যমান বিষয়েও তারা সচেতন।

নিজের কাজ নিজে করার অভ্যাস অত্যন্ত বেশি। বাচ্চাদের ছোট থেকেই আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রশিক ।ষণ দেয়াও হয়। যেমন, জাপানী মায়েদের দেখেছি, বাচ্চাকে বই-খাতার স্কুলেব্যাগ ঘাড়ে তুলে রাস্তায় হাটাতে। উদাহরণ-স্বরুপ, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিমের গেট "রেড গেট" এর পাশের ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ৫/৬ বছরের বাচ্চা হোঁচট খেয়ে রাস্থায় পড়ে যায়। মা বাচ্চাকে ইশারায় বলল, ওঠো, বই খাতা ও ব্যাগ সংগ্রহ করে নাও। গায়ের জামার ময়লা পরিস্কার করো। ধন্যবাদ, সামনে চলো। এভাবেই বাচ্চা বয়স হতেই আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রশিক্ষণ চলে। আমাদের বেলঅয় তার উল্টো। বাবা, সোনা, মনি, আহা, উহ্, চুমুর পর চুমু দিয়ে কোলে তুলে নেই। বড় হয়েও এ চুমু পাওয়ার প্রত্যাশা সন্তানের মনে থেকেই যায়।

বড়জোর এক কাপ লাল চা, সাথে কিছু বিস্কুট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১টি আকর্ষণীয় কয়েনবক্স উপহার দিলেন যার মধ্যে ৫০০, ১০০, ৫০, ১০ ও ১ ইয়েন সু-সজ্জিত। মন্ত্রণালয়ে যেয়ে দেখি সবাই ব্যাস্ত। সামনে বসার জন্য সাধারণের জন্য তেমন কোন ব্যবস্থাও নেই। কথা কম, কাজ বেশী।

১৮ বছর বয়স হলেই মা-বাবা সরকারী নথিতে ছেলে-মেয়েদের নাম তালিকাভূক্ত করে দেন। বাবা-মা বলেন, আজ থেকে আমার ভরণ পোষণের দায়িত্ব শেষ। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে ব্যাংক লোন নিয়ে লেখাপড়া করতে হয়। চাকুরী করে নিয়েমিত টাকা ফিরৎ দিতে হয়। তারা শিক্ষকরে কাছে প্রাইভেট পড়েনা বরং ল্যাবরেটরিতেই প্রাকটিক্যাল করে। বাবা মিলের মালিক হলেও ছেলে-মেয়েকে শ্রম ছাড়া ইয়েন (জাপানী মূদ্রা) দেন খুব কম। তাকে পিতার মিলেই প্রয়োজনে ২/৪ ঘন্টা শ্রমের বিনিময়ে ইয়েন নিতে হবে।

জাপানীরা সময়ের প্রতি যত্নবান, পানচিং মেসিনে বোতাম টিপে কর্মস্থলে প্রবেশ ও প্রস্থান করতে হয়। বড়রা (চাকুরীজীবী) সময় বাচাতে রাতে গোসল করে। রাত ৪টায় রওয়ানা দেয় কর্মস্থলে যদি হয় অনেক দূরে। পাতাল ট্রেন রাত ৪-১৫ মিনিটে চলতে আরম্ভ করে। টাইম ১মিনিট এদিক-ওদিক হয় না। প্রতি ৫/১০ মিনিট অন্তর অন্তর ট্রেন। সর্বনিম্ন ভাড়া ১২০ ইয়েন (১৯৯৬-১৯৯৭ ইং সনের কথা) দেশপ্রেম অনেক বেশী। নিজের ক্ষতি হলেও দেশের ক্ষতি হোক, তা তারা চায় না। বাস-ট্রেনে টিকিট ফাঁকি কাকে বলে, তা তারা মোটেও বোঝেনা। তাদের দেখেছি, বাচ্চা বয়সে হাত খরচের জন্য রাস্তায় কাগজ কুঁড়াতে। মেয়েরা বলে, আমার ইয়েন আমাকেই আয় করে নিতে হবে। মা-বাবা স্কুলের বেতন-ভাতা ছাড়া এক ইয়েনও হাত খরচ দেবেন না। তারা স্বাস্থ্য সচেতনও; খুব ভোর বেলায় উঠে। ধুমপান করে না বললেই চলে।

জাপানীরা সরকারী রাস্তায় পড়ে থাকা কাগজের চুকরোর অন্যান্য জিনিস যেমন; সিগারেটের গোড়া পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে ভ্যানেটি ব্যাগে রেখে পরে নির্ধারিত ডাষ্টবিনে ফেলে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, নিজ চক্ষে দেখেছি ৪/৫ জন বাংলাদেশী একটি বাসার সামনে সরকারী রাস্তায় দাড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। এক মহিলা, বসয় বানুমানিক ৫৫/৬০ বছর, ঘর থেকে বের হয়ে ওদের ভাষায় বলল, "আনাতাওয়া দমে দেস" অথাৎ তোমরা খারাপ। পরক্ষণেই ঘরে ডুকে হাতে গ্লোভস, গায়ে ডাক্তারের ন্যায় এপ্রোণ বা জামা, এক হাতে ঝাড়ু অন্য হাতে ট্রে নিয়ে সিগারেরে টুকরো তুলে রাস্তা ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার করলেন এবং নির্ধারিত ময়লার পাত্রে রেখে দিলেন। এ থেকে আমাদের সবার শিক্ষা নেওয়া উচিৎ।

ভ্যানেটি ব্যাগ আমরা শুধু কসমেটিকের জন্যই ব্যবহার করি। কিন্তু তাদের বেলায় কিছুটা ব্যাতিক্রম দেখেছি। যেমন এক ভদ্র মহিলা একটি কুকুর নিয়ে হাঁটতেছিলেনকুকুরটির বাথ রুম চাপে এবং রাস্থাতেই পায়খানা করে। সাথে সাথে ভদ্র মহিলাটি পলিথিনে পেচিয়ে পায়খানা ভেনেটি ব্যাগে রাখেন এবং পরে নির্ধারিত ডাষ্টবিনে ফেলেন। ছোট ছোট টুকরো কাগজও রাস্তায় না ফেলে রেখে দেন ভেনেটি ব্যাগে। রাস্তা-ঘাটে থুতু, কাঁশি ও চকলেটের কাজমও ফেলা সম্পূর্ণ নিষেধ। নির্ধারিত স্থানে স্থানে ডাষ্টবিন থাকে, সেখানেই ফেলতে হয় ময়লা ঘরের জানালা দিয়ে কোন দিন থুতু তো দূরের কথা, হাতের নখকেটেও লেলেনা তারা। তার বলেন, জানালা শুধু আলো বাতাস ঘরে প্রবেশের জন্য, ময়লা ফেলার জন্য নয়।

প্রতি রাত্রেই ১২টা ১মিনিটের পর থেকে রাস্তা ধোয়ার কাজ আরম্ভ হয়। জাপানে ট্রেন, বাস, মটর সাইকেল সবই রয়েছে। তবে, সাধারণতঃ অল্প দূরত্বের জন্য পায়ে হেঁটেই চলে। প্রায় সব ছাত্র-ছাত্রীই সাইকেল ব্যবহার করে। তারা মনে করে, ব্যায়াম, হয়, এতে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। জাপানীরা ট্রাফিক আইনসহ সকল আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সিগনাল পয়েন্টে লালবাতি জ্বললেই সাথে সাথে গাড়ী থেমে যায়, রাস্তায় জাম থাক বা নাই থাক। পায়েহাঁটা লোজন জেব্রাক্রসিং দিয়েই রাস্তা পা হয়। একদিন আনুমানিক রাত ৪টা ৩০মিনিট রাস্তায় তেমন কোন গাড়ী ছিলনা। আমার গাড়ীচালক পিএইচডির একজন ছাত্র। আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন অন্য প্রিফেকচারে। কিছুদুর পরপর ট্রাফিক সিগনাল (লাল বাতি), সাথে সাথেই গাড়ী থামাতে হয়। সবুজ বাতি জ্বলতেই গাড়ী ছাড়া হয়। রাস্তা অনেক প্রশস্ত, পাশাপাশি একই দিকে ৩-৪টি লেনে গাড়ী চলতে পারে হাইওয়েতে। কোন ওভার টেনিং নেই, যার যার লাইনে সে সে চলে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিমে ট্রাফিক সিগলালের নিকটেই আমার থাকার হোটেল, হঠাৎ দূর্ঘটনার শব্দ শুনি। দুইটি Taxi cab এর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে একটি গাড়ীতে সামান্য আগুন ধরে যায়। উভয় গাড়ীর ড্রাইভার নেমে তাৎক্ষণিক পুলিশকে খবর দেয়। ট্রাফিক পুলিশ এসে জরিমানা করেন। তাৎক্ষনিক অর্থ আদায়। আরও অবাক কান্ড। দুর্ঘটনা স্থলে হাজার হাজার গাড়ী, শত শত পথচারী কিন্তু কোন ভাংচুর বা হৈচৈ নেই। সবাই তাকাচ্ছে আর যার যার গন্তব্যে যাচ্ছে। আমাদের দেশে হলে কী ঘটত? ভাংচুর, হৈচৈ, ড্রাইভার কে মারধর, ড্রাইভারের পলায়ন এমনকি গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি।

জাপানে ১০ হতে ৯০ বছরের সকলেই কাজ করে। সেখানে গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগীর ছোট বড় ফার্ম পরিচালনা করে বৃদ্ধারা। আমি জানতে চাইলাম, বৃদ্ধারা কেন গবাদিপশু পলনের দায়িত্বে? তাদের এখন বিশ্রাম নেওয়ার কথা। উত্তরে বললেন, তাদের রুজী তাদেরই আয় করতে হয়। আরও বলেন, এত শরীর ও মন ভাল থাকবে। কাজ না করলে মানুষ পঙ্গু হবে যে।

জাপানে খোলামেলা হাট বাজার তেমন নেই। মাছ, মাংস, শাক-সবজি, চাল, ডাল ইত্যাদি সব কিছুই প্যাকেটে পাওয়া যায়। প্রায় প্রতিটি দোকানই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। প্রতিটি দ্রব্যের উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ আছে। এমনকি কাপড়েও। শীত মৌসুম আসার পূর্বেই আমার প্রয়োজন হল কম্বল কেনার। একটি কম্বল পছন্দ হল, মূল্য লেখা ১০,০০০ উয়েন। ১৫দিন পরে য়েয়ে দেখি ঐ কম্বলের মূল্য লেখা ৫,০০০ ইয়েন। এমনিভাবে ১ মাস পরে ১,০০০ ইয়েন। আমি একটু অপেক্ষা করলাম, দেখা যাক, এর শেষ পরিনাম কী। পরে দেখলাম, লাল ক্রস চিহ্ন; বিক্রি হবে না। আমাকে বলে আপনি নিয়ে যান, No Yen মূল্য দিতে হবে না। আমি

মনে মনে চিন্ত করলাম, বিনা মূল্যে নিয়ে দেশকে ছোট করবনা। বললাম, বিনা মূল্যে নেবনা। তবে, ১০০ ইয়েন হলে নিতে পারি। সর্বশেষ ১০০ ইয়েন দিয়েই ক্রয় করলাম যার মূল্য ২ মাস পর্বে ১০,০০০ ইয়েন লেখা ছিল। তাদের সব কিছুই নিয়মে চলে।

রাজনীতি কাকে বলে, সাধারণ জাপানীরা তা মেতন একটা জানার চেষ্টাও করে না। কে দেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী অনেকে তার নামও জানেনা, বা জানার প্রয়োজনও বোধ করে না। বরং তাদের চিন্তা হলো কাজ, কাজ আর কাজ। রাস্তাঘাটে কোন মিটিং-মিছিল, গাড়ী ভাঙ্গা বা পোড়ানো দেখিনি। তবে, যা দেখেছি বাংলাদেশের মানুষই ঐদেশে বিভিন্ন সমিমির নামে নির্বাচন উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকার পোষ্টারিংসহ মাঝে মধ্যে মারামারি-হানাহানি করে। জাপানস্থ বাংলাদেশের দুতাবাসের সামনে কথায় বলে, "ইল্লত যায় না ধূলে, খাসলত যায় না মইলে"। আমি থাকা অবস্থায় জাপানে একটি জাতীয় নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু কোন ক্যামপেইং বা বড় ধরনের পোষ্টারিং চোখে পড়েনি। আমি এক সাধারণ জাপানীকে বললাম, তোমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী কে? উত্তর না দিয়ে তিনি মুচকি হেসে চলে গেলেন।

জাপানীরা কাঠির সাহায্যে ভাগ খায়। মাছ, বিশেষ করে চিংড়ী, ছোট পুঁঠি বা সামদ্রীক মাছের কাঁচা ছাড়া অংশ সচ দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস। এমনকি চিংড়ী ও কিছু সামূদ্রিক মাছ কাঁচা খেতে পছন্দ তাদের। কোন অনুষ্ঠানে (ডিনার) হলে অতিথীদের সামনে একটি তেলের চুল্লী, ছোট কড়াই, কাটা চামুচ, কাঁচা মাছ, মাংসের টুকরা ও হলুদ, মরিচ, পিয়াজ, তৈল দিয়ে থাকেন। নিজ হাতেই তৈরী করে খেতে হয় প্রত্যেক আমন্ত্রিত অতিথীকে। ভাত ১ (এক) পেয়ালার বেশী পছন্দ করেন। মাঝে মধ্যে চায়ের সাথে বরফের চুকরোও যোগ হয়।

নূরী নামক সামূদ্রিক শেওলা বা সুস্বাদু ও বিটামিন মিনারেল যা মুষের স্মরণ শক্তি বাড়ায় ও স্বাস্থ্য সবল রাখে বলে তারা মনে করে। সামূদ্রিক মাছ নিঃসন্দেহে মানুষের স্মরণশক্তি বাড়ায়। আস্ত মাছ নাড়ি ভূড়িসহ তেলে ভেজে কাছির সাহায্যে সচ দিয়ে মজা করে খায়। সব খাবারের সাথেই বাঁধাকপি, টমেটো, ধপোতা লেটুসপাতা ইত্যাদি ছলাদ হিসেবে থাকেই। তৈল অত্যন্ত কম খায়।

তাদের বিদ্যাপিঠ সব দর্মই পড়তে হয়। তারা ইসলামকে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম বলে স্বীকার করে। তবে, মুসলমানরা মারামারী করে, এটাই তাদের দুঃখ। জাপানীরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। তারা মারা-মারী, হানা-হানী মোটেও পছন্দ করে না। তবে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে কিছুটা ব্যাতিক্রম ছিল। জাপানে ইতোপূর্বে কোন মসজিদ-মাদ্রাসা ছিল না। গত ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত মাত্র ৪ (চার) টি মসজিদ যা একসময়ে জাপানীদের বাড়ী ও খেলাধূলার ঘর ছিল। বর্তমানে ৬টি বড় বড় মসজিদ এবং প্রচুর নামাজের ঘর হয়েছে। জাপানী মুসলমানদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। প্রথম জাপানী নও মসুলমের নাম মো ইব্রাহীম।

জাপানী বিয়েতে ব্যক্তিগত পছন্দই প্রাধন। তবে অভিভাবকের পচন্দও মূল্যায়ন করা হয়। জাপানী মেয়েরা পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের মুসলিম পাত্রে বিবাহ বন্ধনে বেশী আগ্রহী। জাপানী মেয়েদের পুরুষের পাশাপাশি কল-কারখানা ও অফিস আদালতে চাকুরী বা খেটে খেতে হয়। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম থেকে রেহাই পেতে সম্ভাবত তারা মুসলিম পাত্র পছন্দ করে।

জাপানীরা ধার নেওয়া বা দেওয়া মোটেই জানে না। তবে, সরকার থেকে লোন নেওয়া সাধারন ব্যাপার। তারা বাসা-বাড়ী, দোকান পাঠের উপর নিয়মিত ট্যাক্স দিয়ে থাকে।

জাপানীদের প্রিয় খেলা ফুটবল, বেলবল, ক্রিকেট, কুস্তি,হাডুডু ইত্যাদি। তবে, সবচেয়ে প্রিয় বেসবল ও ঘৌড়দৌড় প্রতি শনি ও রবিবার হয়ে থকে। ঘোড়দৌড় স্টেডিয়ামের সংখ্যা ১৮টি। প্রতিটিতে ৫০ হাজার দর্শকের বসার ব্যবস্থা, টিকিট ১ মাং (১০,০০০ ইয়েন)। ঘোড়ার জন্য মাটির নিচে শিতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভেটেরিনারি হাসপাতাল ও ভেটেরিনারি সার্জনদের কোয়াটার আছে। প্রতি ৩০ মিনিট পরপর রেস আরম্ভ হয়। প্রতিটি দলে ৮/১০টি ঘোড়া অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি দৌড়ে প্রথমে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়দের লক্ষ লক্ষ ইয়েন দ্বারা পুরস্কৃত করা হয। সাধারণ দর্শকেরাও বাজী ধরে প্রথম হলে সেও হাজার হাজা ইয়েন পুরস্কার পেয়ে থাকেন। প্রতিটি ঘোড়া ক্রয়মূল্যদ ১ কোটি টাকার ও বেশী। আমেরিকা ও সৌদি আরব থেকে ঘোড়া আমদানী করা হয়।

শহরে কল-কারখানা নেই। সবই শহরের বাইরে, নদী বা সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকায়। আবাসিক হোস্টেল বা চাকুরীজীবীদের বাসা বাড়ী বড় শহর থেকে ৫০/১০০ কিলোমিটার দূরে গ্রাম বা শহরতলীতে। বিদ্যুৎ বন্ধ থাকবে গ্রীড লাইন মেরামতের জন। ১ বছরে ৩০ মিনিট মাত্র বিদ্যুৎ বন্ধ ছিল লাইন মেরামতের জন্য। শহরে যানজট নেই।

গোসল করার ব্যাপারটা একটু বলি। সরকারী গোসলখানায় গোসল কতে ৫০০ বা ১০০০ ইয়েন এর কয়েন যন্ত্রে প্রবেশ করানোর সাথে সাথে ঝরনা দিয়ে পানি পড়তে আরম্ভ হয়। নির্ধারিত সময়েই গোসলের কাজ শেষ করতে হবে। হঠাৎ পানি বন্ধ হলে আপনি পড়তে পারেন বিপদে। অথবা পূর্ণারয় আরও ৫০০ ইয়েন মেশিনে ঢুকিয়ে সচল রাখতে হবে। এভাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ কর্ম চলে। পূর্তগিজরা সমুদ্রপথে প্রথম জাপানে আসে, এর পর বৃটিশ, স্পেনশ ও ডাচ্ জাতি ব্যবসা করতে জাপানে আসে। ১৮৮৯ সালে প্রথম সংসদীয় সরকার গঠন ও শক্তিশালী সেনাবাহিণী গড়ে তোলে। ১৮৯৪-৯৫ চীনের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাইওয়ান, পেসকার ডোর দ্বীপ ও দক্ষিণ মানসুরিয়অ দখল করে। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে জাপান জনী হয় এবং জার্মানীর প্যাসিফিক দ্বীপ ও নীনের কিছু অংশ পূনরায় দখল করে ও প্রভাব খাটায়। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকা হিরোশিমা ও নাগাসিাকিতে পারমানবিক বোমা নিক্ষেপ করায় লক্ষাধিক জাপানীর মৃত্যু ও অনেকে পঙ্গুহয। জাপান পরাজিত হয়ে পূর্বের দক।ষকৃত অংশ ফেরৎ দিতে বাধ্য হয। আমেরিকা জাপানের কয়েকটি দ্বীপও দখলে রাখে। বড় দ্বীপ ৪টি, আয়তন ৩,৯৪,৭৪৪ বর্গ কিলোমিটার, এদের জনসংখ্যা ১২,৭৪,৬৭,৯৭২ (২০০৭), শিক্ষার হার ৯৯%, গড় আয়ু ৮১.৪ বছর, মুদ্রা ইয়েন, ধর্ম বৌদ্ধ ও সিনটোস্ট ৮৪%, অন্যান্য (মুসলিমসহ)১৬%, খৃষ্টান ০.৭%, প্রধান সমুদ্র বন্দর ১০টি ঘোড়দৌড় স্টেডিয়াম-১৮টি।

দৈনিক ইত্তেফাক | রবিবার ১৫ ফাল্গুন ১৪১৭ ■ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১

হার্নিয়ার সফল অস্ত্রপচার

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ভেটেরিনারি টিচিং হাসপাতালে একটি বিদেশি জাতের বকনা বাছুরের পেটে সফল অস্ত্রপচার করা হয়। বকনাটির একই সাথে দু'টি সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে আসে ওর মালিক। প্রথমত, Umbilical hernia, দ্বিতীয়ত, Adhesion and Perforation of Abomasum. ডা. মো. ফজলুল হক বলেন, Umbilical hernia সঠিক সময়ে চিকিৎসা দেয়া হলে দ্রুত ভাল হওয়ার সম্ভবনা থাকে শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ। কিন্তু চিকিৎসা দিতে দেরী হলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

গরুটির বয়স প্রায় এক বছর। চিকিৎসা নিতে অবহেলার কারণে হার্নিয়ার বাইরের চামড়ায় পচন ধরে এবং প্রায় ১৬ বর্গ ইঞ্চি আয়তন বিশিষ্ট একটি ছিদ্র তৈরি হয়। Abomasum টি হার্নিয়ার রিংয়ের সাথে জোড়া লেগে ফেটে যায় এবং সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য ছিদ্রপথে বাইরে বের হতে থাকে।

গরুটির মালিকের সাথে কথা বলে জানা যায়, প্রায় ৮ মাস আগে থেকে এ রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। প্রথমে সামান্য ফোঁড়ার মত ছিল। দিনে দিনে ফোঁড়াটি বড় হতে থাকে। রোগ ভাল করার জন্য স্থানীয় হাতুড়ে পশু চিকিৎস্যকদের চিকিৎসার পাশাপাশি হোমিও চিকিৎসাও চলে। এক পর্যায়ে ওই স্থানের চামড়া ফেটে ছিদ্রপথে পায়খানা বের হতে থাকে। অবস্থার খারাপ দেখে বিভিন্ন উপজেলা পশু হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসকদের পরামর্শে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি টিচিং হাসপাতালে নেয়া হয়। মেডিসিন, সার্জারি এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগের চেয়ারম্যান ডা. মো. ফজলুল হক গরুটির সফল অস্ত্রপচার করেন। তাকে সহযোগিতা করেন একই বিভাগের ডা. বেগম ফাতেমা জোহরা, ডা. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, ডা. মো. শামীম আহ্সান এবং এনাটোমি এন্ড হিস্টোলজি বিভাগের ডা. মো. তহিদার রহমান। বায়োপসি টেষ্ট করেন ডা. মো. নজরুল ইসলাম। অপারেশনে সময় লাগে প্রায় ৫ ঘণ্টা। ডা. মো. ফজলুল হক জানান, হার্নিয়ার সঠিক সময় চিকিৎসা না দিলে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে একদিকে রক্ত সঞ্চালন ও কৃত্রিম অক্সিজেনের ব্যবস্থা না থাকায় বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। তিনি আরো জানান, এ ধরনের Complicated hernia দ্বিতীয়টি পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে হার্নিয়া অপারেশনের পাশাপাশি পাকস্থলীর প্রায় ৩০ ভাগ কেটে ফেলতে হয়েছে। অপারেশন পরবর্তী চিকিৎসার ক্ষেত্রে সঠিক ঔষধ ও পরিচর্যা করলে পশু সুস্থ থাকে এবং পরিচর্যার অভাবে অনেক পশুর অপ্রত্যাশিত মৃত্যু ঘটে।

মাটি ও মানুষের কৃষি ডেস্ক

দৈনিক করতোয়া

শুক্রবার ১৫ মাঘ ১৪১৭ : ২৮ জানুয়ারি ২০১১

ইভটিজিং বখাটেদের কাজ

ডা. মো. ফজলুল হক

প্রবাদ আছে, পাগল নৌকা ডুবাইও না। পাগল বলে, ভাল কথা মনে করেছ, তেমনি দশা। ইভটিজিং বর্তমানে নতুন ঘটনা মনে হলেও এটি আদৌ নতুন নয়। আবহমান কাল হতেই তা চলে আসছে। কিন্তু মাত্রা অনেক কম ছিল। ১৯৭৮ সনের কথা। আমি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি.ভি.এম. তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। ভেটেরিনারি অনুষদে মেয়েদের প্রথম ভর্তি করা হয়। ক্লাশে শিক্ষক প্রবেশের অপেক্ষায়। আমার সামনের বেঞ্চের পরবর্তী সারিতে ছাত্রীরা বসে ছিল। আমার এক ক্লাসমেট বন্ধু এক বান্ধবীকে কিছু একটা বললেন। আমি তাকে বললাম তুই এ ধরনের কথা বলতে পারিস? বলা মাত্রই আমার কপালে জুটলো একটা ঘুসি। তাও হেভিওয়েট বক্সিং-এর মতই। আমি বোকা বনে গেলাম, এ কি করল? আমিও ছাড়বার পাত্র নই। পিছন থেকে চেয়ার ছুড়ে মারলাম ঐ বন্ধুকে। তাতে তার হাতের একটি আঙুল ভেঙে আজও বাকা হয়ে আছে। সে বলে, তোকে ঘুষি মারতে যেয়ে আমার আঙুল ভেঙেছি। আমি বলি চেয়ার ছুড়ে তোর হাতের আঙুল ভেঙে দিয়েছি। বর্তমানে সেও একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মাঝে মধ্যেই এ ব্যাপারে রসিকতাও করি। যা হোক এটাই যে ছোট খাট ইভ টিজিং তা বুঝতে পারলাম ৩২ বছর পর। তবে, আমি একজন সাহসী প্রতিবাদী, যেহেতু প্রতিবাদ করেছিলাম। দিন যত যাচ্ছে, ইভটিজিং এর সংখ্যা দিনদিন বাড়ছেই। বখাটে ইভটিজারদের হাতে আহত ও নিহত হয়েছেন অনেক প্রতিবাদী ব্যক্তি। এরা পর্যায়ক্রমে মেয়েদের পিতা-মাতা, দাদা-নানা, ভাই-বোনসহ শিক্ষক, শিক্ষিকাকে বিভিন্ন সময়ে আহত ও হত্যা করছে। সত্যিকার অর্থে, এদের মনুষত্ববোধ দিনদিনই হ্রাস পাচ্ছে।

৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী রোজীনা খাতুন রুমা, বখাটে বিপন ও মোস্তফার দ্বারা ইভটিজিং এর শিকার হন। প্রতিবাদ জানানোর কারণে জীবন দিতে হলো ঐ মেয়ের নানা আবদুস সোবহান (৭৫) কে। তার বাড়ী নলেয়া গ্রাম, ভুরুঙ্গামারী উপজেলা, কুড়িগ্রাম জেলায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই সাধারণ নিয়ম। সে অভিভাবকের নিকট অভিযোগ করেছিলেন, বিচার চেয়েছিলেন। এখানে আমরা কি দেখছি, অভিভাবক তার বখাটে ছেলের বিচারের পরিবর্তে ছেলের পক্ষনিয়ে মারামারিতে অংশ নিয়ে পিটিয়ে বাড়ীর উঠানেই হত্যা করে ঐ বৃদ্ধকে। এ ধরনের পরিবারের ছেলে-মেয়েরা চরিত্র গঠনে অভিভাবক হতে পারিবারিক, ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা নেয়ার সুযোগ পাবে কী ভাবে? যেহেতু অভিভাবকের আচরণ ও তার বখাটে ছেলের অবিকল। অনেকে বলেন,

মেয়ের সাথে তার ভাব ছিল, হতেও পারে, তবে এটি মিথ্যে, কারণ ৯/১০ বছরের মেয়েদের সাথে যে কোন ছেলেদেরই ভাবের আদান প্রদান অযৌক্তিক।

একই কারণে প্রতিবাদ করায় বিগত ১২-১০-২০১০ ইং তারিখে শিক্ষক মিজানুর রহমানকে হত্যা করা হয় নির্মমভাবে। এর ২ দিন পরেই একই ধরনের ঘটনায় ফরিদপুরের মধুখালীতে বৃদ্ধা মাতা চাপারানীকে হত্যা করে মাদক ব্যবসায়ীর বখাটে ছেলে দেবাশীষ সাহা একই পদ্ধতিতে। কারণ, মেয়ের ইভটিজার। বিয়ের প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় এক ছাত্রীর হাত-পা ভেঙে দিয়েছে এক বখাটে। ইতিমধ্যেই কয়েক ডজন অভিভাবককে আহত করেছে বখাটেরা। কারণ হিসেবে বলা যায়, বখাটেরা নিঃসন্দেহে অনৈতিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এরা সমাজের কলঙ্ক। সমাজ ও দেশের উন্নয়নে বাধার কারণ। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী চলতি বছরের ১২ ডিসেম্বর/২০১০ ইং পর্যন্ত প্রতিবাদ করতে যেয়ে ১৯জন নিহত হয়েছেন। এবং অপবাদ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন

করা। আইনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সমাজ বা দেশের জনগণকে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে পরিচালিত করা। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, ইভটিজার হল এক শ্রেণীর বখাটে। এদের অনেকে রাজনৈতিক দলের নাম ভাঙিয়ে সমাজের সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতির মাধ্যমে ইভটিজিং এর চেয়েও জঘন্য অপরাধ করে। প্রকৃত অর্থে এরা দেশ ও দলের শত্রু। চরিত্র গঠনের প্রথম ধাপই হল শিশুকাল। উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটাতে এবং যুদ্ধাপরাধীর বিচারের বাধাগ্রস্ত করতে কিছু অপশক্তির ইন্ধন আছে

বিশ্বের দরবারে দেশের মানমর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে দলমত নির্বিশেষে এক যোগে কাজ করতে হবে। এটাই হবে সবার জন্য মহান কাজ। এর ব্যতিক্রম হলে আমরা সবাই, নিজের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ধ্বংসের জন্যই যথেষ্ট।

ইভটিজিংকারীর বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন মা হয়ে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইভটিজিং প্রতিরোধ কমিটি গঠনের কথাও জানান। এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী।

মধুখালীর বনবাহিনী নামক বখাটে দল যাদের কাজই বখাটেপনা, চাঁদাবাজী ও ছিনতাই ইত্যাদি, এমন এক দলের কতিপয় বখাটে সন্ত্রাসী মোহেল মোল্লা বিগত ০২-০৯-২০১০ ইং তারিখে অপহরণ করে অভিজ্ঞ কর্মকর্তার বিবাহিত কন্যা বন্যাকে। আইন শৃংখলা বাহিনীর প্রতি জন-সাধারণ কতটা নির্ভরশীল হতে পারে? এ প্রশ্ন সবারই। এক্ষেত্রে পত্রপত্রিকার ভাষা মতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার প্রতিও অবহেলিত মানুষের মনে অবহেলার অভিযোগ থাকাটাই স্বাভাবিক। প্রতিবাদ করায় কুমিল-য় এক শিক্ষকের পা ভেঙে দিয়েছে বখাটেরা। অন্যদিকে, মেয়ের বাবা-মাকে আহত করেছে এক

৩১জন।

ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা দুর্বল চিত্তের ও অভিমানী। এদের অনেকেরই আত্মসম্মান বোধ কাজ করে, যার ফলে অনেক ছোট অপমানে জীবনকে তুচ্ছ ভেবে আত্মহত্যা করে। মেয়েদেরও প্রতিবাদী হতে হবে। ইভটিজিং শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই হয় এমন নয়। অফিস, শিল্পকারখানা, পরিবহন, সিনেমা হল, দোকানপাট এবং পার্কেও ঘটে। বখাটে এবং বেকার যুবকদের মধ্যেই এর প্রবণতা বেশী। অন্যদিকে উভয়ের মধ্যে মনের ভাব, বিয়ের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ বা বিয়ের প্রস্তাবে নারাজী থাকা ইত্যাদিও ইভটিজিং এর কারণ হতে পারে।

বর্তমানে ভ্রাম্যমান আদালত বিশেষভাবে তৎপর, দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েক ডজন ইভটিজারদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড ও অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে। আশা করা যায়, আইনের সঠিক বাস্তবায়নই একমাত্র ভরসা এ ধরনের ক্যানসার হতে জাতিকে রক্ষা

কিনা তাও ভাববার বিষয়। কয়েকদিন পূর্বে অ্যান্ড্রয়েড আতঙ্কের মাধ্যমে গোষ্ঠি সিন্ডিকেট তৈরী করে প্রাণিসম্পদে ধস নামানোর উদাহরণও রয়েছে এ দেশে। ইভটিজিং ভিন্নধর্মী হলেও দেশের উন্নয়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধাগ্রস্ত করছে কোন কোন মহল। প্রতিরোধে দিনদিন জনগণ শক্তি সঞ্চার করছে। যেমন ২৫-১০-২০১০ ইং বগুড়ার ধনুট উপজেলা, মর্জিনা খাতুন সাহসের সাথে একই লম্পট ইভটিজারকে বটিহাতে প্রতিহত করেন। ফলে তাকে পুরস্কৃত করা হয়। এমনিভাবে জনগণই একদিন এদের উৎখাত করবে সমাজ থেকে। অনেক পিতা ইতিমধ্যেই তার ইভটিজার সন্তানকে থানায় সোপর্দও করছেন। এরাই সত্যিকার অর্থে অভিভাবক, তাদের আন্তরিকতার সাথে অভিনন্দন জানাই।

ইভটিজিং এর মূল উৎস্য যেমন,

সন্তানের ব্যাপারে পিতামাতাও, অভিভাবকের উদাসীনতা এবং খারাপ সহপাঠীদের সাথে সঙ্গ দেওয়া।

ছোটবেলা হতেই পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ও নৈতিক শিক্ষা হতে বঞ্চিত হওয়া।

মাদকাসক্ত বা মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত পরিবারের সন্তান।

যত্রতত্র অশ্লীল চলচিত্র প্রদর্শন, টিভিতে আপত্তিকর অনুষ্ঠান প্রচার এবং এর সিডির সহজ লভ্যতা।

মোবাইল ফোনের অপব্যবহার।

অশ্লীল সাইবার সন্ত্রাস, ইত্যাদি ইভটিজিং এর মূল উৎস।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নায়িকা বা নর্তকীদের আপত্তিকর পোষাক পরিধান করা।

ইভটিজিং হতে প্রতিকারের উপায় :

অপরাধের শাস্তির মেয়াদ বৃদ্ধি, অপরাধী ধরা ছোয়ার বাইরে থাকলে মালামাল ক্রোকের বিধান রাখা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশেষ স্থান গুলোতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারী বৃদ্ধি করা।

দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী ও পেশার সবাইকে যে কোন অপরাধের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সর্বতভাবে সহযোগিতা করা।

ইভটিজিং নামক ক্যান্সার হতে সমাজ তথা জাতিকে কলুস মুক্ত রাখতে হলে প্রথমেই পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান প্রত্যেকটি পিতামাতার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব মনে করা।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক শিক্ষা দান করা।

সবাই এই প্রতিজ্ঞা করি, এ ধরণের গর্হিত কাজ করে কলঙ্কের ঘানি আজীবন নিজেও টানবো না, মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনকে গ্লানিতে ফেলব না। মনে রাখতে হবে আজ যে ব্যক্তি অন্যের মেয়েকে ইভটিজিং করছে ভবিষ্যতে তার মেয়েও এ থেকে পরিত্রাণ পাবে না এটাই স্বাভাবিক। যেহেতু এটা সামাজিক ব্যাধি ক্যান্সার সমতুল্য। ইভটিজিং করে বখাটে ও লম্পট হিসেবে নিজেকে সমাজে আত্মপ্রকাশ করানো যায়। কিন্তু জোর করে ভাল মানুষ সেজে ভালবাসা আদায় করা যায় না। একটি কথা মনে রাখতে হবে, আমরা সবাই এদেশের নাগরিক এবং ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্থান দখল করে নেয়। বিশ্বের দরবারে দেশের মানমর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে দলমত নির্বিশেষে এক যোগে কাজ করতে হবে। এটাই হবে সবার জন্য মহান কাজ। এর ব্যতিক্রম হলে আমরা সবাই, নিজের এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের ধ্বংসের জন্যই যথেষ্ট।

হত্যার পরিবর্তে হত্যার বিধান রয়েছে। বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা জঘন্যতম অপরাধ (আল-কোরান সুরা আল বাকারা আয়াত নং-১৭৮ ও ২১৭)।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান মেডিসিন, সার্জারী এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দিনাজপুর। মোবাইল : ০১৭৫০০৯০৪৫৮